মুঈন উদ-দীন আহমদ খান

ফরায়েযী আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্য। নদীবিধৌত এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল মুসলমান। ফরায়েযী আন্দোলন ছিল বাংলা অঞ্চলকে ইসলামি পুনর্জীবনবাদে উদ্বুদ্ধ করা। এই আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত মুসলিম কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসা অনৈসলামিক আচার ও বিশ্বাসকে শুদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়ত তাদের সংস্কার করা ধর্মমতকে কায়েমি স্বার্থান্বেষী জমিদার ও নীলকরদের থেকে সুরক্ষা দেয়া। এই গ্রন্থের প্রথমেই এ সম্পর্কে একটি পটভূমি আলোচিত হয়েছে, যেখানে প্রতিটি বিষয়কে সংজ্ঞায়িত ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এরপর ফরায়েযী নেতৃবৃন্দ, তাঁদের ধর্মীয় মতাদর্শ, সামাজিক সংগঠন এবং আন্দোলনের ভৌগোলিক পরিসর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। বিশেষত ফরায়েযী আন্দোলনকে দেখা হয়েছে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের উনিশ শতকের ধর্মীয় পুনর্জীবনবাদের আলোকে। গ্রন্থটি ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও ইতিহাসপ্রেমী সাধারণ পাঠককে উৎসাহী করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমান গ্রন্থটির মূল লেখক মুঈন উদ দীন আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। তিনি কানাডার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাকগিল থেকে এম.এ.ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমান গ্রন্থটি উক্ত থিসিসটির পরিমার্জিত রূপ। তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইসলামাবাদ) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন। সর্বশেষে তিনি সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-এর উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. খান বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থের লেখক। এগুলোর মধ্যে *হিস্ট্রি অব দ্য ফরায়েযী মুভমেন্ট ইন বেংগল, মুসলিম স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম, তিতুমীর অ্যান্ড হিজ ফলোয়ার্স ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান রেকর্ডস, ওয়াহাবী ট্রায়াল, মুসলিম কমিউনিটি ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি বহুসংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন যেগুলো দেশ ও বিদেশের বিশিষ্ট জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটির অনুবাদক গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে ১৯৭৮ সাল থেকে কর্মরত আছেন তিনি বর্তমান অনুবাদকর্মটি ছাড়াও আরো একটি গ্রন্থের অনুবাদক হিসেবে কাজ করেছেন যেটি ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত অনুবাদটির শিরোনাম-*ব্রিটিশ ভারতীয় নথিতে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণ*। এছাড়া তার লিখিত দুটি গবেষণা গ্রন্থ *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ* এবং *বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি* যথাক্রমে ১৯৯৫ ও ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ড. কিবরিয়া ইতোমধ্যেই আরো দুটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন এগুলো হলো- *উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে মুসলিম শাসনের ইতিহাস* এবং *আধুনিক মিসর ও সুদানের রাজনৈতিক ইতিহাস* গ্রন্থ দুটি ২০০৬ ও ২০০৭ সালে খান ব্রাদার্স, ঢাকা প্রকাশ করেছে এছাড়াও তিনি বহুসংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধের লেখক।

বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস

মূল

ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান

অনুবাদ

ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৪ / জুন ২০০৭

বাএ ৪৫৮৪
(অর্থবর্ষ ২০০৬ - ২০০৭ পাঠ্যপুস্তক : মাসাআবা উপবিভাগ : ১৪)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ণ ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকীবিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

BANGLAY FARAYEJI ANDOLANER ITIHAS (History of the Faraidi Movement in Bengal) by Golam Kebria Bhuiyan. Published by Dr. Abdul Wahab, Director-Incharge, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Published : June 2007. Price : Taka 140.00 only.
ISBN 984 - 07 – 4593-X

উৎসর্গ

মুঈন উদ-দীন আহমদ খান
ইতিহাসবিদ ও জ্ঞানতাপস

মুখবন্ধ

উনিশ শতকে মুসলিম বিশ্বে সংস্কার আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সবগুলো আন্দোলন ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং ইসলামকে ঘিরে যেসব সামাজিক আচার আবর্তিত হচ্ছিল সেগুলোকে শুদ্ধ করে শুদ্ধিবাদী ইসলামে ফিরে যাওয়াই ছিল আন্দোলনগুলোর প্রধান লক্ষ্য। হঠাৎ করে জেগে উঠা অথবা পুনরুজ্জীবন লাভ করে আদি শুদ্ধ বিশ্বাসে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের চরম অবনতির সময়ের সংগে অবশ্যই যোগসূত্রিত হতে হবে। ইউরোপীয় শক্তিসমূহের পদানত হয়ে ভারতবর্ষে, পশ্চিম এশিয়ায় এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিম সমাজ নিজেদের অবনতি অনুধাবন করেছিল এবং এ থেকে উত্তরণের দ্রুত কোনো সমাধান চেয়েছিল। মুসলমানদের এই আন্দোলনকে কেন ধর্মীয় আবরণে দেখা হয়েছিল তা আজও অজানা। ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে এটি কি একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে যেসব গবেষণা সমাপ্ত হয়েছে সেগুলো প্রধানত আরবের তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং অন্যান্য আন্দোলনগুলোকে এই আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে বিবেচিত করেছে। এই ধরনের বিতর্ক স্থানীয় আন্দোলনসমূহের চরিত্র অনুধাবনে খুব কমই সুযোগ প্রদান করেছে। এর ফলে আন্দোলনগুলোর ঐতিহাসিক চরিত্র অনুধাবন করা যায়নি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে উক্ত গোলমেলে ধারণার ফলে এসব আন্দোলনসমূহের অবদান স্টাডি করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখন সময় এসেছে আন্দোলনের ভেতরকার শক্তিসমূহকে পরীক্ষা করার, যার মাধ্যমে এগুলোকে সামজিক - সাংস্কৃতিক পরিসরে যথাযথ স্থান দেয়া যাবে। মোটের উপর এটা বাস্তব যে, মানুষ মানবিক বৈশিষ্ট্যময় একটি সাধারণ লক্ষ্যের বিষয়ে এক হতে পারে এবং একটি বিশেষ অবস্থায় এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।

এসব প্রশ্নের আংশিক উত্তর অন্বেষণ করার জন্য আমি আমার প্রাক্তন ছাত্র মি. (বর্তমানে ড.) মুঈন উদ-দীন আহমদ খানকে পরামর্শ দেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য গ্রহণ করা হয়। তিনি বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের সূত্র অনুসরণ করে নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, এতে আশা করা যায় যে, ইসলামের সার্বিক সম্ভাবনাকে অনুধাবন করার বিষয়ে এটি বিশেষ অবদান রাখবে।

১৬ জুলাই ১৯৬৮

আহমেদ হাসান দানী
প্রফেসর, ভূ-তত্ত্ব বিভাগ
পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান

পূর্বকথা

বর্তমান কর্মটি উনিশ শতকে সূচিত ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে অনুধাবন করার একটি প্রয়াস। এই পুনরুজ্জীবনবাদ বাংলা অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছিল। বিশ্ব পরিসরে এই শতকে (উনিশ শতক) ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদ সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছিল। এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিচালিত হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে উত্তর ভারতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যক্তি। পরবর্তী সময়ে তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা বাংলায় বিস্তার লাভ করলেও এ অঞ্চলে ফরায়েযী আন্দোলনের সূচনাকারী হাজী শরীয়তউল্লাহ আরব শুদ্ধিবাদ থেকে সরাসরি অনুপ্রেরণা পান। তাঁর সূচিত আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের সামজিক - অর্থনৈতিক জীবনের সংগে অবিচ্ছেদ্য। নদী বিধৌত তৎকালীন এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। এই শুদ্ধিবাদ আন্দোলনের ছিল দুটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমত মুসলিম কৃষকশ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচারকে শুদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়ত তাদের সংস্কার করা ধর্মমতকে কায়েমি স্বার্থান্বেষী জমিদার ও নীলকরদের থেকে সুরক্ষা দেয়া। প্রথমটি ছিল ধর্মীয় দিক, যেটি ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের পটভূমিতে পরীক্ষা করতে হবে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল গ্রামীণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর সামাজিক - অর্থনৈতিক প্রভাব। নিচু বাংলার নদী বিধৌত অঞ্চলে ফরায়েযী আন্দোলনের বিস্তার যা এটির কেন্দ্র ফরিদপুর থেকে হয়েছিল, তা মুসলিম কৃষকশ্রেণীর মধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ফরায়েযী আন্দোলনের এই গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য উত্তর ভারতের নগরভিত্তিক ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলন থেকে সুস্পষ্টভাবেই আলাদা ছিল।

গ্রন্থের পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে মূল উপাদানসমূহ আলোচিত হয়েছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমে একটি ব্যাপক পটভূমি আলোচিত হয়েছে যেখানে প্রতিটি বিষয় সংজ্ঞায়িত ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এরপর ফরায়েযী নেতৃবৃন্দ, তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ, সামাজিক সংগঠন এবং আন্দোলনের ভৌগোলিক পরিসর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে এসেছে। একটি অধ্যায়ে ফরায়েযী মতাদর্শের সংগে পরবর্তী সময়ে বিরোধী, ধর্মীয় মতাদর্শের প্রভাব আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের পুরো অংশেই গভীর মনোনিবেশ সহকারে ফরায়েযী আন্দোলন স্টাডি করা হয়েছে এবং এটিকে উনিশ শতকের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের আলোকে দেখা হয়েছে। এছাড়া বাংলার মুসলমানদের জীবনে আন্দোলনের সূত্র খুঁজে দেখা হয়েছে।

মূলত থিসিসটি ১৯৬০ সালে ২৫ শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করা হয় এবং এটি ১৯৬১ সালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত হয়। আমার কাজের জন্য সুমন্তব্য করায় আমি থিসিস পরীক্ষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এরা হলেন ড. আই. এইচ. কোরেশী, ড. মাহমুদ হোসেন এবং ড. এ. আর. মল্লিক। আমি আমার গবেষনা ও তত্ত্বাবধায়ক ড. আহমেদ হাসান দানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তার সার্বক্ষণিক সাহায্য ও উৎসাহ না থাকলে এ কাজ বাস্তবে হয়ত সম্পন্ন করা যেত না। গবেষণার কাজ চলাকালে সহযোগিতার জন্য আমি আমার পুরনো শিক্ষক শামসুল উলামা মওলানা বিলায়েত হোসেন এবং ড. আবদুল হালিমের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। এই সংগে জনাব এস.এম.ইকরামের সহযোগিতা ও গঠনমূলক পরামর্শের কথা স্মরণ করছি। আমি এই প্রসংগে কুমিল্লার মওলবী সিরাজুল হকের কাছে তাঁর সহযোগিতা ও অমূল্য সাহায্যের কথা স্বীকার করছি। আরবি, ফার্সি ও উর্দু অংশের ভাষান্তর করার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মোশতাকুর রহমান এবং মানচিত্র আঁকার জন্য একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মির্জা মাহমুদ বেগের অবদান স্বীকার করছি।

আমি ঢাকাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে গবেষণা বৃত্তি প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া গবেষণাটি প্রকাশ করার জন্য পাকিস্তান হিস্টোরিকেল সোসাইটি (করাচির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবদুল করিমের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর গভীর আগ্রহ এবং গবেষণাকর্মটির জন্য প্রয়োজনীয় সমালোচনাই এটিকে বর্তমান মানসম্মতভাবে এ উন্নীত করেছে বলে আমি মনে করি।

করাচি বিশ্ববিদ্যালয় — এম. এ. খান
২০ অক্টোবর, ১৯৬৮

অনুবাদকের কথা

উনিশ শতকের পূর্ববাংলায় হাজী শরীয়তুল্লাহ্'র নেতৃত্বে ফরায়েযী আন্দোলন শুরু হয়। সমসাময়িক পশ্চিম বাংলায় তিতুমীর এবং উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ শহীদ ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। উক্তর ভারতের আন্দোলনের সঙ্গে বাংলায় সূচিত আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইউরোপীয় নীলকর, জমিদার এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই আন্দোলন শুরুতে ছিল ধর্মনির্ভর। মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূর করে শুদ্ধ ইসলামে ফিরে যাওয়াই ছিল ফরায়েযী আন্দোলনের লক্ষ্য। হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবদ্দশায় এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবেই ফরিদপুর জেলায় চলছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শরীয়তুল্লাহ'র পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনকে আরও গতিশীল ও বিদ্রোহাত্মক করে তোলেন। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের সংগে তাঁর সংঘাত বাঁধে। তা সত্ত্বেও ফরায়েযী আন্দোলনের নেতাদেরকে তীতুমীরের মত ভাগ্যবরণ করতে হয়নি। ফরায়েযী আন্দোলনের গণভিত্তির কারণেই তা অব্যাহত থাকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। বাংলাদেশের ধর্মীয় - সামাজিক জীবনে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব সুদূর-প্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের স্বরুপ উদঘাটনের ক্ষেত্রে ফরায়েযী আন্দোলনের চরিত্র অনুধাবন করা আবশ্যক। আজ থেকে প্রায় পাঁচ দশক পূর্বে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বর্তমান গ্রন্থটি একটি প্রামাণ্য গবেষণা গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় এ ধরনের একটি গ্রন্থ অনুবাদ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমার শিক্ষক এবং গ্রন্থের লেখক ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান অনুবাদের বিষয়ে আমার উপর আস্থা রাখায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অনুবাদটি ছাত্র-ছাত্রীদের ও গবেষকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে আশা করি। মুদ্রণ প্রমাদ যতদূর সম্ভব না থাকার বিষয়ে চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাস্তবে অনেক প্রমাদ থেকে যাওয়ার আশংকা করছি। শেষে পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক ড. আবদুল ওয়াহাবকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় — গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া

১২-৬-০৭

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

উপাদানসমূহ

বর্তমান গবেষণা কর্মটি খ্রিষ্টীয় ১৮১৮ থেকে ১৯০৬ সময়ের মধ্যে ফরায়েযী আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করে অর্থাৎ ফরায়েযী আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে শুরু করে ফরায়েযীদের শেষ প্রধান নেতা সাইদ উদ্দীন আহমদ পর্যন্ত সময় এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। তৎকালীন ফরায়েযী প্রধান রশীদ আল-দীন আহমদ প্রকাশ 'বাদশাহ মিয়ার'[১] পিতা ছিলেন সৈয়দ আলদীন আহমেদ। অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যেমন তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া এবং এর পরবর্তী উপদলসমূহের[২] আন্দোলন ফরায়েযী আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণার তথ্যাদি সংগ্রহের সময় প্রাথমিক উপাত্তের বিষয়টি সবসময় মনে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রাথমিক উপাত্তসমূহ নিরীক্ষা না করে গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোকপাত হয়নি। খ্রিষ্টীয় ১৮৩০-১৮৭০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফরায়েযী আন্দোলন গ্রামীণ জীবনে প্রভূত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই সকল আন্দোলন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৩] মুসলিম আর্থ-সামাজিক জীবন সম্পর্কে কয়েকজন গবেষক আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। এদের মধ্যে জেমস্ ওয়াইজ, ডব্লিউ হান্টার এবং সৈয়দ আমীর আলী উল্লেখযোগ্য। লেখকবৃন্দ উনিশ শতকের শেষার্ধের মুসলিম সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ওয়াইজ মুসলিম সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর বিবরণ দিয়েছেন। এই সাথে ধর্মীয় সংস্কারে প্রভাব রেখেছেন এই ধরনের মুসলিম ব্যক্তিদের অবদান বিশ্লেষণ করেছেন।[৪] হান্টার সংস্কার আন্দোলনসমূহের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন।[৫]

---

১. পরিতাপের বিষয় যে, এই গবেষণাকর্মটি শেষ করার সময় বাদশাহ মিয়া ১৯৫৯ সালের ১৩ ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র মোহসিন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েযী প্রধানের দায়িত্ব নেন।

২. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, সেকশন-এ দেখুন।

৩. Hunter's: our Indian Musalmans are they bound in Conscience to rebel against the queen (London.1871 A.D) গ্রন্থটি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে লেখক মুসলিম সমাজের অস্থিরতার রাজনৈতিক চরিত্র নিরুপণের চেষ্টা করেন।

৪. James Wise : Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, A.D. 1884 (সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য কিছু সংখ্যক কপি মুদ্রিত হয়েছিল)।

৫. ৩ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম উচ্চবিত্তের দ্রুত অবক্ষয়ের বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন।[৬] সাম্প্রতিক সময়ে দু'জন গবেষক উনিশ শতকের মুসলিম আর্থ-সামাজিক আন্দোলনসমূহ আলোচনা করেছেন। যদিও তাদের গবেষণা ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের ধারক। এই কর্মগুলোর মধ্যে একটি হল ড. এ.আর. মল্লিকের গ্রন্থ। এটি বাংলা এবং বিহার সম্পর্কিত। তিনি মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।[৭] অন্য গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেছেন ড. মোহাম্মদ আবদুল বারি। তিনি ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।[৮] এগুলো ছাড়া বেশ কয়েকজন গবেষক ফরায়েযী আন্দোলন এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এই প্রবন্ধ ও গবেষণাগুলোতে ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয়নি। যদিও ধর্মীয় সামাজিক ও ধর্মীয়-অর্থনৈতিক কারণে এই আন্দোলনটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাত্তসমূহ এখানে ব্যবহার হয়েছে তা নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায়।

ক. ফরায়েযী উপাত্তসমূহ,

খ. ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কিত সমসাময়িক বিভিন্ন উপাত্ত,

গ. বাংলার মুসলিম সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার উপর লিখিত উপাত্ত,

ঘ. সরকারি নথি।

ফরায়েযী উপাত্তসমূহ

আমরা বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ থেকে ফরায়েজী আন্দোলন সম্পর্কিত উপাত্ত উদ্ধার করেছি। এগুলোর মধ্যে শিলালিপি, দলিল, ফতোয়া (আইনভিত্তিক সিদ্ধান্ত) এবং পুঁথি। এই সকল উপাত্ত ফরায়েযী আন্দোলনের বিস্তৃতি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশনা দিয়েছে। এগুলো নিম্নে বর্ণিত হল।

১। প্রথমে হাজী শরীয়তুল্লাহর সমাধি স্থলে প্রাপ্ত শিলালিপি সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকার শিলালিপিটি উদ্ধার করেন, যা গবেষকদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। শিলালিপিটি হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশধরদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর শিলালিপিটি এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে (ঢাকা) পরীক্ষিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[৯] আরবিতে লিখিত শিলালিপিটিতে দশটি বাক্যের একটি বিবরণ আছে।

---

৬. দেখুন সৈয়দ আমীর আলী : A cry for the Indian Mohamedans'. Nineteenth Century, New york, vol. xii. A.D. 1882. পৃ. ১৮৩ থেকে।

৭. Dr. A.R. Mallick. British policy and the Muslims in Bengal 1757 – 1856. A study of the Development of the Muslims in Bengal with special reference to their education. Dacca.1961.

৮. Dr. Mohammad Abdul Bari : A comparative study of the early Wahabi Doctrines and contemporary Reform Movements in Indian Islam.(অপ্রকাশিত পি.এইচডি, থিসিস। কুইন্স কলেজ, অক্সফোর্ড ১৯৫৩

৯ JASP. vol. iii. 1958 পৃ. পৃ. ১৮৭- ৯৮।

এতে হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই বিবরণদ্বারা হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী সম্পর্কে প্রথমবারেরমত সঠিক কালনির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামে' লিখিত পূর্বের লেখকদের মতামত শুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। শিলালিপিটি হাজী সাহেবের সমাধির দেয়ালে লাগানো ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই আঁড়িয়াল খাঁ (পদ্মা) নদী দ্বারা সমাধি স্থলটি ভাঙ্গনের শিকার হলে, শিলালিপিটি খসে পড়ে। তখন তাঁর পুত্র দুদু মিয়া নিজ বাড়িতে এটি সংরক্ষণ করেন। ১৯৫৭ সালে বর্তমান লেখকের অনুরোধে শিলালিপিটি উপহার হিসাবে এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকায় জমা দেয়া হয়। বর্তমান ফরায়েযী প্রধান মৌলবী আবু খালিদ রশিদ আল-দীন আহমদ প্রকাশ বাদশা মিয়া এটি উপহার হিসাবে প্রদান করেন। তিনি হলেন দুদু মিয়ার পৌত্র। তার পিতা খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদের কাছ থেকে তিনি এটি পেয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে বাদশা মিয়া যখন ফরায়েযীদের নেতা নিবার্চিত হন তখন তিনি শিলালিপিটি পান। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত এই শিলালিপিটির যথার্থতা সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন। বিষয়টি আমাদের গোচরে এসেছে। আরও প্রশ্ন উঠেছে ফরায়েযীগণ সাধারণত কবরের উপর সমাধি নির্মাণের বিরোধিতা করেছে, এই অবস্থায় শরীয়তুল্লাহর সমাধি নির্মাণ করা হল কি করে ? তাছাড়া অনেকে শিলালিপিটি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে নির্মিত হয়েছে বলে মনে করেন। এটি সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত আমাদের আলোচনার সঙ্গে এটা যোগ করা যায় যে, এটি হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তৈরি করা হয়েছিল এবং শিলালিপিটির ভাষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাঁর বংশধরগণ দ্বারা এটি অনেক দিন ধরে সংরক্ষিত ছিল।

দ্বিতীয়ত আমরা বাদশা মিয়ার বক্তব্য গ্রহণ করেছি। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী শিলালিপিটি হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র দুদু মিয়া কর্তৃক তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া এই বিষয়ে আর কোনো বিতর্কের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর সাল যেটি শিলালিপিতে উল্লেখিত হয়েছে সেটি আমরা গ্রহণ করেছি।

এই তারিখটি সমসাময়িক লেখক জেমস টেইলর দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। ১৮৩৯ সালে লিখিত A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca, তে তিনি লিখেছেন যে, ১৮২৮ সাল পরবর্তী দশ বছরে, ফরায়েযী আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তিনি আরও লিখেছেন যে, হাজী শরীয়তুল্লাহকে পুলিশের নজরে রাখা হয়েছে।[১০] শিলালিপিতে তাঁর মৃত্যুর তারিখ হল ১২৫৫ হিজরী, ১০ই জেলহজ্জ / ১৮৪০ খ্রি. ১২ই জানুয়ারি।[১১] সুতরাং তারিখটির মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। যদি তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে তাঁর বংশধরদের কেউ জালিয়াতি করে থাকে তাহলেও আমাদের তাঁর বংশধরদের সরবরাহকৃত তারিখটিই গ্রহণ করতে হবে। কারণ তার পুত্র বা পৌপুত্রগণই এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। তৃতীয়ত এটা যথার্থ যে, ফরায়েযীগণ সমাধি সৌধ নির্মাণ বা কবর মাটি থেকে উঁচু করে দেয়ার বিরোধী। কিন্তু ফরায়েযীগণ কবরের চার

১০. James Taylor. A sketch of the Topography and Statistics of Dacca, Calcutta 1840. পৃ. ২৫০

১১. দ্রষ্টব্য - J A S P. vol. iii. 1958. পৃ. ১৮৯

পাশে দেয়াল নির্মাণের বিরোধী ছিল না। এই ক্ষেত্রে বংশাল রোড ঢাকায়[১২] দুদু মিয়ার কবরটিকে নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া ত্রিপুরা জেলার (কুমিল্লা) চাঁদপুরস্থ ফরায়েযী লেখক মুনির উদ্দীনের কবরটির কথাও বলা যায়।[১৩] তিনি ছিলেন সবচেয়ে পুরানো এবং প্রধান একজন ফরায়েযী নেতা। উক্ত কবরগুলো চ্যাপ্টা আকারের হলেও এগুলোর চার পাশে দেয়াল রয়েছে।

২। একটি হাতে লেখা দলিল ঃ স্ট্যাম্প কাগজে লিখিত এই দলিলে দুদু মিয়া স্বাক্ষর করেছেন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি বা ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ। এর দ্বারা মুনসী ফয়েজ উদ্দীন মোখতারকে আইন বিষয়ক এটর্নীর ক্ষমতা দেয়া হয়। দলিলটি দুদু মিয়ার বংশধরদের থেকে বর্তমান লেখক সম্প্রতি উদ্ধার করেছেন। ১৮৪৯ খ্রি. ১৫ই জানুয়ারি একটি আইন সম্পর্কিত দলিল হিসাবে এটি আদালতে রেজিস্ট্রি করা হয়। দলিলটি ৫৬ টি ছত্রে বাংলা ভাষায় লিখিত। দলিলটি মনোযোগ-সহকারে পরীক্ষা করে ইংরেজি অনুবাদ ও মন্তব্যসহ এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।[১৪]

৩। একটি ফতোয়া ঃ বাংলার গ্রামাঞ্চলে ঈদ এবং জুম্মার নামাজ আইনানুগ নয় বলে ফতোয়ায় উল্লেখ করা হয়। এটি উর্দু - আরবি ভাষায় লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ফতোয়ার উর্দু অংশটি আরবি বাক্যগুলোর অনুবাদ।

একটি বড় আকারের কাগজে ফতোয়াটি মুদ্রিত হয়েছে। কাগজটির আকার ১৬ বা ২৬ ইঞ্চি। এতে ৯১টি ছত্র রয়েছে, যেগুলোতে বক্তব্য ছোট অক্ষরে লিখিত আছে।

ফরিদপুর জেলার বিখ্যাত ফরায়েযী ধর্মতত্ত্ববিদ খলিফা আবদুল জব্বারের পুত্র মৌলবী আবু ইয়াহিয়া মোহাম্মদ নূরুদ্দীন কর্তৃক ফতোয়াটি প্রকাশিত হয়।[১৫] ফতোয়াটি পূর্ববঙ্গের ২০ জন ফরায়েযী ধর্মতত্ত্ববিদ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হয়। জুম্মা ও ঈদ সম্পর্কে সংক্ষেপে ফরায়েযীদের যুক্তি ও মতামত ফতোয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের পর সম্ভবত মুদ্রিত হয়। ফরায়েযী খলিফাদের মধ্যে বিলি করার জন্য এবং বিরোধীদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৮ সালে ফতোয়াটির একটি কপি চাঁদপুর জেলার একটি গ্রাম থেকে বর্তমান লেখক সংগ্রহ করেন। এটি একটি দুষ্প্রাপ্য দলিল যা অদ্যাবধি অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। এটা বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত দেরীতে প্রস্তুত করা সত্ত্বেও দুটি কারণে ফতোয়াটির গুরুত্ব কমে যায়নি। প্রথমত ফতোয়াতে ১৮৬৭ সালে অনুষ্ঠিত ফরায়েযী খলিফা আবদুল জব্বার এবং মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর বিতর্কের বিবরণ রয়েছে যা জৌনপুরী লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৬] ফতোয়া এবং পুঁথিগুলো শুক্রবারের জুম্মার নামাজ সম্পর্কে বিশদ বক্তব্য রেখেছিল। ফতোয়া দেরীতে প্রকাশের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, ফরায়েযীদের সাথে তাদের বিরোধীদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। এই ফতোয়া

১২. দ্রষ্টব্য - গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়
১৩ পরিশিষ্ট ঙ।
১৪ দেখুন JASP. vol. vi 1961. পৃ. ১২৪- ১৩১
১৫ খলিফা আবদুল জব্বারের পরিচিতির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট 'জ'
১৬ এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়

দ্বারা আমরা এই বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে ফরায়েযীদের মতামত জানতে পারি।[১৭]

৪। 'দুরর ই মোহাম্মদ' শিরোনামের পুঁথি (পৃ. ৯-১৩৮) বাংলা ভাষায় লিখিত। ফরায়েযী মতাদর্শ এবং ফরায়েযী নেতাদের জীবনী এই পুঁথিতে বিবৃত হয়েছে। পুঁথিটির প্রথম ৮ পৃষ্ঠা এবং শেষের কয়েক পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। পুঁথিটির ভাষা এবং গঠন প্রকৃতি দ্বারা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে এটি ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়টি ছিল খাঁন বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদের মৃত্যু পূর্ববর্তী সময় দুরর ই মোহাম্মদ পুঁথিটির ভনিতায় লেখকের নাম বেশ কয়েকবার উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত দুরর ই মোহাম্মদ লেখকের ছদ্মনাম। যেহেতু পুঁথিটির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি সেহেতু এটির লেখক সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়।

প্রথমত পুঁথিটির আর কোন কপি পাওয়া যায়নি এবং দ্বিতীয়ত অনেক পুরনো ফরায়েযী এমনকি বাদশা মিয়াও পুঁথিটির লেখককে শনাক্ত করতে পারেননি, তা সত্ত্বেও বলা যায় যে এটির লেখকের নাম সম্ভবত দুরর ই মোহাম্মদ। পুঁথিটি বাংলা ভাষায় লিখিত হলেও এটিতে আরবি ও ফার্সি শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। **এতে ধারণা করা যায় যে, লেখক একজন দক্ষ ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন।**

পুঁথিটিতে লেখকের যুক্তিগুলোও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিটি নতুন যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে লেখক শুরু করার সময় কোরআন থেকে আয়াত, হাদিস, ফতোয়া অথবা ধর্মীয় কোন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এগুলো আরবি, ফার্সি এবং উর্দু গ্রন্থ থেকে নেয়া। এগুলো বাংলা উদ্ধৃতিগুলোর পর সন্নিবেশিত হয়েছে।

সব মিলিয়ে ৫৭ টি উদ্ধৃতি আমরা এই পুঁথিটিতে দেখি। এগুলোর দ্বারা ফরায়েযী মতাদর্শসমূহ আলাদাভাবে আমরা দেখতে পাই। পূর্বে উল্লেখিত মাওলানা কেরামত আলীর কার্যবিবরণীতে এই পুঁথির সারাংশ রয়েছে। তাছাড়া নিম্নোক্ত পুঁথিগুলোতেও তা পাওয়া যায় ঃ

৫। নাজিম উদ্দীন "পুঁথি" পৃষ্ঠা সংখ্যা, ১২০। বাংলা ভাষায় লিখিত ফরায়েযী মতাদর্শ সম্বলিত একটি পুঁথি। এটির প্রচ্ছদ, ভূমিকা ও শেষের দিকের কিছু পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। পুঁথিটির মধ্যে অর্থাৎ প্রধান অংশটি (১৬ পৃষ্ঠা থেকে ১১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) দুরর ই মোহাম্মদ লিখিত পুঁথিটি ৩২ পৃষ্ঠা থেকে ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। পুঁথির ভনিতায় দুরর ই মোহাম্মদ নামের স্থলে নিজের নাম নাজিম উদ্দীন উল্লেখ করা ছাড়া নিজের লিখিত কোন কিছুই উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে নেই। উপরন্তু দুরর ই মোহাম্মদের লিখিত পুঁথির শেষাংশ পাওয়া যায়নি এবং এটির অন্য কপিও না থাকায় এটা বলা যাচ্ছে না যে নাজিম উদ্দীনের পুঁথির ১১১-১২০ পৃষ্ঠার অংশটি দুরর ই মোহম্মদের পুঁথি থেকে নেয়া হয়েছে কি হয়নি।

নাজিম উদ্দিনের পুঁথির প্রথম ৩১ পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় 'ইসতিহাদ'ও তকলিদ সম্পর্কে ফরায়েযী দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং আমরা ধারণা করতে পারি যে নাজিম উদ্দিনের পুঁথিটি দুরর ই মোহম্মদ লিখিত পুঁথিটির প্রধান অংশ নিয়ে ভূমিকা সহকারে পুণর্লিখিত হয়েছে।

---

১৭ এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়

উক্ত প্রমাণ দ্বারা নাজিম উদ্দিন ও দুরর ই মোহাম্মদ সম্ভাব্য একই ব্যক্তি হতে পারেন মর্মে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ফরায়েযীদের সময়কালীন প্রধান নেতা বাদশা মিয়া (১৯০৬ সালে নির্বাচিত) উক্ত ধারণা নাকচ করেছেন। বাদশা মিয়া মৌলবী নিজাম উদ্দিনকে একজন জ্ঞানী ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে জানতেন। তাছাড়া নাজিমউদ্দিন তাঁর পিতা খাঁন বাহাদুর সাইদ উদ্দিনের সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন। কিন্তু দুরর ই মোহাম্মদ নাজিম আলদীনের ছদ্মনাম ছিল কিনা সে বিষয়ে বাদশা মিয়া নিশ্চিত নন। খাঁন বাহাদুর সাঈদ উদ্দীনের জীবনী থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, মৌলবী নিজাম উদ্দিন তাঁর সাথে ১৯০৬ সালে বিহারের স্বাস্থ্য নিবাস মধুপুর গিয়েছিলেন। এ ছাড়া খাঁন বাহাদুর ঐ স্থানে যখন মৃত্যুবরণ করেন তখনও নিজাম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত দুটি পুঁথির ভাষার তুলনা করলেও পার্থক্য ধরা পড়ে। নিজাম উদ্দিন লিখিত পুঁথির ভূমিকাতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর সঙ্গে দুরর ই মোহাম্মদের পুঁথির ভাষাতে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। দুরর ই মোহাম্মদের ভাষা নিজাম উদ্দিনের চেয়ে অনেক বেশী সাবলীল ও উন্নত।

সুতরাং নিজাম উদ্দিনের পুঁথি সম্পর্কে আমাদের বলতে হয় যে, এটি ছিল এক ধরনের নকল। তবে আমরা জানি যে নিজাম উদ্দিন একজন ফরায়েযী ছিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য হল ফরায়েযী মতবাদ অনুধাবন করা। তাই এই ক্ষেত্রে উক্ত লেখকের চরিত্র জানার চেয়ে ফরায়েযী মতাদর্শ সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া যায়।

৬। ওয়াজির আলী : "মুসলিম রত্নহার" এই পুঁথিটিতে শুরু থেকে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়ের ফরায়েযী নেতাদের জীবনী অংকিত হয়েছে। এটা এই বর্তমান গ্রন্থ রচনার ৩০ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এই কর্মের কোথাও কোথাও অবিন্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। এই পুঁথিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৫। বর্তমান গবেষণায় এটি মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য উপাত্তের সঙ্গে যাচাই করে ব্যবহার করা হয়েছে।

৭। মুন্‌শী আবদুল হালিম : "হাজী শরীয়তুল্লাহ্" হাজী শরীয়তুল্লাহ্'র জীবনী সম্পর্কিত একটি পাণ্ডুলিপি। এটি ২২ ডবল পাতায় বাংলা ভাষায় লিখিত। লেখক ১৯২৮ অথবা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বংশের পূর্ব পুরুষদের পারিবারিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে এই পাণ্ডুলিপিটি তৈরি হয়েছে। তদানীন্তন ফরায়েযী প্রধানের মতে লেখকের পিতামহ মৌলবী ইহসান উল্লাহ ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক। এই দু'জনেই মক্কার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহপাঠী ছিলেন। শেষ জীবনে মৌলবী ইহসান উল্লাহকে হাজী শরীয়তুল্লাহ খলিফা মনোনীত করেন। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এবং অতঃপর পৌত্র মুনশী আবদুল হালিম খলিফা ছিলেন। বাদশা মিয়া বর্তমান গ্রন্থের লেখককে পাণ্ডুলিপিটি প্রদান করেন।

পাণ্ডুলিপিটি একটি তথ্যবহুল রচনা যা হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। আমরা পারিবারিক ঐতিহ্যসমূহ মূল্যবান তথ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি।

৮। মৌলবী আদিল উদ্দিন : "হালাত-ই-কারগুজারী" ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়ের হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তার পরিবারের জীবনী সম্পর্কে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি। এটি ২৭ ডবল পাতায় ফার্সি ভাষায় লিখিত। লেখক একজন ফরায়েযী ধর্মতত্ত্ববিদ ও খান বাহাদুর সাইদ উদ্দিনের শিষ্য ছিলেন। তিনি মাদারীপুরেব অধিবাসী ছিলেন। ১৯৫৮

সালে ৯০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লেখক ঢাকার মোহসিনিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন এবং চাঁদপুর মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি সরকার কর্তৃক কাযী বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন এবং এই পদে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। ঐ বছরেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত ফরায়েযী ধর্মতত্ত্ববিদ ও ফার্সি কবি ছিলেন। ফরায়েযী প্রধান বাদশাহ মিয়ার অনুরোধে আদিল উদ্দীন এই পাণ্ডুলিপিটি রচনা করেন। এই তথ্যটি পাণ্ডুলিপিটিতেও বলা হয়েছে। অন্যান্য উপাত্তসমূহের সাথে বেশী মিল না থাকায়, এই পাণ্ডুলিপিটি আমরা বেশী ব্যবহার করিনি।

৯। একটি হস্তলিখিত সনদ : এই সনদটি ফরায়েযী প্রধান আবু খালিদ রশিদ উদ্দীন আহম্মেদ কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। এই সনদ ১৯৩৬ সালে ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার বাজরীখোলা গ্রামের মুনশী ইরফান উদ্দীনের খিলাফত বংশানুক্রমিকভাবে প্রদান করেছে। ১৯৫৮ সালে বর্তমান লেখক উক্ত গ্রামের ফরায়েযী বসতি পরিদর্শনের সময় সনদটি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

উক্ত সনদের একটি সত্যায়িত কপি বর্তমান লেখকের কাছে রয়েছে। সনদটি দ্বারা বর্তমান সময় পর্যন্ত ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব প্রমাণিত হয়।

ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কিত সমসাময়িক উপাত্তসমূহ

নিম্নোক্ত বিবরণীতে আমরা ফরায়েযী আন্দোলন বিকশিত হওয়ার চিত্র দেখব। উপরন্তু এই সকল উপাত্তসমূহ ফরায়েযী আন্দোলনের বিরোধীরা সরবরাহ করেছে। ফরায়েযী বিরোধীরা এই সংস্কার আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তাই এই উপাত্তসমূহ দ্বারা আমরা ফরায়েযী উপাত্তসমূহকে যাচাই করতে সক্ষম হয়েছি।

(১) বেঙ্গল ক্রিমিনাল জুডিশিয়েল কনসালটেন্স (লোয়ার প্রভিন্সেস) ৩রা এপ্রিল, ১৮৩২, নং ৬ : ১৮৩১ সালের ২৯ শে এপ্রিলে প্রেরিত ঢাকা জালালপুর মেজিস্ট্রেটের রুবোকারি। এটি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। রুবোকারি হলো ঢাকা-জালালপুর মেজিস্ট্রেটের একটি সরকারি প্রতিবেদন। ঢাকা- জালালপুর এলাকাটি বর্তমানের ঢাকা ফরিদপুর অঞ্চল। এই রিপোর্টটি ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি ফৌজদারী মামলা সম্পর্কিত। ঢাকা জেলায় ফরায়েযী বিরোধী একটি গ্রাম আক্রমণ করে ফরায়েযীগণ যে নির্যাতন করে, তার উপর ভিত্তি করে মামলাটি দায়ের করা হয়। দলিলটি গ্রন্থাকার কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।[১৮]

(২) জেমস টেলর : A Sketch of the topography and Statistics of Dacca, Calcutta, ১৮৪০, পৃ: ২৪৮-৫০। উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত সংস্কারের বিবরণ রয়েছে। হাজীর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে টেলর এই বিবরণ লিখেছেন।

---

১৮ JASP. vol. vi, পৃ. ১১৯-২৪।

(৩) মি: ডাম্পিয়ারের পুলিশ রিপোর্টের অংশ। এই রিপোর্টে ১৮৪২ সালে একজন হিন্দু জমিদারের উপর ফরায়েযী কৃষকদের আক্রমণ সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। এটি Calcutta Riview, vol. i. A.D. ১৮৪৪. পৃ. ২১৫- ১৬ তে প্রকাশিত হয়।

(৪) পার্লামেন্টারি নথিপত্র ঃ ১৮৬১, খণ্ড, XLIV ইণ্ডিগো কমিশন। বিভিন্ন সাক্ষী প্রমাণের বিবরণীর অংশ। পৃ-২৬৪। এডোয়ার্ড ডি, লাটোরের দেয়া সাক্ষী প্রমাণ। ১৮৬০ সালের ৩১শে জুলাই একটি তদন্ত কমিটির কাছে উক্ত সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। উত্তর নং ৩৯১৬, ৩৯১৭, ৩৯১৮ এবং ৩৯১৯ (ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লণ্ডন) উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় এডোয়ার্ড ডি. লাটোর ছিলেন সিভিল ও সেশন জজ। কিন্তু এর পূর্বে তিনি নীল চাষের এলাকা মালদা ও দিনাজপুরে মেজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেন। ১৮৪৭ সালে দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের ফরিদপুর সেশন কোর্টে বিচার করা হয়। মি. ডানলপের পাঁচচর নীলকুঠি আক্রমণের দায়ে তাদেরকে বিচারাধীন করা হয়। এই সময় জয়েন্ট মেজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে ডি.লাটোর ঐ স্থানে কর্মরত ছিলেন এবং এই মামলার বিষয়ে আগ্রহ সহকারে কাজ করেন।

ইউরোপীয়দের নীলকরদের উপর নির্যাতন ও দুদু মিয়ার সঙ্গে ডানলপের বিরোধিতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আমাদেরকে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করেছে।

(৫) এইচ বিভারিজ : The District of Bakergonj its History and Statistics, london, A.D. ১৮৭৬, পৃ. ৩৩৯-৩৪: ১৮৪৬ সালে মি ডানলপের নীল কুঠির উপর ফরায়েযীদের আক্রমণের বর্ণনা উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৮৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি এবং ২০শে জুলাইতে লিখিত মেজিস্ট্রেটের ২ টি চিঠির উপর ভিত্তি করে উক্ত বর্ণনা লেখা হয়।

(৬) জেমস ওয়াইজ : Notes on the Races, castes and Trades of Eastern Bengal, london. A.D.1884, c-22-26: A sketch of the life and Career of Haji Shariat Ullah and Dudu Miyan.

(7) Col–J.E.Gastrell : Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore Faridpore --and Bakerganj, calcutta, ১৮৬৮ খ্রি. পৃ. ৩৬ নং ১৫০-১৫১, ফরায়েযী বসতি সমূহের বিবরণ।

(8) Hanter(ed), Imperial Gazetteer of India, London, and ed, ১৮৮৫ খ্রি:. খণ্ড, ৪র্থ, পৃ-৩৯৮-৪০০। 'ফরিদপুর শেষের দিকের ফরায়েযীদের সম্পর্কিত বিবরণ।

(৯) মাওলানা কেরামত আলী : তাজকিয়াত ই আকাইদ (উর্দু) কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরী, মাওলানা কেরামত আলীর রচনা সংকলন যখীরা ই কেরামত এ সন্নিবেশিত, এটি প্রকাশ করেছেন মোহাম্মদ সাঈদ, ভলিউম ১, পৃ. ৬৩-৮৪ : এটাতে ফরায়েযী মতাদর্শের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়েছে।

(১০) মওলানা কেরামত আলী : হুজ্জাত ই ক্বাতি (উর্দু) কলিকাতা ১৩৪৪ হিজরী ঃ যখীরা ই কেরামত, খণ্ড, ১, পৃ. ৮৫-১২৪ হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং দুদু মিয়ার সঙ্গে মওলানা কেরামত আলীর সাক্ষাৎ এবং ফরায়েযী ধর্মতত্ত্ববিদ খলিফা আবদুল জব্বার এর সঙ্গে বিতর্কের বিবরণ উক্ত গ্রন্থে রয়েছে।

(১১) নবীন চন্দ্র সেন : আমার জীবন (বাংলা) কলিকাতা ১৩১৭ বঙ্গাব্দ খণ্ড ৩, পৃ. ১৪২-৪৬ এবং ১৪৯-৫৫ মাদারীপুরের হিন্দু জমিদারের সাথে ফরায়েযী কৃষকদের সংঘর্ষের বিবরণ এই অংশে রয়েছে।

সমসাময়িক মুসলিম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর যে সকল উপাত্ত আলোকপাত করেছে তাঁর বিবরণ :

(১) মওলানা কেরামত আলী : মাকাশিফাত ই রাহমাত (উর্দু)কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরী ঃ যখীরা ই কেরামত সংকলিত, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১ পৃপৃ ১-৩২ উনিশ শতকের মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদাত বা নব উদ্ভাবিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ।

(২) মওলানা কেরামত আলী : কুত্তআত আল সাবিত (উর্দু) কলিকাতা ১৩৪৮ যখীরা ই কেরামত এ সংকলিত খণ্ড-২ পৃ (১-১০৭) মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচার সম্পর্কিত।

(৩) মওলানা কেরামত আলী : মাকামী আল মারতাদঈন (উর্দু) কলিকাতা ১৩৪৮ হিজরী ঃ যখীরা ই কেরামত এ সংকলিত, খণ্ড-২, পৃ. (১৭৭-২০০) স্থানীয় আচার সমর্থকদের বিরুদ্ধে মওলানার বিতর্ক সম্পর্কিত।

(৪) মওলানা কেরামত আলী : হক্কআল ইয়াকিন (উর্দু) কলিকাতা ১৩৪৮ হিজরী যখীরা ই কেরামত, খন্ড-২, খৃ. পৃ. (২০১-২২৪) : মুসলিম বাংলার ধর্মীয় সামাজিক আচার সম্পর্কিত বিবরণ।

(৫) হাফিজ আবদুল শাকুর : ইলান ওয়াজিব আল ইজান মিলাদ ওয়া কিয়ামপার (উর্দু) কলিকাতা, ১২৯৫ হিজরী : মিলাদের সময়ে দাঁড়িয়ে কিয়াম করার ধর্মীয় আচার সম্পর্কিত সমালোচনা।১

(৬) মওলানা বিলায়েত আলী : আমল বিল হাদিছ (ফার্সী) ১৮৩৭ সাল এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা, এর কপি আছে। নবীজীর হাদিস পালনে অগ্রাধিকার রেখে মজহাব অনুসরণ সম্পর্কিত লেখকের উৎসাহ ব্যঞ্জক নীতির বিবরণ।

(৭) মওলানা কেরামত আলী : কুত্তআত আল ঈমান (উর্দু) কলিকাতা, ১২৫৩ হিজরী । মওলানা কেরামত আলী কর্তৃক নবীজীর হাদিস ও মজহাব প্রদত্ত নিয়মাবলী স্বতন্ত্রভাবে পালনের নীতি সম্পর্কিত বিবরণ।

(৮) মৌলবী আবদুল জব্বার : জওয়াব ই কুত্তআত আল ঈমান (উর্দু) ১৮৩৭ খ্রি। মওলানা কেরামত আলীর গ্রন্থ কুত্তআত আল ঈমানের সমালোচনা।

(৯) মওলানা আবদুল আলী : সাহিফাত আল-আমাল ওয়া সিরাত আল আহওয়াল (ফার্সী) ১৩০২ হিজরী উনিশ শতকের শেষার্ধে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন দল সম্পর্কিত বিবরণ। এই গ্রন্থটি বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম সমাজের চিত্র বিবৃত করেছে।

(১০) মৌলবী ফরিদ আহম্মদ : ফার্সি ভাষায় 'ফাতেহা' পাঠের বৈধতা সম্পর্কে ফতোয়া। (বর্তমান লেখক কর্তৃক চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত)।

(১১) মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল কাদির : ফতহুল মুবীন ফি রাদ ই জাফর আল মোবিন (মিশ্র আরবি ও উর্দু) ১৩০০ হিজরী। সনাতন ধর্মীয় সামাজিক আচারের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে রচিত।

(১২) মৌলবী সাইফুল্লাহ খান : উর্দু ভাষায় লিখিত মিলাদ শরীফের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ফতোয়া।

সরকারি নথি

নিম্নোক্ত নথিসমূহ বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের ধর্মীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর অনেক তথ্য প্রদান করে। সমসাময়িক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কেও অনেক তথ্য এই নথিগুলোতে রয়েছে।

ঢাকা - জালালপুর জেলার একটি পুলিশ রিপোর্ট ১৭৯৯ সালে প্রেরিত এই রিপোর্টে এলাকার জনসাধারণের আচরণ এবং নৈতিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বঙ্গীয় সরকারের নির্বাচিত নথিসমূহ। নং xxx-III, বাংলায় নীল চাষ সম্পর্কিত নথিপত্র কলিকাতা, ১৮৬০ খ্রি. ১২১১ পৃষ্ঠা।

বিখ্যাত ওয়াহাবী মামলা সম্পর্কিত প্যাম্‌ফলেট আমীর খান ও হাশমদাদ খানের বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের কার্যবিবরণী। কলিকাতা ১৮৭০ সাল।

লুইস এ, ম্যানডেস : আমীর খান ও হাশমদাদ খান সম্পর্কিত কার্যবিবরণীর উপর রিপোর্ট। ২য় অংশ কলিকাতা হাইকোর্টে তালিকাভুক্ত। আপিল মামলা নং-৩৭, কলিকাতা ১৮৭১ খ্রি.।

হাফিজ আবদুল্লাহ গাজীপুরী : ইবরাই আহল ই হাদিছ ওয়াল কোরআন মিম্মা ফি জামি আল শাওয়াহিদ মিন আল-তোহমাত ওয়াল বুহতান (উর্দু) বেলারস। ১৩০৪ হিজরী হানাফী ও আহল-ই হাদিছ এর মধ্যে আনীত মামলার কার্যবিবরণীর পুনঃপ্রকাশ।

১৮৪৭ সালে ঢাকা সেশন জজ কোর্টে অনুষ্ঠিত দুটি মামলার কার্যবিবরণীর অনুবাদ। এই মামলাগুলোতে দুদু মিয়া ও তাঁর ৬৩ জন অনুসারীদের বিচার হয়েছিল। জখম, লুট ও অস্ত্রবহন করার দায়ে অভিযুক্ত করে একটি মামলা পরিচালিত হয়েছিল। অপরটি পাঁচচর নীলকুঠির মি. ডানলপকে আক্রমণ করার জন্য দুদু মিয়া ও তাঁর ৬৩ জন অনুসারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই সাথে নীলকুঠির হিন্দু ম্যানেজারকে অপহরণের বিষয়টিও ছিল। কার্যবিবরণটি মিলিটারী অরফেন প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত। কলিকাতা, ১৮৪৮ খ্রি. ৩১৪+৪০১ এর পর থেকে এই গ্রন্থে এটি Trial of Dudu Mia রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শিরোনামেই এটি পরিচিত।

মুঈন উদ-দীন আহমদ খান : Selections From Bengal Government Records on Wahhabi Trials ১৮৬৩-১৮৭০.বাংলা ও মাদ্রাজ সরকারের নথি থেকে নির্বাচিত অংশ। বাংলা বিহার ও মাদ্রাজে সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কিত নথি। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ১৯৬১, ৪২৯ পৃষ্ঠা।

A Report of the Collector of Faridpure : এই রিপোর্টে বিভিন্ন কর ও অবৈধ চাঁদার বিবরণ রয়েছে ১৮৭২(গ্রন্থের পরিশিষ্ট গ দেখুন)।

A Report of the Collector of Faridpure : হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন জাত এর সংখ্যাগত রিপোর্ট। (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ক) ১৮৭২।

A Report of the Collector of Faridpur : এই জেলার জমির খাজনার হার সম্পর্কিত রিপোর্ট ১৮৭২ সাল (দেখুন পরিশিষ্ট ঘ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে হাজী শরীয়তুল্লাহ ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনকে ফরায়েযী আন্দোলন নাম দেয়া হয়। উনিশ শতকের গোড়াতে শুরু হওয়া এই আন্দোলনটি বর্তমানকাল পর্যন্ত চলছে। আন্দোলনটি পূর্ববাংলা ও আসামে, বিশেষ করে পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।[১] ফরায়েযী শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ ফরায়েদ থেকে। ফরায়েদ হল ফরীদ্বাহ বা ফরীদ্বাতুন এর বহুবচন। তবে ফার্সি ভাষার অনুকরণে বাংলায় এর উচ্চারণ হয় ফরায়েয এবং তা থেকে 'ফরায়েযী'। ধর্মে অবশ্য পালনীয় কর্মসমূহকে সূচিত করে। সুতরাং এই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে যাঁরা আন্দোলন করেছে তাদেরকে ফরায়েযী বলা হয়। যাহোক, ফরায়েযীগণ ফরাইজ শব্দটি ব্যাপককার্যে ব্যবহার করেছে। এরা সৃষ্টিকর্তা ও নবীর নির্দেশিত সকল ধর্মীয় কর্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে।[২] যদিও ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে বেশি। ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয় হলো (ক) কালিমা (খ) নামাজ (গ) রোজা (ঘ) যাকাত (ঙ) হজ্জ।[৩] এই পাঁচটি প্রধান বিষয় পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবন করাই ছিল ফরায়েযীদের লক্ষ্য। বাংলার মুসলিম সাধারণ সমাজ, ইসলামের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে উদাসীন থেকে, নানা ধরনের উৎসব স্থানীয় আচার পালনে অভ্যস্ত থাকার কারণেই ফরায়েযী আন্দোলন সূচিত হয়।

সুতরাং ইতিহাসের দৃষ্টিতে ফরায়েযী আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজকে আত্মশুদ্ধি করার লক্ষ্যেই সূচিত হয়েছিল। বাংলার অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা ছিল ফরায়েযী আন্দোলন। এই কৃতিত্ব হাজী শরীয়তুল্লাহর (মৃত্যু ১৮৪০ খ্রি.) প্রাপ্য। মুসলিম সমাজে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। তিনি বাংলার জনগণের ধর্মীয় আদর্শ 'হানাফী' মজহাবের ব্যক্তি ছিলেন যা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।[৪]

---

১ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়।

২ ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ফরীদ্বাহ অবশ্য করণীয় বিষয়। এটা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বাস এবং পালনের মাধ্যমে তা করতে হবে। সাধারণভাবে ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো শরীয়া অনুমোদন করেছে, (ক) ফরজ বা অবশ্য করণীয় (খ) ওয়াজিব বা পালন করা আবশ্যক (গ) সুন্নাহ বা নবীজীর কর্মজীবন যা পালন করা প্রয়োজন। (ঘ) মোস্তাহাব বা পালন করা প্রত্যাশিত, ফরায়েযীগণ শুধু প্রথমটি নয় বরং সবগুলো পালনে গুরুত্ব প্রদান করেছে যা তাদের তত্ত্বের সম্পর্কিত তত্ত্বে লক্ষণীয়, দেখুন গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৩ বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়।

৪ দেখুন বর্তমান লেখকের "Tomb Inscription of Haji Shariatullah. JASP vol. iii. 1958 পৃ. ১৯৫ ও তারপর।

দ্বিতীয়ত মতবাদ সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ফরায়েযীগণ তাওহীদ বা একত্ববাদী আদর্শ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ নির্দিষ্ট করে। ফরায়েযীগণ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাসেই সন্তুষ্ট ছিল না। ওরা এই বিশ্বাসকে বাস্তবেও পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফরায়েযীগণ মুসলিম সমাজকে পৌত্তলিক সামাজিক আচারের সঙ্গে সামান্যতম যোগসূত্র আছে এমন সকল বিশ্বাসকে পরিহার করার জন্য আহ্বান জানায়। এভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ সমাজে প্রচলিত সকল স্থানীয় আচার আচরণ ও উৎসবকে অনৈসলামিক বলে ঘোষণা করেন। কারণ এসকল আচার ও সামাজিক রীতি কোরআন ও সুন্নাহ সমর্থন করে না বরং এগুলো শিরক ও বেদআত বলে তিনি মত দেন। এভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েযী মতাদর্শের সমাজ থেকে অনৈসলামিক সকল আচার-আচরণ বিলুপ্ত করেন।[৫] সুতরাং 'তাওহীদ' সম্পর্কে ফরায়েযীদের ধারণা শুধু সাধারণভাবে একত্ববাদে ফিরে যাওয়া নয় বরং ইসলামী রীতিনীতিকে যেসব বিশ্বাস ও আচার-আচরণ ঘিরে রেখে ছিল সেগুলোকে পরিহার করা।[৬]

এভাবে ফরায়েযী আন্দোলনকে শুদ্ধিবাদী পুনর্জাগরণ আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে প্রকৃত ইসলামে ফিরে যাওয়া এবং অন্যদিকে মুসলিম সমাজকে পরিশুদ্ধ করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য শুদ্ধিবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে ফরায়েযী আন্দোলনের কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একই সময়ে আরবের ওয়াহাবী আন্দোলন এবং তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনও (ভারতীয় ওহাবীবাদ হিসাবে ভুলভাবে চিহ্নিত) চলেছিল।

তৃতীয়ত হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলিম সামাজিক কাঠামোর নিম্নাংশ থেকে আগত কৃষক তাঁতী এবং তেলীদেরকে তাঁর অনুসারী হিসেবে পেয়েছিলেন। হাজী ছিলেন প্রধানত একজন ধর্মীয় সংস্কারক। জনসাধারণের অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর সামান্যই করার ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব যে ফরায়েযী কৃষকদের প্রতি হিন্দু জমিদারগণ ভাল আচরণ করেননি। হিন্দু জমিদারগণের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে হাজীর পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েযী সমাজে আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি প্রবর্তন করেন।[৭] ১৮৪০-৬২ সাল সময়ে দুদু মিয়া ফরায়েযীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই ব্যবস্থাটিকে খিলাফত ব্যবস্থা বলা হতো।[৮] এই ব্যবস্থায় ছিল :

(১) ফরায়েযীদেরকে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং (২) নিজেদের মধ্যে সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা। ফরায়েযী আন্দোলনের এই আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে অত্যাচারী নীলকর, তাদের এজেন্ট ও জমিদারগণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের সূচনা করে।[৯] সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলনকে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি আন্দোলনরূপে

---

৫ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, এই গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় এবং ৪র্থ অধ্যায়।
৬ দেখুন গ্রন্থের সেকশন 'খ' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)
৭ দ্রষ্টব্য গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
৮ দ্রষ্টব্য গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়।
৯ দেখুন গ্রন্থের ৪র্থ ও ৮ম অধ্যায়।

চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গে সূচিত তীতুমীরের আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের (১৮২৭-৩১) সাদৃশ্য রয়েছে।[১০] উল্লেখ্য যে ফরায়েযী আন্দোলন শুধু পূর্ববঙ্গ ও আসামেই বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লার মতো শহরগুলোতে এই আন্দোলন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এই শহরগুলোতে উচ্চবিত্ত মুসলিমদের প্রভাব ছিল বেশী। উপরন্তু ফরায়েযী আন্দোলন হিন্দু জমিদার প্রভাবান্বিত অঞ্চলগুলোতে বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিম কৃষক শ্রেণীর উপর হিন্দু জমিদারদের নিয়ন্ত্রণের কারণে এই আন্দোলন বাকেরগঞ্জ, ঢাকা,ময়মনসিংহ,ফরিদপুর ও ত্রিপুরা[১১] (বৃহত্তর কুমিল্লা) জেলায় বেশী বিস্তার লাভ করে। তা সত্ত্বেও কিছু বিত্তের অধিকারী বা স্বচ্ছল মুসলিম ফরায়েযী মতাদর্শের অনুসারী হয়েছে বলে জানা যায় না। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে ফরায়েযী আন্দোলন নিচুস্তরের মুসলিমদের মধ্যেই বেশী প্রভাব ফেলেছিল। কারণ পূর্ববঙ্গে এই স্তরের অধিকাংশ লোকেরা ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী স্পষ্টতই সামাজিক সাম্যতা[১২] নিশ্চিত করার জন্য নতুন আন্দোলনে যোগ দেয়। সাথে সাথে ভূ-স্বামীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেও মুসলিম সমাজ ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ দেয়। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে এই আন্দোলনে ধর্মীয়-সামাজিক বৈশিষ্ট্য পূর্ববঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দুদু মিয়ার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এই ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। দুদু মিয়া নীলকর ও জমিদারগণের নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করেন। ফলে নির্যাতিত মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় তাঁর পতাকাতলে জমায়েত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, এই বৈশিষ্ট্যের কারণে শহরের লোকেরা এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। সুতরাং আমরা দেখছি যে, শহর কেন্দ্রীক লোকেরা ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতি ছিল নিস্পৃহ। তা ছাড়া তাদের শহর জীবনের নিজস্ব সমস্যা সমাধান নিয়েই শহরবাসীরা মনোযোগী বেশী ছিল। ফরায়েযী নেতৃবৃন্দ যতদিন পর্যন্ত তাদের আন্দোলনে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত রাখতে পেরেছিলেন ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সাড়া দেখা যায়।

দুদু মিয়ার পর এই বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং বর্তমানে ফরায়েযীগণ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবেই টিকে আছে। সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলন ছিল একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন।

এই আন্দোলনের কিছু জটিল বৈশিষ্ট্য ছিল। এক দিকে ছিল সে সময়ের ইসলামী পুনর্জাগরণের বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে ছিল এই আন্দোলন গ্রাম বাংলার নিচুস্তরযুক্ত লোকদের আর্থ-সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব। তাই ফরায়েযী আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনের জন্য সমসাময়িক ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ ও বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। গ্রন্থের পরবর্তী তিনটি অংশে ফরায়েযী আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত সন্ধান করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

---

১০ দ্রষ্টব্য এই অধ্যায়ের "তীতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার"।

১১ দেখুন গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়।

১২ দেখুন ৪র্থ ও ৮ম অধ্যায়।

সেকশন - ক

উনিশ শতকে ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদ সমসাময়িক কিছু ধর্মীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এগুলো ছিল :

(১) দিল্লীর তরীকা ই মোহাম্মদীয়া এবং আরবের ওয়াহাবী আন্দোলন। এই তিনটি ছিল উনিশ শতকের ইসলাম পুনরুজ্জীবনবাদের প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলন। অন্য দুটি আন্দোলনের মতাদর্শের সাথে ফরায়েযী মতাদর্শের কিছু সাদৃশ্য থাকায় গবেষকবৃন্দ প্রায়শই এই আন্দোলন সম্পর্কে ভুল মন্তব্য করে থাকেন। একইভাবে তরীকাই মোহাম্মদীয়াকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া : দিল্লীর সৈয়দ আহম্মদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১) এবং শাহ্ ইসমাইল শহীদ (১৭৮২-১৮৩১) যখন এই ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন, তখন একই সময়ে হাজী শরীয়তুল্লাহও পূর্ব বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলন শুরু করেন (১৮১৮খ্রি.) ইউরোপীয় লেখকবৃন্দ এই আন্দোলনকে "ভারতীয় ওয়াহাবীবাদ" বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে হান্টারের লিখিত Our Indian Musalmans, Encyclopedia of Islam এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের উপাত্তসমূহ দ্বারা এই ধারণা সমর্থিত হয়নি।

(ক) সৈয়দ আহমদ শহীদ বলেছেন, আমার তরীকা (পথ) হল আমার পিতামহের তরীকা বা নবীজীর পথ। একইভাবে আমি একদিন একটি শুষ্ক রুটি দিয়ে একবেলা আহার করি এবং প্রতিপালক প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অন্যদিন আমি ক্ষুধার্ত থেকে রোজা করি ধৈর্যধারণ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

(খ) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ শহীদের একজন বিরোধী তাকে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

এর উত্তরে সৈয়দ শহীদ তাঁর তরীকাকে "তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া" বলে আখ্যায়িত করেন।[১৩] উক্ত প্রশ্নের একটি দীর্ঘ প্রতিউত্তর দিয়েছেন সৈয়দ শহীদের অনুসারী মওলানা ইরতিজা আলী।

এর উত্তরে তিনি বলেন যে "তরীকা ই মোহাম্মদীয়া" হল একটি সাধারণ পরিচয় যার মধ্যে সুফিদের অন্যান্য তরীকাগুলোও রয়েছে।[১৪]

(গ) ১৮৩৭ সালে মওলানা কেরামত আলী সৈয়দের কিছু অনুসারী সম্পর্কে বলেন যে, এরা কোরআন এবং সুন্নাহ পালনের ব্যাপারে ইজতিহাদ করে ব্যবহার করার জন্য প্রচার করে। এরা নিজেদেরকে মোহাম্মদী হিসাবে পরিচয় দিত। মোহাম্মদী হল তরীকা ই মোহাম্মদীয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ।[১৫] পাটনার মওলানা বিলায়েত আলীর মাধ্যমে বিষয়টি

---

১৩ আবদুল্লাহ ইবনে সৈয়দ বাহাদুর আলী সম্পাদিত জওয়াব-ই-ইসতিফতা মীর মোহাম্মদ আলী মাতবা ই আহম্মদী ১২৪৫ হিজরি ১৮২৯ খ্রি. পৃ. ৯।

১৪ ঐ পৃ. ৯০।

১৫ দ্রষ্টব্য মওলানা কেরামত আলী : কুওয়াত আল ঈমান, কলিকাতা ১২৫৩ হিজরি (১৮৩৭) পৃ. ১৩৫ এবং ১৯৭।

আরও স্পষ্টভাবে জানা যায়। মওলানা কেরামত আলী বলেন যে, বিলায়েত আলী সৈয়দ আহম্মদের অনুসারী হলেও তিনি স্বতন্ত্র গ্রুপের ব্যক্তি ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিলায়েত আলী নিজেকে মোহাম্মদী হিসেবে পরিচয় দিতেন।[১৬] তিনি এই মর্মে ব্যাখ্যা দেন যে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ তাঁর আন্দোলনকে মোহাম্মদী বলতে চাননি বরং এটিকে সকল তরীকা যেমন কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নকশাবন্ধি এবং মুজাদ্দেদী ইত্যাদি সুফি মতানুসারীদের সম্মিলিত নাম বলেছেন। তাঁর মতে মোহাম্মদীয়া ইসলামের পঞ্চম কোনো তরীকা নয় বরং এটি উক্ত সুফি মতবাদসমূহের সর্বোচ্চ আমল করার বিষয়।[১৭] সুতরাং মওলানা কেরামত আলী সুফি আদর্শে নিজেকে মোহাম্মদীয়া হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

(ঘ) মৌলবী ইনায়েত আলীর (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি সৈয়দ আহম্মদের মতাদর্শ বাংলা অঞ্চলে প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন)। পারিবারিক নথিতে দেখা যায় যে, বাংলায় তাঁর অনুসারীদেরকে মোহাম্মদী বলা হতো।[১৮]

(ঙ) এই আন্দোলনের একটি উত্তরাধিকারী আন্দোলন হিসেবে আহলে হাদিস[১৯] বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে আছে।

এই মতের অনুসারীগণ নিজেদেরকে মোহাম্মদী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এরা অন্যকোন মতাদর্শ নয় বরং নবীজীর পথকেই অনুসরণ করে থাকে বলে দাবি করে।

(চ) কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৭০ সালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ওয়াহাবী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন সৈয়দ আহম্মদ শহীদের অনুসারী।

এদেরকে 'ওয়াহাবী' হিসাবে আখ্যায়িত করলে এরা প্রতিবাদ করে এবং বলে যে, আমরা মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের অনুসারী নই। এদেরকে সুন্নী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য কোর্টের কাছে আপিল করে। অর্থাৎ এরা নবীজীর সুন্নাহর অনুসারী। অন্যকোন বেদাতী মতাদর্শের সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে।[২০]

(ছ) বিভান জোনস বলেছেন যে, সেরা মৌলবীগণ ব্যাপক সংস্কারের বিরোধিতা করে সৈয়দ আহম্মদ শহীদের অনুসারীদের ওয়াহাবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।[২১]

(জ) এই গ্রন্থের পরবর্তী অংশগুলোতে দেখানো হয়েছে যে সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

---

১৬ দেখুন এই গ্রন্থের 'তৃরীকাই মোহাম্মদীয় ঃ অনুসারীদের বিভক্তি শীর্ষক অংশ।

১৭ দ্রষ্টব্য, মৌলবী কেরামত আলী কুওয়াত আল ঈমান পূর্বোক্ত পৃ. ১৯৮।

১৮ দেখুন, আবদাল রহিম, আল দুরর আল মনসুর ফি তারাজিম ই আহল ই সাদিকপুর ইলাহাবাদ ১৩৪৫ হিজরি পৃ ১৩৩।

১৯ দ্রষ্টব্য হাফিজ আবদাল শাকুর : ইলান ওয়াজিব আল ইজান কলিকাতা ১৯৯৫ হিজরি পৃ. ১ . এবং আহমদ আলী, আকিদা ই মোহাম্মদী বা মজহব-ই-আহল- ই হাদিস (বাংলা) খুলনা ১৩৬২ বঙ্গাব্দ পৃ. iii- iv. (গ্রন্থটির শিরোনামেই বিষয়টি স্পষ্ট)

Pumphlet on India : The great Wahhabi case being a full Report of the Procudings in the maltees of Ameer khan and Hashmadad khan Calcutta. 1870. পৃ. ১।

L. Bevan Jones The People of the Mosque London, 1932 পৃ. ২০৬

আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন ঐতিহাসিক যোগসূত্র নেই এবং তাদের মতাদর্শের মৌলিক ভিত্তি রচিত হয়েছে ভিন্ন নীতিমালার উপর।[২২]

উপরোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে, সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীদের ওয়াহাবীবাদ অনুসারী বলা যায় না। উপমহাদেশের আধুনিক গবেষকগণ সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলনকে এই নামে অভিহিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।[২৩] গবেষকগণ ঐ পর্যন্ত এই আন্দোলনের কোনো সাধারণ নাম দিতে পারেননি।

তাসাদ্দুক হোসেন খালিদ এই আন্দোলনকে তারগিব-ই মোহাম্মদীয়া[২৪] বা তারগিব-ই সুন্নাত-ই-মোহাম্মদীয়া বলেছেন অর্থাৎ যে আন্দোলনের মাধ্যমে নবীজীর সুন্নত পালনে উৎসাহিত করা যায়। এই গ্রন্থের পরের পৃষ্ঠাগুলোতে দেখানো হয়েছে যে সৈয়দ আহমদ শহীদ পরিচালিত আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নবীজীর সুন্নত কড়াকড়িভাবে পালন করা (অর্থাৎ ইত্তিবা ই সুন্নত)। কিন্তু উল্লেখিত নামটি সৈয়দের অনুসারীগণ ব্যবহার করেননি।

ড. মাহমুদ হোসেন আরব দেশের ওয়াহাবী আন্দোলনের অংশ হিসাবে সৈয়দ আহম্মদের আন্দোলনকে চিহ্নিত করার জন্য হান্টারের যে প্রয়াস ছিল তা অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু তিনি এই আন্দোলনের বিকল্প কোনো নাম দেননি।

অন্যদিকে তিনি সৈয়দ আহম্মদ একটি নতুন সুফি তরীকা প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, যাঁর নাম ছিল মোহাম্মদীয়া।[২৫] পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সুফি তরীকা হিসাবে মোহাম্মদীয়া নামটি ব্যবহার করেছেন মওলানা কেরামত আলী। যদিও তিনি বলেছেন যে সৈয়দ আহমদ শহীদ চারটি সুফি তরীকায় সম্মিলনরূপ হিসাবে মোহাম্মদীয়া ব্যবহার করেছেন। এই নামটি সুফি বিষয়ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা আমরা পূর্বে উল্লেখিত"খ"যুক্তিতে দেখেছি। একইভাবে "ক" যুক্তি প্রমাণে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ তরীকা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি এই শব্দটি সুফিবাদের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করেননি। এই বিষয়টি সতর্কভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রথমত সৈয়দ আহমদ শহীদ বলেছেন যে, তাঁর 'তরীকা' হল নবীজীর তরীকা। তিনি আরও বলেন তাঁর সৈনিকগণ হলেন মোহাজেরদের মতো মদীনার হিজরতের সময় নবীজীর অনুসারী যারা ইসলাম এবং সৃষ্টিকর্তার জন্য নিজেদের জীবন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।[২৬] একই গ্রন্থের অন্য স্থানে তিনি বলেন, আমরা আমাদের পরিবার ও স্বজন ত্যাগ করেছি আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং নবীজীর সুন্নত

২২ বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত।

২৩ দেখুন S.M. Ikram, মাওজ ই কাওসার, লাহোর ১৯৪৮ পৃ. ২৮ এবং History of the Freedom Movement করাচী ১৯৫৭ পৃ. ৫৬৪।

২৪ দ্রষ্টব্য Abdullah Butt (edited) Aspects of Shah Ismail Shahid, Lahore 1943 পৃ. ৬৫ থেকে।

২৫ দেখুন History of the Freedom Movement, পূর্বোক্ত পৃ. ৫৬৪ - ৫৭২.

২৬ গোলাম রসুল মেহের : জমাআত ই মুজাহেদীন, পূর্বোক্ত পৃ. ৬৯।

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য।[২৭] সুতরাং উক্ত পটভূমিতে বলা যায় যে, তিনি পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং নবীজীর সুন্নত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এখানে সৈয়দ আহমদ শহীদ শুধু সুফিবাদের উন্নতির কথা বলেননি। তাই তাঁর ব্যবহৃত তরীকা সুফিবাদ অর্থে ব্যবহার না করে শাব্দিক অর্থে পথ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

"তরীকা" শব্দের ব্যাখ্যা পুনরায় সমর্থন করেছে একটি গ্রন্থ সিরাত আল মোস্তাকিম। সৈয়দ আহমদ শহীদের সংস্কার কর্মসূচীর উপর লিখিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। সৈয়দ শহীদ তাঁর কর্মসূচিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। যেগুলোকে তিনি 'রাহ' বা পথ (আরবী তরীকা শব্দের ফার্সি প্রতিশব্দ) এই ভাগগুলো ছিল (ক) রাহ ই বিলায়েত বা সুফিবাদের পথ এবং (খ) রাহ ই নবুয়াত যা প্রচারের পথ, একটি হলো অপরটির পরিপূরক।[২৮] অন্যকথায় বলা যায় যে তাঁর সংস্কার কর্মসূচি ছিল শরীয়া এবং তরীকা'র সংমিশ্রণ। তাঁর কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার সময় বায়াত ই তওবা নিতে হতো। তাঁর কর্মসূচির অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে সুফিতত্ত্বকে আলাদা করা সম্ভব ছিল না। তাঁর বায়াত ই তওবা (সুফিদের আদর্শে অংশ নেয়ার প্রাথমিক পদ্ধতি) সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ বলেন।[২৯]

এই পথের (অর্থাৎ নবীজীর পথ) অনুসারীকে শরীয়ার নিষেধাজ্ঞাসমূহ পালন করতে হবে। অর্থাৎ বিশ্বাস, কর্ম, নৈতিকতা, আন্তরিকতা, ইচ্ছা এবং প্রার্থনার ক্ষেত্রে তা মানতে হবে। একজন অনুসারীকে কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে নিয়ম কানুন গ্রহণ করতে হবে। এই ব্যক্তি যদি কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন তাহলে নবীজীর সুন্নত সম্পর্কে বিজ্ঞদের সাহায্যে আরও আলোকিত হতে পারবেন।

সুতরাং বলা যায় যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ নবীজীর সুন্নতকে পালনের বিষয়ে পুনরুজ্জীবন ছাড়া আলাদাভাবে কিছু করেননি। আমাদের মতে সৈয়দ আহমদ শহীদের সংস্কার আন্দোলনকে তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলন বলা যায়। কারণ এই নামটি সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁর অনুসারীগণ ব্যবহার করেছিলেন। তরীকা ই মোহাম্মদীয়া ওয়াহাবীবাদ ও এই মতাদর্শসমূহের অনুমোদিত বিষয়সমূহ। তরীকা ই মোহাম্মদীয়া ধারণাটির অর্থ হলো মুহম্মদের পথ বা ইসলামের প্রকৃত পথ। এটা দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬০ খ্রি.) সংস্কারধর্মী ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত ধারা। অন্যদিকে আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন নজদের মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩ - ১৭৯২)। সম্প্রতি আমরা একটি প্রবন্ধে বলেছি যে অষ্টাদশ শতকের এই দুইজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ মক্কা ও মদীনার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ধর্মীয় আদর্শ গ্রহণ করেছেন। এই মতাদর্শ মুসলিম বিশ্বে একটি নবযুগের সৃষ্টি করে। যার ফলে সূচিত হয় ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ আন্দোলন। এই আন্দোলন ইজতিহাদের উপরবিশেষ গুরুত্বারোপ করে।[৩০]

---

২৭ ঐ পৃ. ৬৮।

২৮ শাহ্ ইসমাইল : সিরাত আল মোস্তাকিম (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকায় সংক্ষিত আছে)।

২৯ ঐ পৃ. ১৪৪।

৩০ দেখুন বর্তমান লেখকের Shah waliullah Conception of Ittihad, JPHS. vol. part iii. 1959 পৃ. ১৬৫ এবং ১৯৩

কোরআন এবং সুন্নাহ'র উপর নতুন অনুসন্ধান মতাদর্শগতভাবে এই আন্দোলনে কয়েকটি বিষয়ে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করে। প্রথমত মযহাবগুলোই ধর্মীয় পথের চূড়ান্ত, এই ধারণাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। দ্বিতীয়ত ধর্মের নীতি হিসেবে তকলিদ এর বিরুদ্ধেও একই ধারণা পোষণ করা হয় এবং তৃতীয়ত নবীজীর সুন্নত পালনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে মযহাব কর্তৃক নির্দেশিত ফিকাহ এবং ফতোয়া'র বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করা হয়।[৩১] উক্ত প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, হিজরীর চতুর্থ শতকের পর থেকে তকলিদ ধীরে ধীরে ইজতিহাদকে ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে চারটি মযহাব হানাফী, শাফী, মালিকী এবং হাম্বলী মযহাবগুলো কার্যত বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। মযহাবগুলো সর্বজন স্বীকৃত এবং চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। এর ফলে প্রতিটি মুসলিমকে চার মযহাবের যে কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়।[৩২] সুতরাং ইজতিহাদ এর উপর গুরুত্ব প্রদান করার ফলে পুরো বিষয়টি উল্টো দিকে মোড় নেয়। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ বলেন,নবীজীর আদর্শ গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছে। তবে তা তকলিদ বা অন্যকিছুর মাধ্যমে নয়, বরং ইজতিহাদ বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে।[৩৩] ওয়াহাবিবাদের নীতির উপর বিবৃতি প্রদান করতে গিয়ে মোহাম্মদ ইবন আবদ আল ওয়াহাব বলেন :[৩৪]

"ধর্মের সর্বক্ষেত্রে আমরা আমাদের যুক্তি প্রয়োগ করতে চাই না। কোরআন এবং সুন্নাহতে যদি কোন বিষয় সুস্পষ্টভাবে বলা থাকে এবং তা বাস্তবে পালিত হতে থাকে এবং সে সম্পর্কে আমরা আমাদের যুক্তি প্রয়োগ করব না"।

অষ্টাদশ শতকের এই দুইজন চিন্তাবিদের সাহসী পদক্ষেপের ফলে অতীত ইসলামকে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেই সাথে উনিশ শতকে ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন অনুধাবন করতে সাহায্য করে। যাহোক, এই দুইজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ একই ধরনের বিষয়ের কথা বললেও তাদের আন্দোলনের ফলাফল হয় কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইজতিহাদকে প্রতিবাদ হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলেন সমকালীন গোঁড়া মুসলিম মতাদর্শের বিপক্ষে। উপমহাদেশে এই ধরনের গোঁড়া মতাদর্শ ফতোয়া ই আলমগীরি দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় এই সংকলনটি তৈরি করা হয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ অভিযোগ করেন যে, সমকালীন ধর্মীয় পণ্ডিতগণ কোরআন বা সুন্নাহ সম্পর্কে গবেষণা না করে শুধু ফিকাহ শাস্ত্রের ও অন্যান্য মতবাদ নিয়ে ব্যস্ত বেশী ছিলেন। ফতোয়া ই আলমগীরি শিক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকরি পাওয়া যেত এবং অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কিত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করা এবং দক্ষতা অর্জন করার প্রয়াস পেত।[৩৫] শেষের দিকে মওলানা কেরামত আলী

---

৩১ ঐ পৃ. ১৬৫ থেকে।

৩২ ঐ পৃ. ১১৬ থেকে।

৩৩ ঐ পৃ. ১৭৯ এবং ১৮৬ ।

৩৪ দ্রষ্টব্য, History and Doctrines of the Wahhabis. Translated by J.Okinealy JASB vol. xiii. calcutta 1874 পৃ. ৬৮ থেকে।

৩৫ দ্রষ্টব্য শাহ ওয়ালীউল্লাহ, ইনসাফ কি বায়ান ই সাবাহ আল ইখতিলাফ, পৃ. ৮৬

নিজেকে পুরনো ধারার অনুসারী হিসাবে নিজেকে প্রতীয়মান করেন। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ পূর্বসূরি শেখ আবদ আল হক মোজাদ্দেদ দেহলভী শেখ আহমেদ সরহিন্দী (মোজাদ্দেদ ই আলিফ- ই-সানী) সম্পর্কে বলেন আহল- ই- সুন্নাত আল জমাআত (সুন্নী মতাদর্শ) চারটি মযহাব, হানাফী, শাফী, মালিকী এবং হাম্বলী নিয়ে গঠিত। এই মযহাবসমূহ মুসলিম সমাজের মতৈক্য বা ইজমার মাধ্যমে ঠিক করা হয়েছে। কোরআন এবং নবীজীর সুন্নত থেকে উৎসারিত কোন ধরনের আইন চার মযহাবেরই অন্তর্ভুক্ত তাই পঞ্চম কোন মযহাবের উৎপত্তি হয়নি।[৩৬] সেই সময়ের সন্তান হিসাবে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ বিশ্বাস করতেন (তাঁর মক্কা অবস্থানের পূর্বে ১৭৩০-১৭৩৩) যে তকলিদ অনুসরণ বা চার মযহাবের নীতিমালা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিধায় ইজতিহাদের দরজা বন্ধ রয়েছে।[৩৭] কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তিনি ইসলামী পুনরুজীবনের কথা বলেন (মক্কা থেকে ফেরার পর) তখন তিনি তকলিদকে পিঁপড়ার চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেন :[৩৮] মযহাবের অনুসারীগণ অমনোযোগী পিঁপড়াদের চরিত্রের মতো তকলিদ অনুসরণ করছে এবং তাদের মন দৃঢ়ভাবে তা গ্রহণ করেছে। একইভাবে মোহাম্মদ ইবনে আবদ আল ওয়াহাব ইজতেহাদ এর নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেই সাথে তিনি তুর্কী শাসনামলে আরব দেশে নৈতিকতা ও আইনের অবস্থার অবনতির প্রতিবাদ করেন।[৩৯] তাঁর ধর্মীয় সংস্কার দুইভাবে বিভক্ত ছিল। (১) ইসলামের প্রথম মূলনীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। (২) আদি এবং অকৃত্রিম ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে সমাজ যেসব আচার গ্রহণ করেছে তা প্রত্যাখ্যান করা। এগুলোকে তিনি শিরক অথবা বেদাত হিসাবে আখ্যা দেন।

এমন কি গ্রীক যুক্তিবিদ্যাকে তিনি নিন্দা করেছেন এবং যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ নিষিদ্ধ করেন।[৪০] উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুটি ব্যবস্থাকে সম্মিলিতভাবে তাওহিদ বা একত্ববাদ বলা হয়।

এটাকে তাঁর সংস্কারের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য বলা যায়। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নিজেকে এবং তার অনুসারীদেরকে মুয়াহিহ-দুন বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারকারী বলেছেন। যদিও তাঁকে এবং তার অনুসারীদেরকে ইউরোপীয়গণ ওয়াহাবিয়া এবং তাঁর আন্দোলনকে ওয়াহাবিবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪১] সুতরাং ইবনে আবদুল ওয়াহাবের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সোনালী অতীতে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ নবীজীর সময়কাল এবং পরবর্তী তিন প্রজন্মের ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন করা (সালাফ ই সালিহিন)। অন্যদিকে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ ইতিহাসের অবদান সহ ইসলামী ঐতিহ্যকে সংহত করতে চেয়ে ছিলেন। তাই তিনি ইজতিহাদের জন্য গ্রীক দর্শনকে ইতিহাসের ইসলামী ঐতিহ্যের বৈধ অধিকার বলেছেন যা ইবনে আবদুল ওয়াহাব প্রত্যাখ্যান

---

৩৬ দেখুন মওলবী কেরামত অলী : কুওয়াত আল ঈমান কলিকাতা, ১২৫৩ হিজরি পৃ. ২৯২।
৩৭ ঐ পৃ. ৩৯ এবং ৮২।
৩৮ শাহ ওয়ালি উল্লাহ : মুসসাফফা পৃ. ১২
৩৯ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্, হুজ্জাত আল বালিগাহ, লাহোর, ১৩২৩ হিজরি খণ্ড ১ পৃ. ৩০৩।
৪০ History of the Doctrines of Wahhabis পূর্বোক্ত JASB খণ্ড xiii. পৃ. ৬৮ও ৭৪
৪১ দেখুন Encyclopedia of Islam. vol. iv. Article, Wahhabiah.

করেছেন।[৪২] শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ সূচিত আন্দোলনে কেন্দ্রীয় বা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সমাজের লোকদের নবীজীর সুন্নত এর মূল উৎস অর্থাৎ ইত্তিবা ই সুন্নাহ'র্[৪৩] প্রতি উৎসাহিত করা। সেই সাথে তিনি অন্ধভাবে মযহাব অনুসরণ না করার কথা বলেন। এইভাবে তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির চেষ্টা করেন।

যাঁর দ্বারা ওয়ালিউল্লাহ সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়[৪৪] সংস্কারে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। বৃহৎ প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজ থেকে পৌত্তলিক আচার দূর করার জন্য শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ একটি গ্রন্থ লিখেন। তোহ্ফাত আল মুয়াহিহ্দীন (আল্লাহ'র একত্ব প্রচারকারীদের উপহার) নামের এই গ্রন্থটি ইবনে আবদুল ওয়াহাব রচিত কিতাব আল তাওহিদের মতো একই উদ্দেশ্যে লিখিত হয়। তোহফাত আল মুয়াহিহ্দীন সমাজ থেকে শিরক ও বেদাত দূর করে পবিত্র একতৃবাদ প্রচারের চেষ্টা করে। সুতরাং উক্ত দুটি গ্রন্থ দুজন সংস্কারককে একই উদ্দেশ্যে মিলিত করে।

লক্ষণীয় যে "তরীকা ই মোহাম্মদীয়া" আন্দোলন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ প্রদর্শিত আদর্শের দ্বারাই সূচিত হয়, যা তোহফাত আল মুয়াহিহ্দীন যোগান দেয়। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক গবেষকদের মতে শাহ্ ইসমাইল শহীদ তাগবিয়াত আল ঈমান গ্রন্থটি তোহ্ফাত আল মুয়াহিহ্দীনের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন।[৪৫] স্বাভাবিক কারণেই তরীকাই মোহাম্মদীয়া' এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে তাদের সংস্কারাবলী নিবদ্ধ ছিল একতৃবাদ প্রতিষ্ঠা এবং অনৈসলামিক আচার দূর করার মধ্যে। ইউরোপীয় লেখকবৃন্দ দুটি আন্দোলনকে সমগোত্রীয় মনে করে 'তরীকা ই মোহাম্মদীয়া' কে ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন বলেছেন। যদিও এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক যোগসূত্র নেই বা শুরু করার পর্যায়ে কোন সম্পর্ক ছিল না।

প্রথমত 'তরীকা ই মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা শাহ্ ইসমাইল শহীদ ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ পৌত্র।[৪৬] অন্যজন সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজের[৪৭] ছাত্র এবং অনুসারী। উক্ত দুজনই শাহ্ আবদুল আজিজের কাছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং ১৮২২ সালের পূর্বে আরব যাননি। এই সময়ে তাদের আন্দোলন পুরোদমে চলছিল। দ্বিতীয়ত শাহ্ ইসমাইল শহীদ লিখিত তাকবিয়াত আল ঈমান এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওয়াহাবী মতাদর্শ তওহিদ বা একত্ব বাদের সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য রয়েছে।

---

৪২ দেখুন JASP. vol. vii. part iii. পৃ. ১৮১।

৪৩ ঐ পৃ. ১৮৬ থেকে।

৪৪ ঐ পৃ. ১৬৫-১৯৪ (গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত) ধর্মীয় সামাজিক দিকটি দেখানো হয়েছে এবং K.A.Nizami লিখিত Shah Waliallah, History of the Freedom Movement, Karachi ১৯৫৭ পৃ. খৃ. ৫১২-৫৪১, অর্থ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের দিকগুলো প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে।

৪৫ দেখুন History of the Freedom Movement. পুর্বোক্ত পৃ. ৫৪০ এবং আবদুর রহিম অনূদিত হুজ্জাত আল্লাহ্ আল বালিগাহ্ (উর্দু) লাহোর, ১৯৪৩ খণ্ড-১, পৃ. ৮১।

৪৬ দ্রষ্টব্য, আবু ইয়াহিয়া ইমাম খান নওশাহ'রাভী : তারাজিম ই উলামা হাদিস ই হিন্দ, দিল্লী, ১৩৫৬ হিজরি পৃ. ৬৯ থেকে।

৪৭ দ্রষ্টব্য History of the Freedom Movement. Karachi 1957 পৃ. ৫৫৯

কিন্তু গ্রন্থটি তাঁর মক্কা যাওয়ার পূর্বেই রচিত হয়।[৪৮] তৃতীয়ত যখন সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং ইসমাইল শহীদ ১৮২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কা এবং মদীনা সফর করেন তখন আরবে ওয়াহাবী আন্দোলন প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। চতুর্থত মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব সুফিবাদকে অনৈসলামিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ সুফিবাদকে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির মৌলিক ভিত্তি মনে করেছেন। তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলন সুফিপথ (রাহ্ ই ওয়ালায়াত) নবুয়তের পথের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হয়।

পঞ্চমত আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নবীজীর সুন্নত পালনের পুনরুজীবন যা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহও চেয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াহাবীবাদ শুধু তওহীদ বা একত্ববাদের নতুন ব্যাখার চারদিকে বেশী মনোযোগী ছিল।

সুতরাং তরীকা ই মোহাম্মদীয়াকে ওয়াহাবীবাদের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ এই দুটি আন্দোলনের সাথে মতাদর্শকৃতভাবে অথবা ঐতিহাসিকভাবে কোনো যোগসূত্র নেই। তাওহীদ বা একত্ববাদের বিষয়ে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ তরীকা ই মোহাম্মদীয়ার উপর এবং ইবনে আবদুল ওয়াহাব ওয়াহাবীবাদের উপর প্রভাব রেখেছেন যা উপরোক্ত আলোচনার পরিস্ফুট হয়েছে।

ওয়াহাবীবাদ, তরীকা ই মোহাম্মদীয়া এবং ফরায়েযী আন্দোলন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ঃ

তওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে ফরায়েযী মতাদর্শের দুটি অংশ আছে (১) আল্লাহ্‌র একত্ব বিষয়ক ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করা (২) সমাজকে সকল পৌত্তলিক আচার থেকে মুক্ত করা। এই মতাদর্শের সাথে ওয়াহাবী মতাদর্শের পুরোপুরি মিল রয়েছে।[৪৯] 'তাকবিয়াত আল ঈমান গ্রন্থের ভূমিকায় শাহ্ ইসমাইল শহীদ লিখেছেন, 'গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশটি তাওহীদ অথবা আল্লাহ্-র একত্ব ও শিরক এর কু প্রতিফল নিয়ে বিবৃত হবে। দ্বিতীয় অংশটি নবীজীর সুন্নত পালনের মাহাত্ম ও বিদাত অনুসরণের কুফল নিয়ে লিখিত হবে।[৫০] গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশটি যদিও ইসমাইল শহীদ সম্পূর্ণ করেননি তা' সত্ত্বেও এই অংশের বিষয়বস্তুটি নিয়ে আন্দোলনের পরবর্তী গ্রন্থ 'সিরাত আল মোস্তাকিম' তাঁর দ্বারাই লিখিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'তওহীদ' বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে ফরায়েযী, ওয়াহাবী এবং তরীকা ই মোহাম্মদীয়া একই মত পোষণ করেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে অন্য দুটি আন্দোলনের সাদৃশ্য থাকলেও এটা অন্যান্য বিষয়ে তেমন দেখা যায় না। উক্ত দুটি আন্দোলনের সঙ্গে ফরায়েযী মতাদর্শের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে 'তরীকা ই মোহাম্মদীয়া' এবং ওয়াহাবী আন্দোলন মযহাব নির্দেশিত কার্যক্রম পালনের চেয়ে

---

৪৮ ঐ পৃ. ৫৬৪।

৪৯ দেখুন এই গ্রন্থে বিধৃত ওয়াহাবী মতাদর্শ।

৫০ দ্রষ্টব্য মওলবী মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ : তাকবিয়াত অল ঈমান। বঙ্গালোর, ১৩৭১ হিজরি লেখক রচিত 'ভূমিক'।

নবীজীর সুন্নত পালনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অপর দিকে 'ফরায়েযী' মতাদর্শ অন্য বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রথমত হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌কে তাঁর শিলালিপিতে 'হানাফী' মযহাবের অনুসারী বলা হয়েছে।[৫১]

দ্বিতীয়ত জুমআ এবং ঈদের নামাজ বর্জন করার একটি ফতোয়ায় নেতৃবৃন্দ 'হানাফী' মযহাবকে অন্যান্য মযহাব থেকে শ্রেয়তর বলেছেন।[৫২]

ফরায়েযী পুঁথিতে নিজাম উদ্দীন বলেছেন :[৫৩]

"এখন্ আসল কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।
চিনিছ কিনা চিনিছ সেই ইমামেরে ॥
অর্থাৎ তকলিদ তাঁর কর কি তোমরা।"

একই পুঁথিতে নিজাম উদ্দীন বলেছেন - ৫৪

"এতবড় এমাম আজম নামদার।
দুনিয়াতে নাহি হয় মেছাল যাঁহার ॥
সেই এমামের আগে লেহনা চিনিয়া।
তবে ত মনের সন্দেহ যাইবে ঘুচিয়া ॥"

ফেকাহ্ শাস্ত্র ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার দুইজন ছাত্র কাজ করেন।

এই সম্পর্কে একই পুঁথির বয়ান - [৫৫]

"এমাম আবু ইউছুফ ছাহেব কেবার।
এমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লা নামদার
এই দুই শাগ্রেদান সঙ্গেতে মিলিয়া।
এজতেহাদ করিলেন দীনের লাগিয়া ॥
দীন আর দুনিয়ার ভালাই বুঝিয়া
ফেকার কেতাব আদি গেলেন লিখিয়া ॥
ফেকার কেতাব না থাকিলে দুনিয়াতে
কোনো কথা কেহ নাহি পারিত বুঝিতে ॥

চতুর্থত শুরু থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ফরায়েযীগণ হানাফী মযহাবের কট্টর অনুসারী হিসাবে মযহাবটিকে অনুসরণ করেছে।[৫৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ফরায়েযীগণ শুধু হানাফী মযহাবের অনুসারীই ছিল না, সেই সঙ্গে এই মযহাবের সমর্থক হিসেবে এর বাস্তবায়নও চেয়েছে। 'তকলিদ' এর নীতি অনুসরণ ও মৌলিক

---

৫১ দ্রষ্টব্য JASP. vol. III. 1958, পৃ. ১৯৭- ৯৮।
৫২ ফরায়েযী ফতোয়া, এই গ্রন্থের লেখক কর্তৃক গৃহীত : দ্রষ্টব্য ১ম অধ্যায়, ফরায়েযী উপাত্ত নং ৩।
৫৩ নিজাম উদ্দীনের পুথি, পৃ. ৫।
৫৪ ঐ
৫৫ ঐ পৃ. ১১।
৫৬ বর্তমান লেখক বিভিন্ন এলাকা থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, নবীজীর সুন্নত অনুসরণ করার চেয়ে অনুমোদিত বিষয়সমূহ পালন করতে বলা হয়েছে। কারণ 'হানাফী' মযহাবের ইমাম ও আইনজ্ঞের ব্যাখ্যা ছাড়া নবীজীর সুন্নত বোধগম্য নয়। কিন্তু এই বিষয়ে তরীকা ই মোহাম্মদীয়া এবং ওয়াহাবীদের অবস্থান ঠিক বিপরীত।

তা সত্ত্বেও তরীকা ই মোহাম্মদীয়ার অনেক অনুসারী 'হানাফী' মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমন কি সৈয়দ আহমদ শহীদ 'হানাফী' মযহাবের অনুমোদিত বিষয়সমূহ বাস্তব বিষয়ের ক্ষেত্রে পালন করতেন।[৫৭] একইভাবে ওয়াহাবীগণ হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিল।[৫৮] কিন্তু মযহাবে বর্ণিত নবীর সুন্নতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলো পালনের ক্ষেত্রেই ওয়াহাবীগণ গুরুত্ব দেয়। নবীজীর বর্ণিত যেসব বিষয় স্পষ্টভাবে মযহাব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে, শুধু সেগুলোই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এর দ্বারা অন্ধভাবে মযহাব অনুসারীদের থেকে ওয়াহাবীদের পার্থক্য বুঝা সম্ভব। সুতরাং ফরায়েযীগণ এই ক্ষেত্রে অন্য দুটি আন্দোলন থেকে বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলেও দেখা যায় যে ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া অথবা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ'র সঙ্গে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ আরবের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ১৭৯৯,[৫৯] থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তরীকা ই মোহাম্মদীয়া এবং ফরায়েযী আন্দোলনের মতাদর্শ মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত ফরায়েযীগণ বাংলা অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনাধীন অবস্থায় জুমা ও ঈদের নামাজ স্থগিত রাখে। এখানকার অবস্থা উক্ত নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার অনুকূলে নয় বলে এরা দাবি করে।[৬০] অন্যদিকে তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া আন্দোলন উক্ত নামাজসমূহ স্থগিত করেনি। ব্রিটিশদের অধীনে ভারতকে দার উল হারব মনে করলেও উক্ত নামাজসমূহ অনুষ্ঠানে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি।[৬১]

দ্বিতীয়ত তরীকা ই মোহাম্মদীয়া নতুন অনুসারীদের 'দস্তিবাইয়াতের'[৬২] মাধ্যমে গ্রহণ করেছে এবং অশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীকেও সুফিবাদে দীক্ষিত করেছে। কিন্তু ফরায়েযীগণ এই দুটো প্রক্রিয়াকেই প্রত্যাখ্যান করেছে।

হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবন বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, তিনি আরবে বিশ বছর অবস্থান করেন এবং পড়াশুনা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন।[৬৩]

এই সময়টি ছিল ওয়াহাবী বিপ্লবের সাফল্যের সময়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবীগণ মক্কা ও মদীনা দখল করে। ওয়াহাবী আন্দোলনের অগ্রগতি খুব কাছ থেকে দেখার চমৎকার সুযোগ পেয়েছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।'তাওহীদ' বা একত্ব বিষয়ে

---

৫৭ দ্রষ্টব্য History of the Freedom Movement, Karachi 1957 পৃ. ৫৭০ দেখুন JASB. vol. xiii. পৃ. ৬৮ থেকে।

৫৮ দেখুন মওলবী বিলায়েত আলী 'আমল - বিল হাদিস, ১৮৩৭ খ্রি. পৃ. ২, 8, ১২ এবং ১৬ এবং ওয়াহাবী মতাদর্শের জন্য দেখুন JASB, vol. xiii. পৃ. ৬৮ থেকে।

৫৯ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

৬০ দ্রষ্টব্য গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৬১ দেখুন History of the Freedom Movement, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭৬।

৬২ এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম অধ্যায় দেখুন।

৬৩ গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

ফরায়েযী মতাদর্শ ওয়াহাবী 'তত্তহীদ' মতাদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এতে এই কারণে ধারণা করা যায় যে, হাজী 'তাওহীদ মতাদর্শের বিষয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন যা ওয়াহাবীবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ[৬৪] এতে ইহাও ধারণা করা যায়, হাজী ওয়াহাবীবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া আরও নিশ্চিতভাবে আমরা দেখেছি যে, ফরায়েযী ছিল 'তকলিদ'এর সমর্থক। অন্যদিকে ওয়াহাবীগণ ছিল 'ইজতিহাদ'এর সমর্থক।

দ্বিতীয়ত ফরায়েযীগণ ইসলামী বৈশিষ্ট্য হিসাবে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা[৬৫] অর্জনে সুফিবাদ গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে ওয়াহাবী মতবাদ সুফিবাদকে অনৈসলামিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। তৃতীয়ত ওয়াহাবীগণ হাম্বলী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ফরায়েযীগণ 'হানাফী' মযহাবের অন্তর্ভুক্ত। হাজী শরীয়তুল্লাহর সুফি শিক্ষক তাহির সোম্বল হানাফী ছিলেন এবং ফরায়েযীদের ধর্মীয় আইন বিষয়ক বির্তকের সমাধান দিতেন।[৬৬] সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলনকে ওয়াহাবী আন্দোলনের অংশ বলাও যায় না।

তরীকা ই মোহাম্মদীয় আন্দোলনের উত্তরাধিকারী আন্দোলনসমূহ এবং ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে এইগুলো সম্পর্ক।

আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় চরিত্র নিয়ে শুরু হলেও এই আন্দোলন কয়েক বছরের মধ্যেই দ্রুত রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে এবং উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সময়ের বিবর্তনে এই আন্দোলন তিনটি উপ-দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (ক) পাটনা স্কুল (উপদল) (খ) তাইউনী (গ) আহল ই হাদিস। তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের উৎপত্তি এবং বিকাশের ইতিহাস বর্তমান গবেষণার পরিধির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলন ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে ফরায়েযী আন্দোলনের সাথে এগুলোর সম্পর্ক পাওয়া যেতে পারে। উপরন্তু তরীকা ই মোহাম্মদীয়া ও তাঁর অনুসারী আন্দোলনসমূহের সঙ্গে ফরায়েযী আন্দোলনের পারস্পরিক বিরোধিতা বাংলার মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর প্রভাব রাখে। বিরোধী আন্দোলনকারী দলগুলোর প্রতি ফরায়েযী আন্দোলনের মনোভাব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের ঐতিহাসিক ও মতাদর্শগত প্রেক্ষাপট এবং এর উপদলগুলোর জন্ম হওয়ার কার্যকারণ আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক।

তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের অনুসারীদের মাঝে ভাঙ্গন প্রক্রিয়া

তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের মূল মতাদর্শ ছিল মযহাবগুলোর অনুমোদিত বিষয় পালন করার চেয়ে নবীজীর সুন্নত পালনে (ইত্তিবা ই সুন্নাহ) গুরুত্ব প্রদান করা। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে নানা মত দেখা দেয়। বিশেষ করে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বালাকোট ময়দানে সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদের মৃত্যুর পর নেতৃবৃন্দের মাঝে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের

৬৪ দেখুন এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
৬৫ দ্রষ্টব্য গ্রন্থের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়।
৬৬ দেখুন গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

মধ্যে উক্ত বিষয়ে তিনটি মত দেখা যায়। সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীগণ তিনটি মত নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম মতটি নিয়ে এগিয়ে আসেন সৈয়দ আহমদ শহীদের উত্তরাধিকারী মওলানা বিলায়েত আলী[৬৭] যিনি তরীকা ই মোহাম্মদীয়ার পুনর্ব্যক্ত অর্থাৎ নবীজীর সুন্নত পালনে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি তিনি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মতটি ব্যক্ত করেন জৌনপুরের মওলবী কেরামত আলী। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্যতম প্রধান অনুসারী ছিলেন।[৬৮]

জৌনপুরী মযহাবসমূহকে চূড়ান্ত বলে দাবি করেন এবং তিনি মযহাব অনুমোদিত সকল বিষয় পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য বলে মত দেন। তরীকা ই মোহাম্মদীয়া থেকে তৃতীয় মতটি প্রকাশ করেন মওলবী আবদুল জব্বার। তিনি নিজেকে 'হানাফী' মযহাবের অনুসারী হিসেবে মনে করেন। তা সত্ত্বেও তিনি নবীজীর সুন্নত পালনে অগ্রাধিকার দেন।[৬৯] উক্ত মতগুলো এই তিনজন ব্যক্তি তিনটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। নিম্নে এই মতগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে :

মওলবী বিলায়েত আলী তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'আমল বিল হাদিস' অর্থাৎ নবীজীর সুন্নত পালন বা ইত্তিবা ই সুন্নাহ। এটি একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা। ফার্সি ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকাটি ১৮৩৭ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হয়।[৭০] গ্রন্থের প্রথম

---

৬৭ মওলানা বিলায়েত আলী (১৭৯০ - ১৮৫২) পাটনার একজন ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ১৮৩১ সালে দক্ষিণ ভারত সফর করা অবস্থায় তাকে বালাকোটে বিপর্যয়ের খবর জানানো হয় তিনি সাথে সাথে পাটনা ফিরে আসেন এবং সৈয়দ শহীদের প্রধান উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। দ্রষ্টব্য, আবদুর রহিম : আল দুরার আল - মালহার ফি তারাজিম ই আহল ই সাদিকপুর, ইলাহাবাদ, ১৩৪৫ হিজরী, পৃ ১১৪-১৬ এবং W.W.Hunter : Our Indian Musalmans. London. 1871. পৃ. ৪৯ থেকে।

৬৮ মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরের (উত্তর প্রদেশ) মোল্লাটোলাতে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ১২১৫) জন্ম গ্রহণ করেন। দেখুন মওলানা আবদুল বাতিন : সিরাত ই মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, ইলাহাবাদ ১৩৬৮ হিজরি, পৃ. ৯ এবং ইনতাজ উদ্দীন আহমদ : নাসাব নামা ই কারামতিয়া (বাংলা) ১৩৫৬ হিজরি, পৃ. ১। এই প্রসঙ্গে জেমস্ ওয়াইজ বলেন, সৈয়দ আহম্মদ শহীদের প্রচারে উজ্জীবিত হয়ে কেরামত আলী কলিকাতায় (১৮২০) আসেন এবং তাঁর শিষ্য হন। অত:পর সৈয়দ আহম্মদ শহীদের সঙ্গে মক্কায় গমন করেন। মক্কা থেকে ফেরার পর মওলানা কেরামত আলী সৈয়দ আহম্মদের অন্যতম প্রধান সহকারী হিসাবে কাজ করেন। (দেখুন জেমস ওয়াইজ : Eastern Bengal. পৃ. ২৭) হিজরি ১২৫০/ ১৮৩৫ সালে মওলানা আলী দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসেন এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শুদ্ধ ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সফর ১৮ বছর ধরে বিরতিহীনভাবে চলে (দ্রষ্টব্য মওলানা বাতিন, পূর্বোক্ত. পৃ. ৪৪-৪৫ এবং ৮৮)। তিনি এই সফরের সময় ফরায়েযী প্রভাবিত এলাকা ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলাসহ বাংলার প্রায় সব জেলা পরিভ্রমণ করেন ১৮৫৩ সালে জৌনপুরে সংক্ষিপ্ত সফরের পর তিনি শীঘ্রই বাংলায় ফিরে আসেন। নোয়াখালীতে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন এবং রংপুরে হিজরি, ১২৯০ ও ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ঐ পৃ. ৯৭-৯৮।

৬৯ মওলবী আবদুল জব্বার কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। তিনি মোহাম্মদ আশরাফের পুত্র জামাল উল্লার সন্তান। (দেখুন মওলবী আবদুল জব্বার : জওয়াব ই কুওআত আল ঈমান, ১৮৩৭ খ্রি : পৃ. ২, মওলানা কেরামত আলীর মতে জব্বার 'নয়' মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (দেখুন মওলানা কেরামত আলী: কুওআত আল ঈমান পূর্বোক্ত, সেকশন "রাক্কাত - ই আবদুল জব্বার" পৃ. ৩২৩ থেকে) তিনি ফরায়েযী খলিফা আবদুল জব্বার নন।

৭০ পুস্তিকার ভাষা এবং বিষয় পরীক্ষা করে ধারণা করা যায় যে এটি কেরামত আলীর কুওআত আল ঈমানের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

অংশে লেখক বলেন যে তাকে 'ইত্তিবা ই আহাদিছ' এবং ইত্তিবা ই ফিকাহ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন থাকার কারণে তিনি এই পুস্তিকাটি রচনা করেন।[৭১] পুস্তিকাটির মাধ্যমে সাধারণ তথ্যাদি পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন। মওলানা কেরামত আলী তাঁর গ্রন্থে বলেন যে,ইসলামের প্রধান লক্ষ্য হলো কোরআন এবং নবীজীর সুন্নাহ্ নির্দেশিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করা। সুতরাং মযহাব বর্ণিত কোনো বিষয় যদি কোরআন অথবা সুন্নাহ'র সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে,তাহলে মযহাব বর্ণিত বিষয়টি ত্যাগ করে কোরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। তাই এক্ষেত্রে 'তকলিদ' বা মযহাবকে অনুসরণের অবকাশ নেই।[৭২] মওলবী বিলায়েত আলী আরও বলেন যে, যদি কোন 'হানাফী' মযহাবের ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে 'মযহাব'কে অতিক্রম করে নবীজীর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে, তাহলে সে একজন উত্তম হানাফী। কারণ মযহাবগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হল 'কোরআন'কে অনুসরণ করা।[৭৩]

যে কোন বিষয়ে ব্যক্তির মতামতের চেয়ে সত্যকে অনুসরণ করাই শ্রেয়। তাঁর মতে 'তকলিদ'বা মযহাব অনুসরণ করা সেই ব্যক্তিরই প্রয়োজন যিনি তাঁর নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত পথ বেছে নিতে পারেন না।[৭৪] কিন্তু যিনি কোরআন এবং সুন্নাহ্ সম্পর্কে বিজ্ঞ তাঁর জন্য 'তকলিদ' অনুসরণ করা অনুমোদন যোগ্য নয়।[৭৫]

(২) মওলানা কেরামত আলী তাঁর গ্রন্থের শিরোনাম দিয়েছেন 'কুওআত আল ঈমান' ধর্ম বিশ্বাসের শক্তি। উর্দু ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৪। এটি ১৮৩৭/১২৫৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি মযহাবগুলোকে চূড়ান্ত বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পায়। তাই এটি মওলবী বিলায়েত আলী লিখিত 'আমল বিল হাদিস'কে প্রত্যাখ্যান করে। উক্ত গ্রন্থে মওলানা কেরামত আলী বলেন মুসলিম বিশ্বের দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় বিপথগামী হলেও সুন্নী সম্প্রদায় সঠিক পথে রয়েছে। সুন্নী সম্প্রদায় মাত্র চারটি মযহাবের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো 'হানাফী, শাফী' মালিকী এবং হাম্বলী, মুসলিম সমাজের ঐক্য মত্যের ভিত্তিতে চারটি মযহাবকে চূড়ান্ত পথ হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের যে কোন একটি মযহাব অনুসরণ করা প্রয়োজন।[৭৬] মওলানা কেরামত আলীর মতে 'ইজতিহাদ' করা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্ভব।[৭৭] তবে চারটি মযহাবের প্রতিষ্ঠার কারণে 'ইজতিহাদে'র প্রয়োজন নেই। সুতরাং পঞ্চম মযহাবেরও প্রয়োজন নেই।[৭৮] যদি কোন ইসলামী আইনজ্ঞ পঞ্চম মতাদর্শ খুঁজে পান তাহলে এটি চার মযহাবের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হবে।[৭৯] তাই ঐ ধরনের কোন প্রচেষ্টা হবে অতিরিক্ত পরিশ্রম। চারজন ইমাম বা চারটি মযহাবের যে কোনো একটি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

---

৭১ মওলবী বিলায়েত আলী : আমল বিল হাদিস, পৃ. ১
৭২ ঐ পৃ. ৩ থেকে
৭৩ ঐ পৃ. পৃ. ৩-১১
৭৪ ঐ পৃ. ১০
৭৫ ঐ।
৭৬ মওলবী কেরামত আলী : কুওআত আল ঈমান, কলিকাতা হিজরী, ১২৫৩ পৃ. ২৮
৭৭ ঐ পৃ. ১৯২ থেকে।
৭৮ ঐ পৃ. ৩৯ এবং ৮২।
৭৯ ঐ পৃ. ৮২।

কারণ তাঁদের অনুমোদিত পথ হলো নবীজীর সাহাবাদের পথ। প্রকৃত পক্ষে মযহাবের স্রষ্টাগণ নিজেদের কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে ব্যাখ্যা করেছেন।[৮০] এমনকি মযহাব অনুমোদিত কোনো বিষয় যদি সুন্নাহ'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলেও তা গ্রহণ করতে হবে। কারণ ইজমার মাধ্যমেই ইমামদের অনুসরণ (তকলিদ) করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং কেউ যদি ইমামদের তকলিদ অনুসরণ না করে, তাহলে সে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্যুত হবে। (সাওয়াদ আল - আজম)।[৮১]

মওলানা কেরামত আলী তাঁর গ্রন্থের একটি স্থানে বলেছেন যে, তিনি তাঁর পুরনো মযহাবের বা 'হানাফী' মযহাবের প্রতি অনুগত। তিনি বলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং তকলিদ অনুসরণ করি। যদিও মূর্খ ব্যক্তিরা এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে।[৮২]

(৩) মওলবী আবদুল জব্বার তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন তাকবিয়াত আল - মুসলিমিন ফি ইত্তিবা ই সুন্নত ই সৈয়দ আল মুরসালিন অর্থাৎ সুন্নত পালনে মুসলিম সমাজকে সুসংহত করা। গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় লিখিত হয় এবং ১৮৪৬/১২৫৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের শিরোনাম থেকে ধারণা করা যায় যে এটি নবীজীর সুন্নত পালনের বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সুতরাং মওলানা কেরামত আলীর গ্রন্থ 'কুত্তআত আল ঈমান' প্রত্যাখ্যান করে মৌলবী জব্বার এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মৌলবী জব্বার উক্ত গ্রন্থটি রচনার পূর্বে জওয়াব ই কুত্তআত আল ঈমান (কুত্তআত আল ঈমানের উত্তর) শিরোনামের আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে মওলানা কেরামত আলীর গ্রন্থে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ একটির পর একটি খণ্ডণ করেন।[৮৩]

'তাকবিয়াত আ্যল মুসলিমিন' গ্রন্থের বিষয়বস্তু মৌলবী বিলায়েত আলী লিখিত 'আমল বিল হাদিসের বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মৌলবী বিলায়েত আলী তাঁর গ্রন্থে 'তরীকা ই মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের নিয়মনীতি উপস্থাপন করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ সমুন্নত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। মওলবী আবদুল জব্বারের গ্রন্থটি উক্ত নীতির যথার্থতা সমর্থন করে। তিনি বলেন শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌ এবং শাহ আবদুল আজীজ[৮৪] যে নীতি প্রদর্শন করেছিলেন তা থেকে বর্তমান নীতি আলাদা কিছু নয়। সুতরাং মওলবী আবদুল জব্বার রচিত গ্রন্থটি ছিল মওলবী বিলায়েত আলী লিখিত গ্রন্থ 'আমল বিল হাদিছের পরিপূরক। 'তাকবিয়াত আল মুসলিমিন' গ্রন্থে আবদুল জব্বার মত প্রকাশ করে বলেন, "কোরআনের[৮৫] আলোকে আমরা জানি যে, আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করছে নবীজীর সুন্নত পূর্ণভাবে

---

৮০ ঐ পৃ. ৬২।
৮১ ঐ খ্রি. পৃ. ১৫৪ ও ১৬৬
৮২ ঐ পৃ. ২৯২
৮৩ গ্রন্থটির কপি এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে।
৮৪ মওলবী আবদুল আল জব্বার : তাকবিয়াত আর মুসলিমিন ফি ইত্তিবা ই সুন্নত ই সৈয়দ আল মুরসালিন, কলিকাতা, ১২৫৬ হিজরী, পৃ. ২৬।
৮৫ আবদুল জব্বার কোরআন থেকে উদ্ধৃত করে তাঁর মত প্রকাশ করেন আল কোরআন, ৩:৩১

অনুসরণের মধ্যে। "এই অনুসরণ যদি সমাজের প্রচলিত নিয়ম বা আচার বিরোধী হয়, তাহলেও সুন্নত অনুসরণ করতে হবে।

তাই একজন মুসলিম যদি নবীজীর সুন্নত পালন করতে গিয়ে মযহাব প্রদর্শিত পথ বিচ্যুত হয়, তাহলেও সে নবীজীর এবং ইমামের আশীর্বাদ লাভ করবে।

কারণ ইমামগণও মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি তাদের কোনো মত নবীজীর সুন্নতের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে তাহলে সুন্নতকেই অনুসরণ করতে হবে।[৮৬] 'তকলিদ' বা মযহাবকে অনুসরণ করা সাধারণ কোনো আইন হতে পারে না । অজ্ঞদের জন্য 'তকলিদ' অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় হতে পারে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে,শাহ্ আবদুল আজীজ এবং ইসমাইল শহীদ 'তকলিদ' অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন এবং এটা পৌত্তলিকতার নামান্তর বলে মত দিয়েছেন। সুতরাং এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে মযহাব অনুমোদিত বিষয়সমূহ কোরআন ও সুন্নতের সাথে সাযুজ্য রয়েছে কি না।[৮৭] মওলবী আবদুল জব্বার নিজেকে 'হানাফী' মযহাবের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। সত্য কোনো মযহাবের একচেটিয়া বিষয় নয়। কিন্তু মযহাবসমূহের 'মুস্তাহিদগণের মাধ্যমে সত্য ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে তিনি নিজের নেতা মনে করেন। এইভাবে মওলবী জব্বার নিজেকে মতামত দেয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলে মনে করেন।[৮৮] তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে একজন সঠিকভাবে পরিচালিত 'হানাফী' মনে করেন।

মওলানা কেরামত আলী এবং মৌলবী বিলায়েত আলীর মধ্যে বিভেদ

উপরোক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে তরীকা ই মোহাম্মদীয়ার নেতা মৌলবী বিলায়েত আলী নবীজীর সুন্নত পালনে অগ্রাধিকার দেওয়াার নীতি অব্যাহত রাখেন। উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণ 'হানাফী' মযহাবের অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বেও বিলায়েত আলী নবীজীর আদর্শের প্রতি অধিক আগ্রহ প্রদর্শনের কথা বলেন। অন্যদিকে মওলানা কেরামত আলী মযহাবের পথ অনুসরণ করার কথা বলেন। এক্ষেত্রে বিলায়েত আলী 'ইজতিহাদে'র পক্ষে মত দেন। কিন্তু কেরামত আলী 'তকলিদ' অনুসরণের জন্য বলেন। সুতরাং ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের 'আমল বিল হাদিস' এবং 'কুত্তআত আল ঈমান' প্রকাশিত হওয়ার পর দুই বিপরীত চিন্তাধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তার ফলশ্রুতিতে সৈয়দ আহমদ শহীদের দুই প্রধান সহকারীর মধ্যে বিভেদ চূড়ান্তরূপ লাভ করে। এরপর থেকে মওলানা কেরামত আলী নিজেকে 'হানাফী' বলে দাবি করেন এবং এই মযহাবের পক্ষে কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 'তাইউনী' হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন বলেও ধারণা করা হয় এবং তাঁর নেতৃত্বে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যে সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয় তা' তাইউনী' আন্দোলন হিসাবে পরিচয় লাভ করে।[৮৯] মৌলবী বিলায়েত আলী নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখেন।

---

৮৬ তাকবিয়াত আল মোসলিমিন, পূর্বোক্ত পৃ. ২৩

৮৭ ঐ পৃ. ২৯।

৮৮ দেখুন মওলবী আবদুল জব্বার, জওয়াব ই কুত্তআত আল ঈমান, ১৮৩৭ খ্রি. ২।

৮৯ দ্রষ্টব্য James Wise, Eastern Bengal, পূর্বোক্ত পৃ. ৬-৭

তিনি কোনো বিশেষ মযহাবের ব্যক্তি ছিলেন বলে জানা যায় না। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বিলায়েত আলী মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর অনুসারীদেরকে "ওয়াহাবী" অথবা ভারতীয় ওয়াহাবী বলা হয়।

বিশেষ করে সরকারিভাবে উক্ত নামে এরা পরিচিতি লাভ করে। ১৮৬৩-১৮৭০[৯০] খ্রিস্টাব্দ সময়ে রাষ্ট্রীয় মামলায় উক্ত নামে অর্থাৎ "ওয়াহাবী মামলায়" এদেরকে উক্ত নামে পরিচিতি দেয়া হয়। কিন্তু মামলায় অভিযুক্তরা নিজেদেরকে "মোহাম্মদী"হিসেবে পরিচয় দেয়। যদিও মৌলবী আবদুল জব্বার নিজেকে 'হানাফী' মযহাবের ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি প্রদান করেন। এরপরও তিনি নবীজীর সুন্নত পালনের কথা বলেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি মৌলবী বিলায়েত আলীর মতাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্বাভাবিক কারণেই তিনি আন্দোলনের প্রধান স্রোতধারার অর্থাৎ 'পাটনাস্থল' এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পাটনা স্কুল ও আহল ই হাদিস এর মধ্যে বিভেদ

পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে মৌলবী বিলায়েত আলীর গ্রন্থ 'আমল বিল হাদিস এবং মৌলবী আবদুল জব্বার লিখিত গ্রন্থ 'তাকবিয়াত আল মুসলিমিন' এ মতাদর্শগত পার্থক্য ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হচ্ছিল। একজন মযহাবের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং অপরজন কোনো মযহাব এ অনুরক্ত হতে চাননি। কিন্তু মৌলবী বিলায়েত আলী কোনো মযহাবে অনুরক্ত না হলেও মযহাবগুলোর বৈধতার স্বীকৃতি দেন। একইভাবে মৌলবী জব্বার নবীর সুন্নত পালনের বিষয়ে যেমন মনোযোগী ছিলেন তেমনিভাবে নিজেকে 'হানাফী' মযহাবের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেন। যতদিন পর্যন্ত মৌলবী বিলায়েত আলী জীবিত ছিলেন (মৃত - ১৮৫২) ততদিন পর্যন্ত দুইজনের সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গির কোনো বিরোধীতার জন্ম দেয়নি। সময়ের বিবর্তনে উক্ত দুটি দল ক্রমাগত চরম পর্যায়ে চলে আসে। একটি দল নবীজীর সুন্নতকে প্রাধান্য দেয় এবং অপরটি 'তকলিদ' অনুসরণের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়। এভাবে দুটি দল বিচ্ছিন্নতার দিকে এগিয়ে যায়। আমাদের হাতে যে সকল উপাত্ত রয়েছে তা দ্বারা দুটি পক্ষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় সেটার নাম ছিল 'ছবুত ই হাক্ব আল হাকিম (অর্থাৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা) এই পুস্তিকাটি ১৮৬৪/১২৮১ হিজরীতে প্রকাশিত হয় যা দুই পক্ষের বিচ্ছিন্নতাকে পূর্ণরূপদান করে।

এই পুস্তিকাটি রচনা করেন সৈয়দ নযীর হোসাইন,[৯১] যিনি মযহাবসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই নতুন মতাদর্শ সম্মানিত দলটি 'পাটনা স্কুল' থেকে বেরিয়ে আসে এবং "মোহাম্মদী" বা "আহল ই হাদিস"(অর্থাৎ নবীজীর হাদীছের অনুসারীগণ)

---

৯০ দেখুন W.W. Hunter : our Indian Musalmans.London. A.D.1871 পৃ. ৮৪। এবং M.A. Khan : Selections. পৃ. ১

৯১ সৈয়দ নযীর হোসেন ১৮০৫ সালে বিহারের মুঙ্গির জেলার বাহবাওয়া নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪২ সালে তিনি দিল্লীতে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি আমৃত্যু (মৃ-১৯০২)নবীজীর সুন্নাহ শিক্ষা দান করেন। দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ ইসহাক : Indias Contribution to the Stady of Hadith Literature, ph. D. thesis . Dacca University. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা ১৯৫৫ খ্রি. পৃ. ১৮৪ - ৮৫

নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে এই দলটি 'আহল ই হাদিস' এবং 'রাফি ইয়াদাইন' (যাঁরা নামাজের সময় বার বার হাত উঠিয়ে থাকে) নাম গ্রহণ করে। তাদের বিরোধীরা তাদেরকে 'লা মযহাবী' (অর্থাৎ যাঁরা কোন মযহাব ভুক্ত নয়) হিসাবে চিহ্নিত করে। এই নামটি তাদের প্রকৃত অবস্থান বুঝানো সত্ত্বেও এর দ্বারা দলটিকে সমালোচনাই করা হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে এদেরকে 'আহল ই হাদিস' নামে আলোচনা করা হয়েছে।

'তরীকা ই মোহাম্মদীয়' এবং এর অনুসারী আন্দোলনসমূহের সঙ্গে ফরায়েযী আন্দোলনের সম্পর্ক

বাংলা অঞ্চলে 'তরীকা ই মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের প্রভাব চারটি ধাপে বিভক্ত। প্রথম ধাপে ব্যক্তি ছিল ১৮২০ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ্ ইসমাইল শহীদ,কলিকাতা সফর করেন। দ্বিতীয় ধাপে 'পাটনা স্কুল' তৃতীয় ধাপে তাইউনী এবং চতুর্থ ধাপে 'আহলে হাদিস' আন্দোলনের মাধ্যমে এই অঞ্চল প্রভাবিত হয়। উক্ত ধাপসমূহের প্রচারকবৃন্দ পূর্ববঙ্গে তাদের মতামত প্রচার করতে গিয়ে ফরায়েযীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। এই সংযোগ কখনও বন্ধুত্বপূর্ণ অথবা কখনও বিরোধিতাপূর্ণ ছিল। যেহেতু এদের সঙ্গে ফরায়েযীদের ছিল ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক, সেহেতু উক্ত চারটি মতাদর্শের সঙ্গে ফরায়েযীদের সম্পর্ক আলাদাভাবে আলোচনা করা হলো।

ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের সম্পর্ক (১৮২০-১৮৩১ খ্রি.)

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলন সূচিত হয়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কলিকাতা সফর করেন। এই প্রসঙ্গে হান্টার লিখেন, সৈয়দ আহমদ শহীদের চারদিকে প্রচুর লোক সমাগম হয়। এই অবস্থায় প্রথাগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিষ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সৈয়দ আহমদের হাত ছুঁয়ে 'বাইয়াত' করার মাধ্যমে শিষ্য হওয়ার সুযোগ লাভ করা উপস্থিত লোকদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এই অবস্থায় সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর পাগড়ি খুলে লম্বা করে দেন এবং বলেন যারা তার পাগড়ি ছুঁবে তারা তাঁর শিষ্য হিসাবে পরিগণিত হবে।[৯২] পরের বছর তিনি মক্কা যাওয়ার পথে আবার কলিকাতা আসেন এবং এখানে তিনমাস অবস্থান করেন।[৯৩] পূর্ববঙ্গে লোকশ্রুতি রয়েছে যে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক ব্যক্তি কলিকাতা আসে। এখানে উল্লেখ্য যে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শহীদ যখন প্রথম কলিকাতা আসেন তখন তিনি পাটনায় যাত্রা বিরতি করেন। এই স্থানে তাঁর শিষ্যদের সংখ্যা হান্টারের মতে এতবেশী সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় যে, এদেরকে পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই তিনি

---

৯২ W.W. Hunter, Our Indian Musalmans, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩।
৯৩ দ্রষ্টব্য History of the Freedom Movement, Karachi 1957 পৃ. ৫৬৩।

কলিকাতা যাওয়ার পূর্বে মৌলবী বিলায়েত আলীকে পাটনার শিষ্যদের জন্য 'খলিফা' নিযুক্ত করেন।[৯৪] পাটনার শিষ্যদের জন্য তরীকা ই মোহাম্মদীয়া সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের জন্য সৈয়দ আহমদ শহীদ অথবা বাংলার শিষ্যরা অনুরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিল কিনা তা আমাদের সংগৃহীত উপাত্তসমূহ প্রমাণ করে না।

তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলন কলিকাতা শহরে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সাফল্য অর্জন করে। সময়ের বিবর্তনে আন্দোলন এই শহর ছাড়িয়ে অন্য লোকালয়ে যেতে শুরু করে। সুতরাং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের নেতৃত্বে গ্রামীণ সমাজে যে একটি গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল তা বিস্ময়ের কিছু নয়। বাংলা অঞ্চলে তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের প্রথম উত্থান স্বল্প সময়ের জন্য ছিল এবং তা ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম বঙ্গের এই আন্দোলনটি ছিল ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিপক্ষস্বরূপে।

তীতুমীর কর্তৃক গৃহীত ধর্মীয় সংস্কারের কর্মসূচী

সাধারণভাবে এটা স্বীকৃত যে তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদ 'তরীকা ই মোহাম্মদীয়া' প্রচার করার জন্য তিতুমীরকে দায়িত্ব অর্পণ অথবা 'খলিফা' নিযুক্ত করেছিলেন কি না তা নিশ্চতভাবে জানা যায় না। যদিও স্থানীয়ভাবে প্রবাদ পুরুষের খ্যাতি অর্জনকারী তিতুমীরকে এই ধরনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[৯৫]

আমরা অবহিত যে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্য হন।[৯৬] ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর নিজের জেলা ২৪ পরগনায় ফিরে আসার পর ইসলামের শুদ্ধ মতাদর্শ প্রচার শুরু করেন। এই ধরনের প্রশংসাসূচক কাজ করার জন্য তিতুমীর দিল্লীর রাজ পরিবারের একজন সদস্য থেকে ভাতা পেতে থাকেন। এই রাজ সদস্য ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ[৯৭] থেকে তিতুমীরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলা ভাষায় তিতুমীরের জীবনী লেখক বিহারী লাল সরকার লিখেছেন যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ পাবনা জেলায় 'খলিফা' নিযুক্ত করেছিলেন। খলিফার নাম ছিল মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন। মৌলবী হোসেনকে দেয়া খিলাফতের সনদ থেকে বিহারী লাল সরকার মর্মার্থ উদ্ধার করেন। এই সনদে সৈয়দ আহমদ শহীদ দুটি মৌলিক বিষয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য মৌলবী হোসেনকে বলেন। এগুলো ছিল (১) আল্লাহর গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর সঙ্গে

---

৯৪ উল্লেখ্য যে, কয়েকজন লেখক মনে করেন সৈয়দ আহমদ শহীদ বাংলায় অবস্থান কালে সুবিন্যস্ত সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু এই তথ্যের কোন সূত্র লেখকবৃন্দ উল্লেখ করেননি (দেখুন মাসিক মোহাম্মদী, বাংলা মাসিক, ঢাকা, মাঘ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৬০।

৯৫ দ্রষ্টব্য, আবদুল গফুর সিদ্দিকী "তিতুমীর" মাসিক মোহাম্মদী, পূর্বোক্ত ১৩৬০ বঙ্গাঁব্দ পৃ. ২৬০ থেকে

৯৬ W.W. Hunter. Our Indian Musalmans. পূর্বোক্ত পৃ. ৪৫।

৯৭ A.R.Mallick, British policy. পৃ. ৭৭. cf. Bengal. Judicial Criminal Consultations, 3 April, 1831. ১৪তম সার্কিট কমিশনারের নিকট বারাসত মেজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত চিঠি, ২৮ নভেম্বর, ১৮৩১ প্যারা ৪ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী

তুলনা না করা (২) কোরআন এবং সুন্নত অনুমোদন করে না এমন ধরনের কোনো উৎসব না করা।[৯৮] বিহারীলাল সরকারের মতে তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গে উক্ত সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[৯৯] একই লেখকের মতে ঐ সনদে উক্ত নীতিমালার বিশদ বিবরণ রয়েছে। প্রথমত ফেরেশতা দৈবশক্তি, জিন,পীর, শিক্ষক,দরবেশ অথবা পয়গম্বরের এমন কোনো শক্তি নেই যাঁর দ্বারা কোনো মানুষ উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত বিয়ে বা মৃত্যু উপলক্ষে কোনো অনৈসলামিক আচার বা উৎসব পালিত হতে পারবে না। সুতরাং সমাধির উপর সাজসজ্জা,সমাধি সৌধ নির্মাণ,মোহররম উপলক্ষে তাজিয়া বের করা এবং নানা ধরনের 'ফাতিহা'র ব্যবস্থা ত্যাগ করতে হবে।[১০০] একই সূত্র মতে তিতুমীর সূচিত আন্দোলনে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল।[১০১] উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও তিতুমীর আরও নতুন বিষয় তাঁর আন্দোলনে যুক্ত করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে দাঁড়ি রাখতে বলেন এবং ধূতি 'কাছা খোলা' অবস্থায় পরতে বলেন।[১০২]

উপরন্তু তিতুমীর তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর সংস্কার গ্রহণ করেনি এমন মুসলিমদের সঙ্গে খাবার গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। শুধু মাত্র তাঁর অনুসারীদের মধ্যে তা চলতে পারবে বলে তিনি মত দেন।[১০৩] যদি কোলভিন বর্ণিত উক্ত বৈশিষ্ট্যটি তিতুমীরের অনুসারীদের মধ্যে কাজ করে থাকে, তাহলে ধারণা করা যায় যে, তিতুমীর অনুসারীগণ একটি স্বতন্ত্র গ্রুপে পরিণত হয় যা হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণপ্রথার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর ফলে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়তে পারে।[১০৪] ইসলামী পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা হিসাবে তিতুমীর এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা নয়। সমাজে এমন অনেক সুফি এবং শুদ্ধিবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ রয়েছে যাঁরা অসৎ লোকের দেয়া উপহার বা খাবার গ্রহণ করে না। অসৎ লোক অর্থাৎ প্রতারক, ঘুষখোর থেকে উক্ত ধর্মপ্রাণ লোকেরা নিজেদেরকে দূরে রাখতে চাইলেও তাঁরা সবসময় তা পারেন না। কোনো কোনো সময় এই ধরনের ব্যক্তির অতিথি হওয়া বা একসঙ্গে আহার করার ঘটনা ঘটতে পারে। এমন কি বর্তমান সময়েও মুসলিম সমাজে তা দুর্লভ নয়। ফরায়েযী খলিফাদের মধ্যেও একই ধরনের কার্যকলাপ দেখা যায়। ইসলামের আচার সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে কোলভিনের পক্ষে এই পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নয় যে, খাবার গ্রহণে কোনটি ধর্মান্ধ পদক্ষেপ অথবা কোনটি আইনসিদ্ধ খাবার অথবা রোজগার (হালাল রুজী) সম্পর্কিত পদক্ষেপ।

---

৯৮ বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর, কলিকাতা, ১৩০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১। এবং দ্রষ্টব্য, W.W. Hunter, Indian, Musalmans. পৃ. ৫৪ থেকে।

৯৯ বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর, পৃ. ১১।

১০০ ঐ পৃ. ১১।

১০১ ঐ।

১০২ ফরায়েযীগণ ও একই ধরণের বৈশিষ্ট্যের: কথা বলেছিল। দেখুন, এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

১০৩ বারওয়েলের নিকট লিখিত কোলভিনের চিঠি ৮ই মার্চ, ১৮৩২। প্যারা ৬, (বার্ড সংগ্রহ নং ৫৪২৩২) পৃ. ৪৩, উদ্ধৃত ড. মল্লিক, British policy, পূর্বোক্ত পৃ. ৭৭।

১০৪ এই অবস্থাটি ড.মল্লিক ও সমর্থন করেছেন, দেখুন Dr. Mallick, Baritish policy, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭ তবে এই বিষয়ে বর্তমান লেখকের ধারণা ভিন্ন। পরবর্তী অংশে দ্রষ্টব্য।

বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে একই ধরনের কর্মসূচী হাজী শরীয়তুল্লাহও গ্রহণ করেছিলেন।[১০৫] সংস্কার কর্মসূচীর সাদৃশ্যতার কারণে ওয়াহাবী মামলার প্রসিকিউটর র‍্যাভেন' শ (১৮৬৩-১৮৭০) ফরায়েযী আন্দোলন,তিতুমীর সূচিত আন্দোলন ও সৈয়দ আহমদ শহীদদের আন্দোলনকে একই আন্দোলন বলেছেন। ড.মল্লিক তিতুমীরের আন্দোলনকে 'ফরায়েযী' বলেছেন।[১০৬] আমাদের সংগৃহীত উপাত্ত সমূহ এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে।[১০৭] প্রথমত আমরা দেখেছি যে গ্রাম বাংলায় তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার ছিল তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের বিস্তৃতরূপে।

সুতরাং তাঁর আন্দোলনটি সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ প্রদর্শিত ঐতিহ্যের অংশ।

অন্যদিকে হাজী শরীয়তুল্লাহ্ তাঁর সংস্কার কর্মসূচীর আদর্শ গ্রহণ করেন আরব থেকে। দিল্লীর আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

দ্বিতীয়ত হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তিতুমীরের মধ্যে অর্থাৎ তাদের সূচিত আন্দোলনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। হাজী শরীয়তুল্লাহ্র পরিবার থেকে জানা যায় যে তিতুমীর ও শরীয়তুল্লাহ পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন যা আমরা পরবর্তী আলোচনায় পাব। দুদু মিয়া (হাজীর পুত্র) মক্কা যাওয়ার পথে তিতুমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল বার বছর (১৮৩০ - ৩১)।[১০৮] ধারণা করা যেতে পারে যে, দুদু মিয়া তিতুমীর সূচিত আন্দোলনের ধর্মীয় অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত বৈশিষ্ট্য যখন ফরায়েযী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন তিতুমীরের আন্দোলন থেমে গিয়ে ছিল। তৃতীয়ত র‍্যাভেন'শ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, তিতুমীর এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ্ এই দুজনেই 'হানাফী'মযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১০৯] এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমত বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই এই মযহাবের অনুসারী ছিল। দ্বিতীয়ত হাজীর শিক্ষক এবং প্রদর্শক তাহির সোম্বাল একজন হানাফী[১১০] ছিলেন। তৃতীয়ত সৈয়দ আহমদ শহীদের অনেক বিশ্বস্ত সহকারী 'হানাফী' ছিলেন। এদের মধ্যে মৌলবী আবদুল হাই এবং মৌলবী কেরামত আলী ছিলেন। এমনকি সৈয়দ শহীদ নিজেও 'হানাফী' মযহাবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।[১১১] এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও তিতুমীর এবং শরীয়তুল্লাহর সঙ্গে পরিচিতি প্রমাণ করে না। চতুর্থত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ফরায়েযী এবং তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য ছিল জুমা এবং ঈদের নামাজ সম্পর্কিত। বৃটিশ শাসনাধীন থাকা অবস্থায় জুমা এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠান বৈধ কিনা

---

১০৫ দেখুন বর্তমান গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

১০৬ দ্রষ্টব্য ড.মল্লিক British policy. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

১০৭ দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের, "The struggle of Titumir. a re-examination" JASP. vol. iv. 1959 পৃ. ১১৩ - ৩৩। এই প্রবন্ধে স্থানীয় উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে।

১০৮ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় পৃ. ২৪।

১০৯ দেখুন Selections From the Records of the Government of Bengal. vol. xiii : Trails of Ahmadullah. পৃ. ১২৭।

১১০ দেখুন এই গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

১১১ দ্রষ্টব্য History of the Freedom Movement করাচী, ১৯৫৭ পৃ. ৫৬৯।

তা নিয়ে রয়েছে উক্ত দুটি আন্দোলনের মত পার্থক্য।[১১২] ফরায়েযীগণ ঈদ ও জুমার নামাজে অংশ না নিলেও তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণ অংশ নেয়। এই বৈশিষ্ট্যটি ড.মল্লিক উল্লেখ করেছেন।[১১৩]

উক্ত মতাদর্শের মধ্যেই আমরা দুটি আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য দেখতে পাই। আমরা পরবর্তী আলোচনায়ও এটা দেখব যে, এই মতাদর্শগত পার্থক্যটি সুস্পষ্টভাবে মওলানা কেরামত আলী ও ফরায়েযীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।[১১৪]

যশোর জেলার অধিবাসী মুন্শী ফাইজ উদ্দীন মোখতারের জীবন ও কার্যাবলি পর্যালোচনা করলে উক্ত পার্থক্যটি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। মুন্শী মোখতার কলিকাতায় তিতুমীরের শিষ্য হন। পরবর্তী সময়ে তিনি ফরিদপুর জেলায় চলে আসেন এবং খ্যাতনামা একটি ফরায়েযী পরিবারে বিয়ে করেন। দুদু মিয়ার জীবদ্দশায় মুন্শী মোকতার দুদু মিয়ার আইন বিষয়ক এটর্নী হিসাবে কাজ করেন। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের একজন অভিভাবক হিসেবে মুন্শী মোখতার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তা সত্ত্বে তিনি ফরায়েযী মতাদর্শে দীক্ষিত হননি বরং আজীবন তিতুমীরের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী ছিলেন।[১১৫] উপরন্তু তিতুমীর এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ্র জীবন এবং কার্যাবলীতে বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে যা আমরা গোচরে আনতে পারি। প্রথমে আমরা লক্ষ্য করি যে তিতুমীর[১১৬] একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যা হাজী শরীয়তুল্লাহর[১১৭] পরিবারের জন্যও প্রযোজ্য। উভয়েই বাংলার মুসলিম সমাজের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত। দ্বিতীয়ত এই দুইজনের অধিকাংশ অনুসারীগণ ছিল সাধারণ গণমানুষ। তৃতীয়ত দুজনের আন্দোলনই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এমনসব অঞ্চলে যেখানে হিন্দু জমিদারগণ মুসলিম কৃষকদের উপর খবরদারি করত।

উপরন্তু ২৪ পরগনা জেলার তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের শুদ্ধ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে হিন্দু জমিদার এবং নীলকরদের সঙ্গে ১৮৩০ সালে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তিতুমীরের অনুসারীদের মধ্যে ক্রমশ একত্ববোধ ও সামাজিক সমতাবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছিল যা হিন্দু জমিদারদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। বিশেষ করে যখন তিতুমীরের আন্দোলন জমিদারদের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছিল এবং মুসলিম কৃষক সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কিছু গোড়াঁ মুসলিম তিতুমীরের সংস্কারের বিরোধিতা করতে শুরু করে। এই সকল মুসলিম দীর্ঘদিনের আচার এবং সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এরা তিতুমীরের জনপ্রিয়তা অথবা সংস্কারকে প্রতিহত করতে না পেরে হিন্দু জমিদারদের শরণাপন্ন হয়। এর ফলে তিতুমীরের সংস্কারে বাধা প্রদানের জন্য হিন্দু জমিদারদের হাতে একটি সুযোগ এসে যায়।

---

১১২ বর্তমান অধ্যায়ে বর্নিত হয়েছে।
১১৩ দেখুন Mallick, British policy পূর্বোক্ত পৃ. ৯১ পাদটাকা - ১।
১১৪ দ্রষ্টব্য গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায় ও ৭ম অধ্যায়।
১১৫ দেখুন গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'ছ'।
১১৬ দ্রষ্টব্য W.W. Hunter, Indian Musalmans পূর্বোক্ত পৃ. ৪৫।
১১৭ এই গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

তিতুমীর এবং তাঁর অনুসারীদেরকে প্রতিহত করার জন্যে কয়েকজন জমিদার ঐক্যবদ্ধ হয়। এদের মধ্যে তারাগোনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ, নাগরপুরের জমিদার গৌর প্রসাদ চৌধুরী, পুরার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় অন্যতম। এই সকল জমিদার তিতুমীরের আন্দোলনকে অংকুরেই স্তব্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ছিল 'দাঁড়ি কর' নামের বার্ষিক একটি কর। মাথাপিছু ১/২/১ টাকা হারে তা ধার্য করা হয়। পুঁরাতে 'দাঁড়ি কর' বাস্তবে আদায় করা হয়। কিন্তু সফদরপুরে জমিদারের এজেন্টদেরকে বাধা দেয়া হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই কর ছিল অবৈধ। তাই কৃষক সমাজ প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে কৃষ্ণদেব রায় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বসতিপূর্ণ গ্রাম সফদরপুর আক্রমণ করে। বিপুল সংখ্যক 'লাঠিয়াল' নিয়ে জমিদার গ্রামটি লুট করে এবং বেশ কিছু বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়া হয়। কৃষক সমাজ পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে সুবিচার পাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তা পেতে কৃষকেরা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কৃষকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাজারে সমবেত হয় এবং একটি গরু জবাই করে এর রক্ত ও বিভিন্ন অংশ মন্দিরের গায়ে ছিটিয়ে ও ঝুলিয়ে দেয়। আন্দোলনের এই অবস্থায় তিতুমীরের আন্দোলন আর্থ-সামাজিক চরিত্র অর্জন করে। এর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় নীলকর, সহজাত মিত্র হিসেবে হিন্দু জমিদারগণের সাথে অবস্থান নেয়। এই বিরোধিতা এক পর্যায়ে সশস্ত্র সংঘাতের সৃষ্টি করলেও তিতুমীর উক্ত জোটের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করে। তিতুমীরের বিরোধীরা তাকে একটি বিদ্রোহী চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করে এবং নীলকরদের সাহায্যে ব্রিটিশ প্রশাসনকে এই ব্যাপারে ধারণা দিতে সক্ষম হয়। এরপর প্রশাসন দুটি পুলিশী অভিযান প্রেরণ করলে তিতুমীর এদেরকে প্রতিরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর একটি সামরিক অভিযান তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিরোধ গুড়িয়ে দেয়।[১১৮] পরবর্তীতে আমরা আমাদের আলোচনায় দেখব যে, 'ফরায়েযী' আন্দোলনও ঠিক একই ধরনের অবস্থার শিকার হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে গোড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ঢাকার হিন্দু জমিদারদের সঙ্গেও বিরোধের সূচনা ঘটে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের সঙ্গে ফরায়েযীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। মুসলিম কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণে 'ফরায়েযী' আন্দোলন ভূমিকা রাখার কারণে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে আন্দোলনটি আর্থ-সামাজিক চরিত্র অর্জন করে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জনপ্রিয়তা পায়।[১১৯]

উক্ত সাদৃশ্যসমূহ তিতুমীর সূচিত আন্দোলন ও ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম সমাজে একই ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় সংস্কার নির্দেশ করে। আন্দোলনপূর্ব অর্ধশতাব্দী ধরে ব্রিটিশ প্রশাসন দেশে যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন আনে, তাঁর মোকাবেলা করার জন্যই আন্দোলনসমূহ কাজ করে। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, ফরায়েযী আন্দোলনকে ও তিতুমীর সূচিত আন্দোলনকে একই সূত্রে গ্রথিত করা সঙ্গত নয়।

---

১১৮ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বর্তমান লেখকের "The Struggle of Titumir : A Re-examination, JASP vol.-iv. 1959 পৃ. ১১৩ - ৩৩

১১৯ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়

ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে পাটনা স্কুলের সম্পর্ক

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর এবং তাঁর অনুসারীদের পরিচালিত আন্দোলনকে স্তব্ধ করার পরও কৃষক সমাজে বিরাজমান অসন্তোষ শেষ হয়ে যায়নি। সংস্কার করার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মানসিকতা নিঃসন্দেহে জাগরুক ছিল। হিংসাত্মক পথে তিতুমীরের মৃত্যু,তাকে জীবিত অবস্থার খ্যাতির চেয়ে মহীয়ান করে তোলে। তিতুমীর শহীদ হওয়ার ফলশ্রুতিতে তাঁর আদর্শ পরবর্তীকালে বাংলায় নীলকর এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সূচিত আন্দোলনের পাথেয় হিসেবে কাজ করে। তিতুমীরের মৃত্যুর ফলে গ্রাম বাংলায় সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রভাবের যে ছেঁদ পড়ে, তা শীঘ্রই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে। তিতুমীরের চেয়ে অধিকযোগ্য পাটনার মওলবী ইনায়েত আলী পরবর্তী সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শ প্রচারে সক্রিয় ছিলেন।

বালাকোটে ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদের মৃত্যু এবং নারকেলবেড়িয়ায় তিতুমীরের মৃত্যুর ফলে সংস্কার আন্দোলনের আপাতত সমাপ্তি হয় বলে হান্টার মন্তব্য করেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,"পাঞ্জাব সীমান্তে তাদের নেতার মৃত্যু তাদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে। নিম্নবাংলায়ও একই ধরনের পরিণতি ঘটে।[১২০] কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদ কর্তৃক নিযুক্ত "খলিফা"গণ (অর্থাৎ পাটনার মওলবী বিলায়েত আলী ও মওলবী ইনায়েত আলী) আন্দোলনকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেন। প্রচারক হিসাবে তাদের প্রভূত মনোবল এবং ধর্মীয় অনুপ্রেরণা,ইসলামী ঝাণ্ডাকে বারবার ধূলায় লুটিয়ে পড়া থেকে তুলে ধরে।[১২১] বালাকোট বিপর্যয়ের খবর যখন মওলবী বিলায়েত আলীর (বিপর্যয়ের সময় তিনি দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করছিলেন) নিকট পৌঁছে তখন তিনি দ্রুত পাটনায় ফিরে আসেন। পাটনাতে তাকে 'তরীকা ই মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত করা হয়। তিনি নিজের উদ্যোগে অগ্রণী ব্যক্তিদেরকে গ্রহণ করে 'খলিফা' নিযুক্ত করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মওলবী ইনায়েত আলী বাংলা অঞ্চলে আগমন করেন।[১২২]

মওলবী ইনায়েত আলী কোন সময় বাংলায় আসেন তাঁর সঠিক তারিখ জানা যায় না। তাঁর পারিবারিক সূত্র অনুযায়ী আগমনের সময়টি ছিল ১৮৩১ বা ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ।[১২৩]

---

১২০ W.W.Hunter : our Indian Musalmans. London 1871 পৃ. ৪৭।

১২১ ঐ পৃ. ৪৯ - ৫০।

১২২ দ্রষ্টব্য আবদুল রহিম, আল দুরার আল মনসুর ফি তারাজিম ই আহল ই সাদিকপুর, ইলাহাবাদ, ১৮৪৫ খ্রি. পৃ. ১৩৩-৩৪। উল্লেখ্য যে এই গ্রন্থের লেখক মওলবী বিলায়েত আলী, মওলবী ইনায়েত আলীর পরিবারের সদস্য ছিলেন। সাধারণভাবে এই পরিবারটি "সাদিকপুর পরিবার হিসাবে পরিচিত ছিল। লেখক দাবি করেন যে পারিবারিক উপাত্ত ব্যবহার করে তিনি গ্রন্থটি লিখেছেন। আমরা এই সূত্রটি গ্রহণ করেছি। কারণ অন্যান্য উপাত্তের সাথে এর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

১২৩ ঐ, লেখক স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন যে মওলবী ইনায়েত আলী বাংলায় সাত বছর অবস্থান করেন। এরপর ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাহান অঞ্চলে যান। সুতরাং ১৮৩১ অথবা ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে ইনায়েত আলী বাংলায় আসেন বলা যায়।

বাংলায় এসে মওলবী ইনায়েত আলী সৈয়দ আহমদ শহীদের বাঙ্গালী অনুসারীদের নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। এতে করে তিনি বুঝতে পারেন যে শহরের মুসলিম সমাজের তুলনায় গ্রামবাসীরা কুসংস্কার এবং অজ্ঞতায় ডুবে আছে। তাই তিনি প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম সফর করেন। এই সফরের মাধ্যমে তিনি শুদ্ধ ইসলামী মতাদর্শ প্রচার করেন।[১২৪] ১৮৪০খ্রিস্টাব্দের দিকে মওলবী ইনায়েত আলী তাঁর সদর দফতর যশোর জেলার হাকিমপুরে স্থানান্তর করেন। এই স্থানে তিনি ৩ থেকে ৪ বছর তাঁর পরিবার নিয়ে বাস করেন।[১২৫]

মৌলবী ইনায়েত আলীর প্রচার কার্যের বিষয়টি পাঁচটি রাষ্ট্রীয় মামলা থেকেও জানা যায়। এইগুলো ছিল (ক) ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের আম্বালা মামলা (খ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের পাটনা মামলা (গ) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের রাজমহল মামলা এবং (ঘ) বিখ্যাত ওয়াহাবী মামলাসমূহ ১৮৭০- ১৮৭১। উক্ত মামলাগুলো পরিচালনা করার সময় একটি সত্য বেরিয়ে আসে। সেটি ছিল যে ইনায়েত আলী এবং তাঁর অনুসারীদের প্রচার বাংলার মুসলমান সমাজে সুদূর প্রসারী প্রভাব রাখে।[১২৬] সৈয়দ আহমদ শহীদ মুসলিম সাধারণের কাছে ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেছেন। তিনি জনগণের ধর্মীয় জীবন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং সেই সাথে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে তাগাদা দিয়েছেন। এইভাবে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়। বাংলা অঞ্চলে মওলবী ইনায়েত আলী একইভাবে উক্ত মতাদর্শ প্রচার করেছেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনের মাধ্যমে এদেরকে পবিত্র যুদ্ধ বা জেহাদে অংশ নিয়ে ক্ষমতা জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে বলেছেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ গ্রামীণ বাংলায় একটি ধর্মীয় বিপ্লব সাধনে সফল হয়েছিলেন। সুতরাং ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে মওলবী ইনায়েত আলীর বাংলায় আগমনের পর এই বিষয়ে তিতুমীরের প্রচেষ্টা শুধু পুনরুজ্জীবনই লাভ করেনি, বরং তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলন এই অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যায়।

তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলন প্রভাবিত অঞ্চল এবং ফরায়েযী আন্দোলনের সঙ্গে এর সংযোগ

যশোর জেলায় মওলবী ইনায়েত আলী তাঁর সদর দফতর স্থাপন করেন। এই জেলার সীমান্তে ছিল ফরায়েযী প্রভাবিত জেলা ফরিদপুর । এর ফলে পাটনা স্কুলের অনুসারীদের সঙ্গে ফরায়েযীদের সংযোগ ঘটে। এই প্রসঙ্গে হান্টার লিখেছেন যে,পাটনা স্কুলের খ্যাতিমান নেতা মওলবী ইয়াহিয়া আলী ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযীদের সঙ্গে

---

১২৪ ঐ পৃ. ১৩৩

১২৫ ঐ, বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলেও এই ধরনটি ব্যাপক প্রচলিত ছিল।

১২৬ দ্রষ্টব্য, W.W. Hunter : Our Indian Musalmans. পূর্বোক্ত পৃ. ৮৪ Muinuddin Khan. Selections From Bengal Government Records on Wahhabi Trials. 1863 – 1870. Dacca, 1961 পৃ. ১ থেকে, Pumphlet on India. the Great wahhabi case being a Full Report of the proceedings in the matters of Am khan and Hashmdad khan. calcutta 1870 এবং Lewis A. Mendes : Report of the proceedings in the matters of Ameer khan and Hashmdad khan. Calcutta. 1871.

উত্তর ভারতের ওয়াহাবীদের সংযোগ ঘটান। তিনি আরও বলেন যে, ফরায়েযী এবং পাটনা স্কুলের অনুসারীগণ (তথাকথিত ওয়াহাবী) যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাশাপাশি যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছে এবং ১৮৫৮-১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বিচারালয়ের কাঠগড়ায় এক সঙ্গে দাঁড়িয়েছে।[১২৭] আমরা লক্ষ্য করেছি যে ফরায়েযীদের সঙ্গে তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। পাটনা স্কুল ছিল তরীকা ই মোহাম্মদীয়ার উত্তরসূরি। ফরায়েযীদের সঙ্গে পাটনা স্কুলের সংমিশ্রণ হওয়ার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখব। তা সত্ত্বেও দুটি আন্দোলনের চোখে ব্রিটিশ শক্তি ছিল জবরদখলদারী তাই দুটি আন্দোলনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

প্রথমত ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে দুদু মিয়া 'জেহাদ' ফান্ডে প্রচুর অর্থদান করেছিলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শিবিরগুলোতে 'পাটনা'স্কুলের যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য দুদু মিয়া উক্ত ফান্ড চালু করেন। দ্বিতীয়ত ১৮৭০ খ্রিস্টব্দের মালদহ মামলার একটি দলিলে দেখা যায় যে,দুইজন ফরায়েযী নেতা মালদহ সফর করেন যদিও এই শহরে পাটনা স্কুলের অনুসারীদের বসতি ছিল। ফরায়েযী নেতাগণ এই শহরে কিছুদিন অবস্থান করে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাবেশে তাদের মতাদর্শ কোনোরূপ বাঁধা ছাড়াই প্রচার করেন।[১২৮] যদি ফরায়েযী নেতাগণ কোনো 'তাইউনী' অনুসারীদের এলাকায় তাদের মতাদর্শ প্রচারের চেষ্টা করতেন তা হলে তা বিনা বাধায় করা সম্ভব ছিল না।[১২৯] তৃতীয়ত যদিও যশোর জেলার পূর্বাংশ ফরায়েযীদের প্রভাবে এবং পশ্চিমাংশ পাটনা স্কুলের অনুসারীদের প্রভাবে ছিল, তা সত্ত্বেও এই দুইদলের মধ্যে কোনো বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এই দুইটি মতাদর্শের সংযোগের ফলে ফরায়েযী আন্দোলন পশ্চিম দিকে এবং পাটনা স্কুল পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করেনি।

সর্বোপরি সরকারি নথি অনুযায়ী পাটনা স্কুলের মতাদর্শ বাংলার পশ্চিম ও উত্তর দিকের জেলাগুলোতে প্রসার লাভ করে।

জেলাগুলো ছিল দিনাজপুর, মালদা, রাজশাহী, মুর্শীদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, যশোর, কলিকাতা এবং ২৪ পরগণা। গঙ্গা এবং ভাগিরথী বিধৌত এলাকাতেই পাটনা স্কুলের মতাদর্শ গভীর প্রভাব রেখেছিল।[১৩০] তরীকা ই মোহাম্মদীয়া মতাদর্শ, সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইলের কর্মজীবন ও চরিত্রকে উপজিব্য করে তিনটি গ্রন্থ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৩১] এইগুলো বাংলা ও উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছিল।

---

১২৭ W.W.Hunter, our Indian Musalmans, পূর্বোক্ত পৃ. ১০০।

১২৮ দ্রষ্টব্য, Selections from Bengal Goverment Records, পূর্বোক্ত ৩০০-৩০১।

১২৯ দেখুন গ্রন্থের ৭ম অধ্যায় 'তাইউনী' অনুসারীগণ কর্তৃক ফরায়েযীদের বিরোধিতা করার বিবরণ।

১৩০ দ্রষ্টব্য, Selections from Bengal Goverment Records, পূর্বোক্ত পৃ. ৮।

১৩১ গ্রন্থগুলো ছিল (১) তাসির মোরাদিয়া (সম্ভবত তফসির অল মোরাদিয়া) উর্দু ভাষায় লিখিত (২) ফতোয়া এবং জেহাদ সম্পর্কিত বাংলা গ্রন্থ সংকলক ও প্রকাশক ছিলেন হাজী বদর উদ্দীন এবং (৩) তত্ত্ব (বাংলা) এই গ্রন্থের যুগ্ম লেখক হলেন হাজী জান রহমান এবং হাজী বদর উদ্দীন। দ্রষ্টব্য ঐ পৃ. ২৭৮ এবং ৩০১।

গ্রন্থগুলো দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে,তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলন পূর্ববাংলায় বেশ প্রভাব বিস্তার করে এবং জেহাদে অংশ নেয়ার মতাদর্শ এখানে বিপুল সাড়া জাগায়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, পাটনা স্কুলের ধর্মীয় সংস্কারের মনোভাব এই অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। উক্ত গ্রন্থসমূহের সারসংক্ষেপ পরীক্ষা (সরকারি নথিসমূহে বিদ্যমান) করলে দেখা যায় যে, সাধারণ মুসলিমদের সঙ্গে অভিজাত মুসলিমদের একটি বিষয়ে বিরোধ ছিল। সেই বিরোধটি ছিল সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বকে ঘিরে। অলৌকিকতার প্রতি আগ্রহশীল সাধারণ মুসলিমদের কাছে সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলেন ইমাম মেহেদীর মত (বিশেষ করে শিয়াদের কাছে অতিপ্রিয় আধ্যাত্মিক প্রদর্শক যিনি পুনরায় ফিরে আসবে)। সাধারণ মুসলিমদের ধারণায় ছিল সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বালাকোটে মৃত্যুবরণ করেননি বরং তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সময়ের প্রয়োজনে তিনি ফিরে আসবেন এবং জেহাদের মাধ্যমে ইংরেজ শাসন থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করবেন। অন্যদিকে গ্রন্থগুলোতে এই ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিরোধিতা করা হয়েছে। লেখকবৃন্দ সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ্ ইসমাইল শহীদের নিহত হওয়ার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। কিভাবে শিখদের দ্বারা মুসলিম যোদ্ধাগণ দুঃখজনকভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, তাও লেখকবৃন্দ বিবৃত করেন। লেখকগণ মনে করেন আল্লাহর রহমতে মুসলিমদের দুরবস্থার উন্নতি ঘটবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 'জিহাদ'এবং হিজরত হল ফরজ। এই দুটি বিষয় ছাড়া বিকল্প কোনো বিষয় নেই। এমনকি লেখকগণ আরও বলেন যে, কেউ যদি উক্ত বিষয় দুটো প্রত্যাখ্যান করে,তাহলে সে আল্লাহর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হবে।

সৈয়দ আহমদ শহীদের মৃত্যু সম্পর্কে এলিটদের দৃঢ়তা সম্ভবত তাঁর একজন বাঙালি শিষ্যের তদন্তের ফলেই গৃহীত হয়েছিল। হান্টার বলেন যে, সৈয়দ আহমদের একজন বাঙালি শিষ্য তদন্তের জন্য এক হাজার সহকারী নিয়ে এই অঞ্চল থেকে ১৮০০ মাইল দূরে অবস্থিত বালাকোট গমন করে। সেখানে দলটি 'তিনটি ঘাস ভর্তি ছাগচর্ম' দেখতে পায়। যেগুলোকে চুল ও কিছু কাঠের টুকরা দিয়ে মানবাকৃতির মতো করা হয়েছিল। এই আকৃতিগুলোকে সৈয়দ এবং তাঁর অনুসারীরূপে সংরক্ষণ করা হয়। মোল্লা কাদির নামের জনৈক এক ব্যক্তি পাহাড়ী গুহায় সংরক্ষণের কাজটি করে। এই ঘটনা বালাকোট বিপর্যয় সম্পর্কে অনেক অলৌকিক গল্পের জন্ম দেয় যেগুলো 'পাটনা স্কুলের' সমর্থকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।[১৩২] সৈয়দ আহমদ শহীদের মৃত্যু সম্পর্কিত বিভিন্ন অলৌকিক গল্পসমূহকে পূর্ববঙ্গের এলিট মুসলমানবৃন্দ গ্রহণ করেনি। তাই এই অঞ্চলে পাটনা স্কুলের প্রভাব প্রায় ছিল না বলা যায়। পাটনা স্কুলের মতাদর্শ পূর্ববাংলায় প্রসার না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হিসাবে মওলানা কেরামত আলীর ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা যায়। মওলানা কেরামত আলী পূর্ববাংলাকে তাঁর সংস্কারের মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে পাটনা স্কুলের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়।[১৩৩] তৃতীয় কারণ হিসাবে ফরায়েযী এবং পাটনা স্কুলের সুসম্পর্কের কথা বলা

১৩২ দ্রষ্টব্য W.W.Hunter : Our Indian Musalmans পূর্বোক্ত পৃ. ৪৮-৪৯
১৩৩ দ্রষ্টব্য. বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহ

যায়। এ ছাড়াও ফরায়েযীদের ব্যাপক প্রভাবের কারণে ময়মনসিংহ থেকে বাকেরগঞ্জ এলাকায় পাটনা স্কুলের মতাদর্শ প্রসার লাভ করেনি।[১৩৪]

ফরায়েযী তাইউনী সম্পর্ক

তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের উপজাত ছিল তাইউনী আন্দোলন। মওলানা কেরামত আলী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। 'তাইউনী' শব্দটি আরবি 'তাইউনী' থেকে এসেছে, যাঁর অর্থ হল কোনো কিছু চিহ্নিত করা। তাই একজন ব্যক্তিকে 'তাইউন'বলা হয় তখনই যখন সে উক্ত বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী হয়। আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে মওলানা বিলায়েত আলীর নেতৃত্বাধীন মূল তরীকা ই মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের সঙ্গে মওলানা কেরামত আলীর মতবিরোধ ঘটে। এই মতবিরোধের কারণ ছিল 'তকলিদ'বা মযহাব অনুসরণ সম্পর্কিত নীতি নিয়ে। মওলানা কেরামত আলী 'তকলিদ' অনুসরণের পক্ষে ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে একজন 'তাইউনী' বলা হবে তখনই যখন তিনি সুনির্দিষ্টভাবে একটি মযহাবের অনুসারী হবেন। ফলশ্রুতিতে মওলানা কেরামত আলী আহল ই হাদিস এর অনুসারীদের 'লা মযহাবী আখ্যা দেন[১৩৫]। জেমস ওয়াইজ 'তাইউনী' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উক্ত প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য নয়। ওয়াইজ 'তাইউনী' বলতে 'প্রতিষ্ঠিত' বুঝিয়েছেন।[১৩৬] এই দুটি পথ হল রাহ-নবুয়ত এবং রাহ-ই বিলায়েত যা সৈয়দ আহমদ শহীদ উল্লেখ করেছিলেন।

অন্যান্য সংস্কারকদের মতোই মওলানা কেরামত আলী কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস এবং অনৈসলামিক আচারসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাঁর একটি পুস্তিকায় লিখেছেন যে,পূর্ব ভারতের মুসলিম সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস,অনাচার এবং উৎসবাদিতে এমনভাবে নিমজ্জিত ছিল যে, এই সমাজে শুদ্ধ ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। তাঁর মতে বাংলায় শুদ্ধ ইসলাম প্রচার করার এটি ছিল অন্যতম কারণ।[১৩৭] মওলানা কেরামত আলী মহররম উপলক্ষে নাচ-গান, তাজিয়া, ওরশ পালন, মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে 'ফাতিহা' অনুষ্ঠান ইত্যাদি আচারের তীব্র নিন্দা করেন। অবশ্য 'ফাতিহা' পালনে অনাড়ম্বরতা থাকে বলে তিনি তা অনুমোদন করেন।[১৩৮] মওলানা কেরামত আলী ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন এবং অবশিষ্ট জীবনের (মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রি:) অধিকাংশ সময় এই অঞ্চলে অবস্থান করেন। আমরা পূর্বে আলোচনায় দেখেছি যে পাটনা স্কুলের অনুসারী ও ফরায়েযীগণ পারস্পরিক সৌহার্দমূলক পরিবেশে বাস করেছে। মওলানা কেরামত আলী 'তকলিদ' অনুসরণ অথবা 'হানাফী' মযহাব অনুসরণ করার কথা বলে 'ফরায়েযী' মতাদর্শের আরও কাছাকাছি চলে আসেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরায়েযীদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের সংঘাত সৃষ্টি হয়। জুমা ও ঈদের নামাজ

---

১৩৪ দেখুন গ্রন্থের নবম অধ্যায়।

১৩৫ দ্রষ্টব্য মওলবী কেরামত আলী : কুওতআত আল ঈমান পূর্বোক্ত পৃ. ১৯৭, ২০৩ এবং ২০৮ এবং হুজ্জাত ই কৃাতি, কলিকাতা হিজরী ১৩৫৪ পৃ. ৯৪-৯৭।

১৩৬ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ৭।

১৩৭ মওলানা কেরামত আলী, মাকাশিফাত ই রাহমাত, কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরী পৃ. ১২ থেকে।

১৩৮ ঐ

অনুষ্ঠানের বিষয়ে একদিকে ফরায়েযীদের মতাদর্শ এবং কোনো সুন্নী মযহাবের অনুসারী না হওয়ার কারণে অন্যদিকে পাটনা স্কুলকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফরায়েযীদেরকে তিনি বাংলার 'খারিজা'[১৩৯] এবং পাটনা স্কুলকে 'লা মযহাবী'বলেছেন।[১৪০] এই দুটো আন্দোলনকেই তিনি আরবের ওয়াহাবীদের সঙ্গে তুলনা করেন।[১৪১] মওলানা কেরামত আলীর তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও ফরায়েযী এবং পাটনা স্কুল তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। বরং এই দুটি আন্দোলন এর ফলে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মওলানা কেরামত আলী বাংলা অঞ্চলে বির্তকের এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেন। তাঁর এই প্রচারাভিযান এবং বিতর্ক (বাহাছ) অনুষ্ঠানের ফলে ধর্মীয় মতাদর্শগত পার্থক্য আরও বেশী স্পষ্ট হয়। সমআদর্শের মাধ্যমে একতা সৃষ্টি না হয়ে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। 'হানাফী' মযহাবের অনুসারী হিসাবে ফরায়েযীগণ মযহাব অবলম্বন এবং 'তকলিদ'এর অনুসরণ অপরিহার্য করে।[১৪২] এই বিষয়ে ফরায়েযীগণের সাথে পাটনা স্কুলের মতাদর্শের মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে। পাটনা স্কুল 'তকলিদ' প্রত্যাখ্যান করে 'ইজতিহাদ' ও নবীজীর সুন্নত অনুসরণের মতাদর্শ প্রচার করে।[১৪৩] উপরন্তু পাটনা স্কুল জুমা ও ঈদের নামাজ সম্পর্কিত ফরায়েযীদের মতাদর্শ অনুমোদন করে না। ফরায়েযীগণ ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় উক্ত নামাজ অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে।[১৪৪] মওলানা কেরামত আলী ঈদ ও জুমার নামাজ অনুষ্ঠান না করার ফরায়েযী মতাদর্শকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এই ক্ষেত্রে পাটনা স্কুল তাকে সমর্থন করে। কিন্তু তিনি 'তকলিদ' অনুসরণ না করার জন্য পাটনা স্কুলকে সমালোচনা করেন।[১৪৫] এই বিষয়ে ফরায়েযীগণ তাঁর যুক্তিসমূহকে সমর্থন করে। সুতরাং আমরা দেখছি যে, উক্ত সময়ে বাংলায় ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে ত্রিমুখী সংঘাত চলেছিল। এই ধরনের সংঘাত সংস্কারের চেয়ে সময়ের অপচয়কে নিশ্চিত করেছিল।[১৪৬]

উপরোক্ত দলগুলোর অনমনীয় মনোভাবের কারণে তাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। যখন আহল ই হাদিস আন্দোলন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাটনা স্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা অঞ্চলে তাদের প্রচার প্রসারিত করে, তখন এরাও অবশিষ্ট দলগুলোর বিরোধী দল হিসেবে পরিচিত হয়। ফলে মুসলিম সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ঐ প্রসঙ্গে ফজলে হোসেন বলেন,বিতর্ক শুধু নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক সংঘাতের সৃষ্টি করে।

---

১৩৯ দ্রষ্টব্য : মওলবী কেরামত আলী, হুজ্জাত ই কৃতি, পূর্বোক্ত পৃ. ৯৪-৯৭।

১৪০ ঐ।

১৪১ দ্রষ্টব্য মওলানা কেরামত আলী, কওল আল ছাবিত, কলিকাতা, হিজরী ১৩৪৪ পৃ. ৪

১৪২ বর্তমান গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

১৪৩ ঐ

১৪৪ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।

১৪৫ দ্রষ্টব্য, মওলানা কেরামত আলী : কুওঅত আল ঈমান, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৫ থেকে ১৪৫। পৃ. ১৪৯ ও ১৬৬।

১৪৬ দ্রষ্টব্য, ফজলে হোসেন, আল হায়াত বাদআল মামাত, পৃ. ৩০৮ ড.এম. এ. বারি তাঁর থিসিস এ উদ্ধৃত করেছেন ড. বারি, অপ্রকাশিত. Ph.D. thesis a comparative study of the Early wahhabi Doctrine and Contemporary Reform Movement in Indian Islam (Dxfor university, 1953) পৃ. ১৫৮

ফলশ্রুতিতে আমরা উনিশ শতকের শেষার্ধে লক্ষ্য করি যে, বাংলার ধর্মীয় জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ করে। এই বৈশিষ্ট্য 'বাহাছ' হিসাবে পরিচিতি অর্জন করে। তাইউনী এবং ফরায়েযীদের মধ্যে এই ধরনের বেশ কয়েকটি 'বাহাছ' অনুষ্ঠিত হয়, যা অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।[১৪৭]

ফরায়েযী আহল ই হাদিস সম্পর্ক

আহল ই হাদিস বা নবীজীর সুন্নীহর অনুসারীগণ 'তকলিদ'বা মযহাব অনুসরণ করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। নবীজীর সুন্নত অনুসরণের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে মূল উৎস যাচাই করার জন্যে আহল ই হাদিস মত প্রকাশ করে। সরকারি নথি গেজেটিয়ারে এদেরকে রাফি ইয়াদাইন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নামাজের জন্যে দাঁড়িয়ে বার বার হাত তোলার জন্য এরা উক্ত নামে পরিচিত হয়। উপমহাদেশের সব জায়গায় আহল ই হাদিস এর অনুসারীগণ ছড়িয়ে আছে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাকেরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলায় আহল ই হাদিসের অনুসারীদের সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায়। আহল ই হাদিসের বুদ্ধিজীবী মতাদর্শের কারণে গ্রাম বাংলায় এই আন্দোলন কখনও জনপ্রিয়তা পায়নি। উপরন্তু ফরায়েযীগণ 'হানাফী' মযহাবের অনুসারী হিসাবে নবীজীর সুন্নত অনুসরণের বিষয়ে কোনো বিরোধিতা করেনি। সুতরাং ফরায়েযীদের কাছ থেকে আহল ই হাদিস সরাসরি কোনো বাধা পায়নি। বাংলার গ্রামাঞ্চলে জুমা ও ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফরায়েযীদের ফতোয়া রয়েছে, যেখানে 'আহল ই হাদিস'এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪৮] সর্বোপরি 'ফরায়েযী 'এবং আহল ই হাদিস আন্দোলন পরস্পরের প্রতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছিল শীতল।

সেকশন খ (স্থানীয় সামাজিক আচারসমূহ)

উনিশ শতকের মুসলিম সমাজকে জেমস ওয়াইজ চারটি ধর্মীয় গ্রুপে বিভক্ত করেছেন। এগুলো ছিল সাবেক,ফরায়েযী, তাইউনী এবং আহল ই হাদিস (রাফি ইয়াদাইন)। তাঁর মতে একমাত্র সাবেক গ্রুপের মুসলিমদের মধ্যে সনাতন সমাজের আচার বিদ্যমান ছিল। 'সাবেকী' শব্দটি আরবি 'সাবেক' থেকে এসেছে। এই শব্দটির অর্থ "যা গত হয়েছে"। সুতরাং "সাবিকী" মুসলিম বলতে তাকেই বুঝায় যে পূর্ব পুরুষদের অথবা যাঁরা আচার অনুসরণ করছে।[১৪৯] ওয়াইজের মতে 'সাবিকী' গ্রুপ অধিকাংশ জমিদার অথবা কিছু পুরানো সুন্নী পরিবারের বংশধরদের নিয়ে গঠিত।[১৫০] তিনি এই গ্রুপকে গোঁড়া হিসাবে উল্লেখ করেন। যাঁরা হিন্দু ধর্ম থেকে আগত। তিনি আরও বলেন যে 'সাবেকী' সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও দুর্নীতি পরায়ণ। ওয়াইজ বলেন যে, 'সাবেকী' সামাজিক ব্যবস্থা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দেশের প্রধান ধর্ম ছিল। কুসংস্কার

---

১৪৭ দেখুন, এই গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়

১৪৮ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায় পৃ. ৭২।

১৪৯ দ্রষ্টব্য, James wise : Eastern Bengal. পৃ. ৬-৭।

১৫০ ঐ, এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মুসলিম সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ওয়াইজ নিজেও এই সত্যটি সম্পর্কে বলেছেন। ঐ পৃ. ২১

এবং জড়তা অনুধাবন করে তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলা অঞ্চলে ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু হওয়ার পরই জনগণের মধ্যে প্রকৃত ইসলাম আবির্ভূত হয়।[১৫১] ১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেন তখন তিনি দেখেন যে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজ দুর্নীতি এবং অনৈসলামিক কার্যক্রমে ডুবে আছে। এই কারণে তিনি তাঁর সংস্কার কর্মসূচীর প্রাথমিক নীতি হিসাবে 'তওবা'র কথা বলেন।[১৫২]

১৮৩৫ সালের দিকে মওলানা কেরামত আলী পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও আচারে ডুবে থাকার কারণে স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের কথা বলেন, যাতে করে এই সমাজ শুদ্ধ ইসলামে ফিরে আসে।[১৫৩] এমনকি পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৮৭২/১২৮৯ হিজরীতে তিনি দক্ষিণ বাংলার মুসলিম সমাজ সম্পর্কে বলেন যে, এরা "মুসলিম" বিশ্বের যে কোনো অংশের চেয়ে তখনকার সময় ধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অলসতা এবং অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে।[১৫৪]

ফরায়েযী, পাটনা স্কুল, তাইউনী এবং আহলে হাদিস আন্দোলনসমূহ উপমহাদেশে ইসলামী মূল্যবোধ পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করেছে। মুসলিম সমাজের পুরনো মূল্যবোধকে অনৈসলামিক আচার থেকে পরিশুদ্ধ করে ইসলামী মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আন্দোলনগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

সুতরাং পুরনো সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল জনপ্রিয় সামাজিক আচার প্রচলিত ছিল এবং যেগুলো দূরীকরণে উক্ত আন্দোলনসমূহ কাজ করেছিল 'সে' সম্পর্কে পরীক্ষা করা এখানে প্রাসঙ্গিক। 'সাবিকী' বা পুরনো সমাজ ব্যবস্থায় স্থানীয় এবং বহির্দেশী অনেক আচারের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে আগত মুসলিমগণ বিভিন্ন আচার-আচরণ এ দেশে নিয়ে আসে অথবা (এ সকল দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে এশিয়া, আরব পারস্য এবং উত্তর ভারত উল্লেখযোগ্য) স্থানীয় আচারাদি গ্রহণ করে। স্থানীয় আচারগুলোর মধ্যে ছিল নানা প্রকৃতির সুফি মতাদর্শ, সামাজিক নীতি ও উৎসব। এই আচারগুলো সুস্পষ্টভাবেই ইসলামপূর্ব সময়ের হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমোক্ত আচারগুলো উত্তর ভারত থেকে এসে ছিল যা এইগুলোর প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়। কিন্তু শেষোক্ত আচারগুলো পূর্ব ভারত বা বাংলা অঞ্চল থেকে মুসলিম সমাজে গৃহীত হয়েছিল। এই ধরনের জনপ্রিয় আচারগুলো ও ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নোক্তভাবে দেখা যায় :

(ক) পীর তন্ত্র

(খ) সুফি তন্ত্র

(গ) বহিরাগত মুসলিম দ্বারা বিভিন্ন উৎসব, বিগ্রহ এবং সামাজিক আচারের সৃষ্টি।

(ঘ) বাংলার সুফি সমাজে শিয়াদের প্রভাব।

(ঙ) স্থানীয় আচার-আচরণ গ্রহণ।

---

১৫১ James wise. পূর্বোক্ত পৃ. ৭।
১৫২ বর্তমান গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায় পৃ. ৬১।
১৫৩ দ্রষ্টব্য, মওলবী কেরামত আলী : মাকাশিফাত ই রাহমত, পৃ. ৩
১৫৪ ঐ

(ক) পীর তন্ত্র : ফার্সি ভাষায় 'পীর' শব্দের অর্থ হল 'বয়স্ক'। ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় 'পীর মর্দ্দ' মানে 'একজন বয়স্ক মানুষ'। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে 'পীর' শব্দটি বিশেষ করে ব্যবহৃত হয় একজন 'সুফি পথ প্রদর্শক' এর ক্ষেত্রে যিনি সুফিবাদে শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। পীরের অনুসারীদেরকে 'মুরীদ' বলা হয়। বাংলা ভাষায় 'পীর' শব্দটি একান্তভাবেই সুফি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা অঞ্চলে 'পীর' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়। তা 'শেখ' অথবা 'উস্তাদ' রূপে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত হয়।[১৫৫]

উপরোক্ত ধারণায় পীরতন্ত্রকে সুফিবাদের সমপর্যায়ের বলা যায়। তবে বাংলা অঞ্চলে ব্যবহৃত 'সুফি' এবং 'পীর' শব্দের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। একজন সুফি আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা করেন। যে জ্ঞানকে বলা হয় 'ইলম ই তাসায়ূফ'। কিন্তু পীরগণ সুফিদের ছাড়াও অনুসারীদেরকে আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ করেন। বাংলা অঞ্চলে এই পার্থক্যটি পুরোপুরিভাবে বজায় রাখা হয়েছে। সুতরাং সকল পীরগণই সুফি কিন্তু সকল সুফি পীর নাও হতে পারেন। এই পার্থক্য থাকায় তাৎপর্য হল যে, একজন সুফি 'তাসায়ূফ' এর উপর গুরুত্ব দেয় এবং একজন পীর শুধু পীরতন্ত্রে গুরুত্ব দেয়।

তা ছাড়া উপমহাদেশে সুফিবাদের ঐতিহ্যে দেখা যায় যে, যোগ্যতা অনুযায়ী একজন সুফি সাধকের উত্তরসূরি নির্বাচিত করা হয়।[১৫৬] কিন্তু একজন পীর বংশাণুক্রমিকভাবে হয়ে থাকে।

কে. এম. আশরাফ প্রাক-মোগল আমলের সমাজ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, উত্তর ভারত সমাজে একটি শ্রেণী ছিল যাঁরা ইসলামের প্রকৃত আর্দশ বাদ দিয়ে সন্ন্যাসব্রত পালন করত অথবা বৈষয়িক জীবনে অনাসক্ত ছিল। যখন এই সকল ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করত তখন নিজেদের অস্বাভাবিক জীবন পদ্ধতির মাধ্যমে এরা ইসলাম অনুসারীদেরকে তাঁদের প্রতি আকর্ষণ করত। বৈষয়িক জৌলুষের অধিকারী শ্রেণীটি নিজেদেরকে তাদের প্রতি মোহগ্রস্ত করে রাখত। কে. এম. আশরাফ আরও লিখেন যে, ভারত ইতোমধ্যেই হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'গুরুকে সমাজে পরিচিত করেছে। মুসলিম সমাজের পীর অথবা 'শেখ' ছিল 'গুরু' শব্দেরই প্রতিধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে একজন সাহাবী যদি তাঁর জীবদ্দশায় সমাজে খ্যাতি অর্জন করতে পারে, তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানেরা এর ফসল ঘরে উঠাতে সক্ষম হয়।[১৫৭] একইভাবে সাম্প্রতিক গবেষণায় ড.করিম বাংলার প্রাক-মোগল যুগের সমাজ সম্পর্কে বলেছেন যে পীরতন্ত্র বাংলায় উৎপত্তি হয়নি। কিন্তু মুসলমানগণ দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করার ফলে স্থানীয় জনগণের (যাঁদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে) কাছ থেকে পীরতন্ত্রের ধারণা গ্রহণ করে। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা পীরের মধ্যে

---

১৫৫ দ্রষ্টব্য, Encyclopadia of Religion and Elhics vol. x. পৃ. ৪০।

১৫৬ বিভিন্ন দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন ফরিদ উদ্দিন আত্তার : তাজকিরাত অল আওলিয়া।

১৫৭ Kunwar Muhammad Ashraf : Life and conditions of the People of Hindustan (200-1500 A.D.) Calcutta, (JASP, letters, vol. i, 1935 No.2) 1935 পৃ. ১৮৭

তান্ত্রিক গুরুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। এ ছাড়া দরগাহ্ এবং সমাধি সৌধের[১৫৮] মাঝে দেখে 'চৈত্য' বা 'স্তুপাকে (বৌদ্ধদের উপাসনার স্থান)। ড. করিম বহু সংখ্যক সুফি সাধকের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মতে বাংলার প্রাথমিক মুসলিম সমাজের সুফিগণ 'শাহ্'[১৫৯] অথবা 'শেখ'[১৬০] হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সুফি সাধকদের ব্যবহৃত এই ধরনের পদবি গ্রহণ পরবর্তী সময়ের পীরতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়। ড. করিম পীরতন্ত্রকে বাংলা অঞ্চলে ইসলামের সবচেয়ে জনপ্রিয় শক্তির উপাদান মনে করেন।[১৬১] প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ শিলালিপি, পীর দরবেশদের জীবনীসাহিত্য, পুঁথি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে,পীর দরবেশগণের চরিত্রের সঙ্গে অতিমানবীয় গুণাবলী রয়েছে। এই গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে 'দীনকে সাহায্য করা, এতিম এবং রোগীকে সাহায্য করা, একই সময়ে, একাধিক স্থানে উপস্থিত হওয়া, মৃতকে জীবন দেওয়া যে কাউকে ইচ্ছানুযায়ী হত্যা করা এবং ভবিষ্যত দ্রষ্টা হিসাবে আগাম সবকিছু বলতে পারা।[১৬২] জনসাধারণ পীরদের দরগাহ্ (সমাধি অথবা স্মৃতি সৌধ) কে তাদের তীর্থস্থান হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। পীরকে উদ্দেশ্য করে এরা অনেক কিছু দান করে অথবা কবরের উপর সমাধি সৌধনির্মাণ করে সজ্জিত করে থাকে। শাসকেরা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে এবং এইগুলোর সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।[১৬৩] উনিশ শতকের বাংলা অঞ্চলের পীর দরবেশদেরকে জেমস ওয়াইজ প্রথমবারের মতো দুইভাগে ভাগ করেছেন। একটি দলকে বলেছেন 'বা-শরা' (যে সকল দরবেশ শরীয়া বা ইসলামী আইন[১৬৪] অনুযায়ী অনুশীলন করেন) এবং অপর টিকে বলেছেন 'তেসরা' (যাঁরা শরীয়া অনুযায়ী অনুশীলন করে না) প্রথমোক্ত দলের দরবেশদেরকে 'সালিক' এবং শেষোক্ত দলকে বলা হয় 'মাজযুব'।[১৬৫] ওয়াইজ সঠিকভাবেই বলেছেন যে, আরবি শব্দ 'সালিক' মানে ভ্রমণকারী।

সুফিবাদের পরিভাষায় 'সালিক' হলো যে, ভ্রমণকারী আধ্যাত্মিক পথে সচেতনভাবে ইসলামী আইন অনুযায়ী ধর্মীয় কর্তব্য পালন করা। সুফি পরিভাষায় 'মাজযুব' মানে হলো, যিনি অচেতন হয়ে আল্লাহর ভালবাসায় মত্ত হয়ে পার্থিব নিয়মকানুন অনুযায়ী ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেন।[১৬৬]

সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে 'মাজযুব'দের ইচ্ছাসমূহ হলো আল্লাহর ইচ্ছা যা 'মাজযুব' দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই ধারণায়, সে হল একটি মৃত ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত। জেমস্ ওয়াইজ বলেছেন যে,

---

১৫৮ Dr.Abdul Karim. Social History of the Muslims in Bengal down to A.D. 1538. Asiatic Society of Bangledesh. Dhaka. 1959 পৃ. ২০৯।

১৫৯ ঐ পৃ. ৮৮থেকে।

১৬০ ঐ পৃ. ৫০থেকে।

১৬১ ঐ পৃ. ২০৯।

১৬২ ড.আবদুল করিম, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৪।

১৬৩ ঐ পৃ. ২০৯।

১৬৪ দ্রষ্টব্য, জেমস ওয়াইজ. Eastern Bengal. পৃ. ৫৩

১৬৫ ঐ

১৬৬ James wise, পূর্বোক্ত পৃ. ৫৩-৫৪।

এরা ক্ষুধার্ত হলে আহারও পান করে, যখন যেটা ইচ্ছা করে। আহার করার যোগ্য বা অযোগ্য বাছ-বিচার না করেই এরা আহার গ্রহণ করে। 'মাজযুব'গণ নগ্ন শরীরে বা অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুরাঘুরি করে থাকে। ভিক্ষা করে বা দানের অর্থে এরা জীবন ধারণ করে। অতি প্রাকৃত শক্তি অধিকারীরূপে, সে এদেরকে সমাজে দেখা হয়। অপর দিকে 'সালিক'ভুক্ত দরবেশগণ সাধারণত বিয়ে করে সংসারী হয়ে থাকে। এরা নিজেদের জন্য অনুসারী বা শিষ্য গ্রহণ করে। 'সালিক'গণ বাংলা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।[১৬৭]

'পীরতন্ত্রের' জনপ্রিয়তা বিশেষ করে 'পীর' চরিত্রসমূহের অলৌকিকতাকে সৈয়দ আহমদ শহীদ তীব্র সমালোচনা করেন।[১৬৮] এমনকি হাজী শরীয়তুল্লাহ 'পীর' এবং 'মুরিদ' শব্দ দুটি অনৈসলামিক বিবেচনা করে এই দুটি শব্দ পরিহার করতে বলেন। এর পরিবর্তে তিনি 'উস্তাদ'বা শিক্ষক এবং 'সাগরেদ'বা ছাত্র ব্যবহার করতে বলেন।[১৬৯] অশিক্ষিত মুসলিমদেরকে আধ্যাত্মিক পথে শিষ্য করার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।[১৭০] একইভাবে মওলানা কেরামত আলী 'পীরজাদা' (পীরের সন্তান) দের অনৈসলামিক কার্যকলাপ এবং ভূয়া পীরদের তীব্র সমালোচনা করেন।[১৭১]

(২) পীর দরবেশ কাল্ট (ধর্মপথ)

বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্তুপা বা চৈত্য উপাসনা করার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত ছিল। স্তুপাকে বৌদ্ধগণ ফুল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়ে সাজিয়ে রাখে। হিন্দু সম্প্রদায় মানুষের শরীরের মাঝে 'অবতার' ও আধ্যাত্মিক ছায়া রয়েছে বলে বিশ্বাস করে থাকে। স্থানীয় জনগণ যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তখন তাদের মনে পীর দরবেশ এর ব্যাপারে এ ধারণাটি কাজ করে।[১৭২] এর ফলে পীরতন্ত্রকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি স্থানীয় পীরনির্ভর কাল্টের উদ্ভব ঘটে। এইগুলোর মধ্যে 'পাঁচপীর', 'ঘোড়াপীর' 'কুম্ভিরা পীর' এবং 'মাদারীপীর' উল্লেখযোগ্য।[১৭৩] এ ছাড়া মুসলিম সমাজের 'সত্যপীর' এবং হিন্দু সমাজের সত্য নারায়ণ[১৭৪] একই চরিত্রের অধিকারী ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজশাহী জেলার বিখ্যাত পাহাড়পুর বৌদ্দ বিহারে 'সত্যভিটা'য় মুসলিম সমার্ধির সন্ধান পাওয়া যায়।[১৭৫] লক্ষণীয় যে এই ধরনের স্থানীয় পীরতন্ত্র বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছিল যা স্থানীয়ভাবে এর উৎপত্তি নিদের্শ করে।

---

১৬৭ ঐ পৃ. ৫৩।
১৬৮ দেখুন, গ্রন্থের পূর্বের অধ্যায়।
১৬৯ দেখুন, গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
১৭০ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের ৩য় ও ৭ম অধ্যায়।
১৭১ দেখুন, মওলবী কেরামত আলী : মাকাশিফাত ই রাহমাত, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩
১৭২ দ্রষ্টব্য, Dr. A. Karim. Social History of the Muslims of Bengal. পূর্বোক্ত পৃ. ১৬৩-৬৪।
১৭৩ ঐ পৃ. ১৬৭-৭০।
১৭৪ ঐ পৃ. ১৬৫।
১৭৫ K.N. Dikshit, Memoirs of the Archological survey of India. No. 5 8, Delhi, 1938 পৃ. ৮০।

(৩) অন্যান্য পীর নির্ভর ধর্মমত, আচার ও উৎসবাদি

বেশ কয়েকটি পীর নির্ভর ধর্মমত বাংলায় মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এগুলোর মধ্যে 'খোয়াজ খিজির''জিন্দা গাযী''পীর বদর' এবং 'শেখ সাধু' উল্লেখ যোগ্য।[১৭৬] নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহ এগুলোর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। যেমন খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'বেড়া' উৎসব। অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকের বাংলায় ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিনে ধনী দরিদ্র সকলেই এই অনুষ্ঠান পালন করত। জেমস ওয়াইজের মতে, বৃষ্টি হওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝি এবং জেলেরা এই উৎসব পালন করত। 'বেড়া' কাগজ দিয়ে তৈরি করে রঙিন কাপড় দিয়ে সজ্জিত করা হতো। এটার একটি নারী চেহারা সাদৃশগোলই থাকত এর সঙ্গে ময়ূরের মাথা ও বুক থাকত। ময়ূরপংখী নৌকার অগ্রভাগের মতোই এটা তৈরি করা হতো। এরপর এই প্রতিকৃতিটিকে কলাগাছের তৈরি ভেলায় বসিয়ে সূর্যাস্তের সময় ভাসানো হতো। অস্তাচল গামী সূর্যের রশ্মি পানির স্রোতের সঙ্গে মিশে,অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করত।[১৭৭] গোলাম হোসেন সেলিম তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে,[১৭৮] নওয়াব সিরাজ উদ্দৌলা মুর্শীদাবাদে এই উৎসব পালন করেছেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে মুর্শীদাবাদের নবাব জাকজমক সহকারে তা পালন করেন।[১৭৯] **নবীজীর জন্মদিন পালনের উৎসব এদেশে বহিরাগত মুসলিমগণ প্রচলন করে।** এই দিবস পালনকে মৌলুদ শরীফ, মিলাদ শরীফ অথবা মিলাদ উন নবী বলা হয়। এই দিবসটি তিনটি পদ্ধতিতে পালন করা হয় :

(ক) নবীজীর জন্মের পূর্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিবরণ ;

(খ) জন্মের সময়ের ঘটনাবলীর যা তাওয়াল্লুদ শরীফ হিসাবে পরিচিত এবং

(গ) নবীজীর আদর্শ এবং শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা তাওয়াল্লুদ শরীফের সময় নবীজীর আরবি, উর্দু অথবা ফার্সিতে কোরাস গাওয়া হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ভাষাতেও কোরাস গাওয়া হয়ে থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে নবীজীর জন্ম গ্রহণের ঘটনাবলী বলা উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সঙ্গীত বা কোরাস গেয়ে থাকে। **সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নবীজীর আত্মা অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন।**[১৮০]

'ফাতিহা'র মতো একইভাবে বহিরাগত মুসলিমগণ 'উরশ'প্রথা বাংলা অঞ্চলে প্রচলন করে। 'ফাতিহা'র সমর্থকগণ মনে করে যে, এই শব্দটি পবিত্র কোরআনের প্রথম অধ্যায় 'সূরা ফাতিহা' থেকে এসেছে। 'ফাতিহা' অনুষ্ঠানের সময় সূরা ফাতিহা বারবার তেলাওয়াত করার কারণে অনুষ্ঠানের নামটি এমন হয়েছে।[১৮১]

---

১৭৬ দ্রষ্টব্য, James wise. Eastern Bengal, পৃ. ১২-২০।

১৭৭ ঐ পৃ. ১২।

১৭৮ দ্রষ্টব্য, গোলাম হোসেন সেলিম, সিয়ার আল মুতাখখারিন (এম, রেমন্ড কৃত ইংরেজি অনুবাদ, জন ব্রিগস্ সম্পাদিত), ২য় খণ্ড : পৃ. ৫৩৩।

১৭৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত : সংবাদ পত্রে সে কালের কথা, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭২।

১৮০ ঐ মৃত ব্যক্তির স্মরণে যে অনুষ্ঠান পালিত হয়।

১৮১ দ্রষ্টব্য, মওলবী ফাইয্ অহমদ লিখিত ফতোয়ার পান্ডুলিপি, 'ফাতিহা' অনুষ্ঠানের বৈধতার উপর এই ফতোয়াটি দেয়া হয় (গ্রন্থকারের কাছে রক্ষিত আছে)

'ফাতিহা'র মতো 'ওরশ' এর তিনটি অংশ থাকে। (ক) পবিত্র কোরআন থেকে বারবার সূরা ফাতিহা পড়া বা কোরআনের অন্যান্য অংশ তেলওয়াত করা (খ) অতিথিদেরকে ভোজ দ্বারা আপ্যায়ণ করা। ভোজের জন্য খাসী জবাই হতে পারে এবং (গ) আল্লাহর কাছে কোরআন তেলওয়াত ও ভোজের বিনিময়ে মৃত ব্যক্তির জন্যে দোয়া প্রার্থনা করা। এই 'ফাতিহা' কে 'ইছালে সওয়াব' বলা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে 'ফাতিহা'র আয়োজন হয় আর পীরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'উরস' হয়ে থাকে। তবে 'উরস' এর সময় বেশী লোকের সমাগম হয় যদিও এই অনুষ্ঠানে 'ফাতিহা'র চরিত্র বজায় থাকে। একজন ব্যক্তির মৃত্যুর ৩য়, ৪র্থ, ১০ম এবং ২০তম অথবা ৪০তম দিনে সাধারণত ফাতিহা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তা বাৎসরিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা কেরামত আলী উক্ত 'ফাতিহা' সহ ছয় ধরনের 'ফাতিহা'র কথা বলেছেন।[১৮২] অন্যদিকে 'উরস' বছরে একবারই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে মৃত পীরের শিষ্য এবং অনুরাগীগণ দরগা বা খানকায় জমায়েত হয়।

এখানে কয়েকদিন অবস্থান করে শিষ্যগণ আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকে। শিষ্য এবং অনুরাগীগণ নিজেদের জন্য খাদ্যদ্রব্য এবং মৃত পীরের সন্তান বা বংশধরদের জন্য নগদ অর্থ এবং জবাই এর উদ্দেশ্যে পশু নিয়ে আসে। মিলাদ,ফাতিহা এবং উরস পালনের ভাষা হল উর্দু ফার্সি এবং আরবি। এতে ধারণা করা যায় যে, উক্ত ধর্মীয় প্রথাসমূহ বাংলা অঞ্চলের বাইরে থেকে এখানে এসেছে। যদিও এই সকল প্রথা নবীজীর সুন্নাহ্‌তে বা তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী অনুসারীদের জীবনের সঙ্গে কোন মিল নেই। উক্ত প্রথাসমূহের প্রচলনকারীগণ প্রথাসমূহকে ধর্মীয় আচরণ দেয়ার ফলে মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বে তা সার্বজনীন হয়ে পড়ে।

(৪) সুন্নী সমাজে শিয়াদের প্রভাব

ষোড়শ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজে শিয়া প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পারস্য থেকে মোগল শাসকগণ শিয়া মতাদর্শ নিয়ে আসেন। উক্ত সময় থেকে শিয়া সম্প্রদায় থেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হতে থাকে। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলার সকল নবাবই ছিলেন শিয়া। নবাবেরা শিয়া রীতি এবং উৎসবাদি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[১৮৩]

যদিও শিয়া মতাদর্শ বাংলার মুসলিম সমাজে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তবে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনাবলী সাধারণ মুসলিম সমাজে প্রভাব ফেলে। এই বিয়োগান্তক ঘটনা নিয়ে বেশ চমৎকার পুঁথি লিখিত হয়। নবীজীর দৌহিত্র হযরত হোসেন (রাঃ) এর মর্মান্তিক শাহাদত বরণ নিয়ে এই পুঁথি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া বাংলা গানের একটি নতুন ধারা হিসাবে 'জারীগানের' সৃষ্টি হয়। বড় বড় শহর,নগর ও তৎসংলগ্ন স্থানে মহররম জাকজমকভাবে পালিত হতে থাকে।

---

১৮২ মওলবী কেরামত আলী হাক্কী আল ইয়াকিন, কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরী পৃ. ৩৯।
১৮৩ দ্রষ্টব্য, James wise. Eastern Bengal. পৃ. ৬।

কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা নিয়ে পথে নাট্যানুষ্ঠান করা ছিল মহররম পালনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবি পঞ্জিকার প্রথম মাস মহররমের দশ তারিখে ইমাম হোসেনের শহীদ হওয়াকে স্মরণ করে তা অনুষ্ঠিত হয়। মহররমের দশ তারিখকে উদযাপনের প্রক্রিয়া হিসাবে নিয়মিত অনুশীলন কিছুদিন পূর্ব থেকেই শুরু হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে একটি তাজিয়া নির্মিত হয় এবং এতে হোসেনের মৃতদেহের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়। দশ তারিখ রাতে (যে রাতকে 'মঞ্জিল কা দিন' বলা হয়) যে ভবনে সকলের শ্রদ্ধাভাজন এবং বয়স্ক ব্যক্তি নিদ্রা যাবেন, সে স্থানে 'তাজিয়া' রাখা হয়। এই সময় একজন 'পরী' তাকে বলবে কখন 'তাজিয়া' নিয়ে যেতে হবে এবং উক্ত সময়ে 'তাজিয়া' একটি 'গদী নীল বহর' এ স্থাপন করে মুসলিম জনতার মাধ্যমে বহন করতে হবে। এই সময় এটাকে প্রায় চার মাইল দূরে (ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে) মিছিল সহকারে বহন করে একটি পুকুরে ফেলা হয়।

জেম্‌স ওয়াইজ লিখেছেন যে, 'তাজিয়া' (কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল) প্রতিটি মুসলিম প্রধান গ্রামে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রতিটি গ্রাম প্রতিবেশী গ্রামের চেয়ে জাকজমক সহকারে 'তাজিয়া' নির্মাণে সচেষ্ট ছিল। গর্সিন দ্য তাসি এবং জেসম্ ওয়াইজ এই উৎসবকে হিন্দু সমাজের দুর্গাপূজা এবং রথ যাত্রার[১৮৪] সঙ্গে তুলনা করেছেন। ওয়াইজ আরও বলেছেন যে পূর্বে একটি 'নীল বহর' বিবি ফাতিমার সম্মানে তৈরি করা হতো। অনেক বছর ধরেই কাগজে তৈরি তাজিয়া (তোরবাত হায়দারী) মহররমের সময় এর ভিতরে রাখা হতো।[১৮৫] কিন্তু বর্তমান সময়ের গ্রামগুলোতে মিছিল সহকারে 'তাজিয়া' বের করা হয় না।

(৫) স্থানীয় প্রথাসমূহের স্থায়িত্ব

গুটিবসন্ত রোগ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বিশেষ করে গ্রামের মহিলাগণ 'শিতলা দেবীর' উদ্দেশ্যে মানত করত। 'শিতলা' দেবী হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবী, যে গুটি বসন্তের ধারক হিসাবে উক্ত সমাজে পূঁজনীয়। এই প্রথাটি বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও প্রচলিত ছিল।[১৮৬]

আরও একটি শক্তি সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ভীতি ছিল। এই শক্তিকে বলা হতো মাতৃ বা 'উম্ম ই সিবিয়ান'। দুটি সমাজই বিশ্বাস করত যে, এই শক্তিটি ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত একটি শিশুকে মুর্চ্ছা যেতে সাহায্য করে। এরপর এটা কোন ক্ষতি করতে সমর্থ নয়। উক্ত সময়ে কোন শিশু মুর্চ্ছা গেলে ওঝা ডাকানো হতো। যদি ওঝার সাহায্যে মুর্চ্ছা যাওয়া শিশু আরোগ্য লাভ করত,তাহলে তাকে পারিতোষিক দেয়া হতো।[১৮৭]

---

১৮৪ James wise, Eastern Bengal, পৃ. ৯।

১৮৫ ঐ

১৮৬ শাহ্ ইসমাইল শহীদ গুটি বসন্তের দেবীকে পূজা করার বিষয়টি তাঁর গ্রন্থ 'তাকিয়াত আল ঈমান' এ কঠোর সমালোচনা করেন। ইংরেজিতে অনূদিত support of Failh, মীর হাশমত আলী, লাহোর, তারিখ বিহীন পৃ. ৫০।

১৮৭ দ্রষ্টব্য, James wise, Eastern Bengal, পৃ. ৫০ থেকে।

জেমস্ ওয়াইজের মতে,একজন শিশু জন্ম নেয়ার পর অনেকগুলো অদ্ভুত প্রথা পালন করার ব্যবস্থা ছিল। গরমের দিনে ছয় দিন এবং শীতের সময়ে ২১ দিন 'অশুচিঘর' বা 'চাটি ঘর' এর দরজায় শিশুর জন্ম উপলক্ষেই আগুন জ্বালানো হতো। অশুচি ঘর এর কোণায় বাতি জ্বালিয়ে রাখা হতো। বাতি যাতে করে নিভে না যায় সে জন্যে একজনকে এই কাজে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা ছিল। ঘর অন্ধকার হলে অশুভ কিছু হতে পারে এই ধারণা থেকেই বিরতিহীনভাবে বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা ছিল। ওয়াইজ আরও লিখেছেন যে একজন হিন্দু মাতা ৬ দিন ও একজন মুসলিম মাতা সাধারণত ১০দিন উক্ত ঘরে আবদ্ধ থাকতো।[১৮৮] বিবাহ, খৎনা, মাসিক এবং মৃত্যুর সময় এই ধরনের আরও অনেক প্রথা বিশেষ করে মহিলারা পালন করত। এই সকল প্রথাসমূহ হাজী শরীয়তুল্লাহ্ সমাজ থেকে দূর করেন।[১৮৯]

ইসলামী পুনরুজ্জীবন ও সাবেকী সমাজের প্রতিক্রিয়া

উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ যে সমস্ত অনৈসলামিক আচার ও প্রথাসমূহে অভ্যস্ত ছিল তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন শাহ্ ইসমাইল শহীদ। তিনি তাকিবিয়াত আল ঈমান গ্রন্থে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের মওলবী মোহাম্মদ আলী 'তরীকা ই মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

এই প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি শাহ্ ইসমাইল শহীদ ও সৈয়দ আহমদ শহীদের সংস্কার আন্দোলনকে চ্যালেঞ্জ করেন।[১৯০] পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের একজন বিদ্যান ধর্মতত্ত্ববিদ একই ধরনের প্রতিবাদ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে[১৯১] (শার আল সুদুর ফি দাফি আল শুরুর আজ রাদ্দ ই তাকিয়াত আল ইমান) 'তাকিআত আল ইমান' কে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর গ্রন্থের শিরোনামেই সকল সন্দেহ দূর করার কথা বলেছেন। সুতরাং উপমহাদেশের পুরনো সমাজ শুদ্ধিবাদী ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছিল বলা যায় এবং এই বিষয়ে বাংলা অঞ্চলও পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু 'সাবেকী'সমাজের ধর্মতত্ত্ববিদগণ বেকায়দায় পড়ে যায়। কারণ কোরআন এবং সুন্নাহ্র মাধ্যমে পুরনো পীর নির্ভর ধর্মমত, প্রথা এবং উৎসবাদি অনুষ্ঠিত করা বা বৈধ করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া ইসলামের একত্ববাদ আদর্শকে সনাতন রীতিনীতি পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটাকে 'সাবেকী' সমাজের বিধান উলামাগণও পছন্দ করেননি। সংস্কার আন্দোলনের কর্মীদের দক্ষ প্রচারণার ফলে পুরনো প্রথা ও রীতির বিষয়ে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ উনিশ শতকের শেষার্ধে ইস্তিফতার

---

১৮৮ James wise, পূর্বোক্ত।

১৮৯ এই গ্রন্থের ৩য় এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯০ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকাতে এর কপি সংরক্ষিত আছে। এতে মওলবী ইরতিজা আলীর উত্তরগুলো (তরীকা ই মোহাম্মদীয়া সন্নিবেশিত আছে)। ও JASB, vol. i. 1832 পৃ. ৪৭৯-৯৯। ও Garain de Tassy : History de-la literature Hindouic et Hinduestanic, Paris. 1870-71, vol. iii. পৃ. ১১৫।

১৯১ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এটি মওলবী ফয়েজুর রহমান খানের কাছে সংরক্ষিত। গ্রাম চুনতী, চট্টগ্রাম।

(ইসলামী আইনবিদদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ সম্পর্কে) কথা বলা যায়। মুসলিম সমাজে 'ফাতিহা' অনুষ্ঠান ইসলামী মতে বৈধ কি না সে সম্পর্কে ইসলামী আইনজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত প্রার্থনা করা হয়। কারণ 'ফাতিহা'র কোনো কোনো পর্যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের 'পূজা'র সঙ্গে মিল রয়েছে। সনাতন সমাজের ধর্মতত্ত্ববিদগণ 'ফতোয়া'র মাধ্যমে 'ফাতিহা' সম্পর্কিত সংশয় দূর করেন।[১৯২] তা সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে সনাতন পন্থীরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এইগুলো ছিল (১) মযহাবের চূড়ান্তরূপ এবং তকলিদ, (২) ফাতিহা, (৩) উরস (৪) মিলাদ বা 'সাবেকী' সামাজিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সংস্কারকগণ 'তকলিদ' এর বিষয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মযহাবের চূড়ান্ত রূপে এবং 'তকলিদ'এর পক্ষে মওলানা কেরামত আলীর যুক্তিসমূহ ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে।[১৯৩] 'সাবেকী' ধর্মতত্ত্ববিদগণ একই ধারায় যুক্তি প্রদর্শন করেন।

যদিও তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন 'শরীয়া' একটি কৌশলগত ধারণা, যা ৪টি মযহাবের সমন্বয়ে সৃষ্টি। মযহাবগুলো হল, হানাফী, শাফি, মালিকী এবং হাম্বলী।[১৯৪] সুতরাং কেউ যদি কোনো মযহাব অনুসরণ না করে, তাহলে বাস্তবে সে 'শরীয়া' অনুসরণ করছে না। উপরন্তু মওলানা কেরামত আলী যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, উক্ত কারণে মযহাবসমূহের অনুমোদিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন (লাজিম)। অন্যদিকে 'সাবেকী' সমাজের সমর্থকগণ মযহাব অনুসরণ করাকে 'ফরজ' বা অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করে।[১৯৫] সংস্কার পন্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে মওলবী আবদুল কাদির বলেছেন, "ওহে লা মযহাবের অনুসারীগণ, তোমরা মৃত্যুকে বরণ করতে পার। অন্যদের দোষারোপ করিও না। তোমরা সংস্কারকদের নয় বরং দুনিয়াকে কলুষিত করছ।[১৯৬]

ফাতিহা ওরশ এবং মিলাদ সম্পর্কে 'সাবেকী' ধর্মতত্ত্ববিদগণ ক্রমান্বয়ে স্বীকার করেন যে, নবীজী বা তাঁর নিকট উত্তরাধিকারীগণের সময় এসব প্রথা ছিল না। তাই এগুলো ছিল নতুন উদ্ভাবন। কিন্তু সকল উদ্ভাবনই অকল্যাণকর নয়। তাদের মতে দুই ধরনের উদ্ভাবন রয়েছে (ক) বিদাত ই হাসনা বা সু উদ্ভাবন ও (খ) বিদাত ই সাইয়াহ্ বা পাপাচারপূর্ণ উদ্ভাবন। তাই উপরোক্ত উদ্ভাবনগুলোকে 'সাবেকী' ধর্মতত্ত্ববিদগণ সু - উদ্ভাবন বলেছেন। আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে 'ফাতিহা' এবং 'উরস' একই ধরনের পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'ফাতিহা' সম্পর্কিত ফতোয়াতে মওলবী ফয়েজ আহম্মেদ বলেছেন যে, নবীজী ও তাঁর অনুসারীদের জীবদ্দশায় 'ফাতিহা' বর্তমানের মত অনুষ্ঠিত না হলেও 'ফাতিহা' অনুষ্ঠানের পর্যায়গুলো যে সময়

---

১৯২ মৌলবী ফয়েজ আহম্মদের ফতোয়ার পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

১৯৩ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়।

১৯৪ দ্রষ্টব্য, মওলবী মোঃ আবদুল কাদির : ফতআল মুবিন ফি রাদ্দ, ই, জাফর আল মুবিন, কলিকাতা, ১৩০০ হিজরী পৃ. ১ এবং ৯০ গ্রন্থের মূল উপজীব্য হল হাসর ই মজহাব ই আরবা বা চার মজহাবের সমন্বয়।

১৯৫ ঐ পৃ. ২-৩ এবং ১৯৫-৯৬।

১৯৬ উল্লেখ্য যে, 'লাজিম' শব্দটির অর্থ জরুরি আর 'ফরজ' শব্দের অর্থ অবশ্য পালনীয় যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। এইগুলো প্রত্যাখ্যান করলে একজন মুসলিম বিধর্মীতে পরিণত হয়।

আলাদাভাবে করা হতো। তিনি এর উপর ভিত্তি করে 'ফাতিহাকে বৈধ প্রথা হিসাবে স্বীকৃতি দেন।[১৯৭]

নবীজীর জন্মদিন হিসাবে মিলাদ সার্বজনীনভাবে পালিত হয়ে থাকে। এই দিবসের মাধ্যমে ইসলামের আদর্শসমূহ প্রচার করার সুযোগ থাকে। বছরের যে কোন দিন এই জন্মদিন পালন করা যায়। বাস্তবে, ইসলামী সংস্কারবাদীগণ ও সাবেকী সমাজের ব্যক্তিবর্গ নবীজীর জন্মদিন একই উৎসাহ নিয়ে পালন করে থাকে। মিলাদ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে।

এই অংশে নবীজীর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার সময় 'কিয়াম' বা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় যা "তাওয়াল্লাদ শরীফ" হিসাবে পরিচিত। 'সাবেকী' ধর্মতত্ত্ববিদগণ মিলাদে নবীজীর আত্মা পরিদর্শন উপলক্ষে 'কিয়াম' করাকে 'মোস্তাহাব' বলেছেন। অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ আবার এটাকে 'ওয়াজিব' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯৮] অন্যদিকে সংস্কার পন্থীরা 'কিয়াম' সম্পর্কে বলেন যে এটা কুসংস্কার যা পৌত্তলিকতার পরিচায়ক। তাদের মতে আল্লাহ্‌কে শুধু এভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যায়। সুতরাং 'কিয়াম' এর মাধ্যমে অন্য কিছুকে শ্রদ্ধা জানানো আইন সম্মত নয়।[১৯৯]

সংস্কার পন্থীদের মধ্যে তাইউনী নেতা মওলানা কেরামত আলী 'ফাতিহা' এবং মিলাদ এর পরিমার্জনের কথা বলেছেন। 'হাক্ক আল ইয়াকীন' গ্রন্থে কেরামত আলী বলেছেন যে,'ফাতিহা'র ৩টি পর্যায় কোরআন থেকে তেলাওয়াত, অতিথিদের আপ্যায়ণ, এবং আল্লাহর কাছে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া কামনার ব্যবস্থা রয়েছে, তাই 'ফাতিহা' আইন সম্মত।[২০০] কিয়াম সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট কোন মত প্রকাশ করেননি। কিন্তু তিনি 'কিয়াম' অনুমোদন করেছেন সে সম্পর্কে নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মিলাদ' সম্পর্কিত একটি গ্রন্থে 'কিয়ামের 'পদ্ধতির বর্ণনা আছে। মওলানা কেরামত আলী এই গ্রন্থের পরিমার্জনাকারী এবং অনুবাদক ছিলেন।[২০১] অন্যদিকে তিনি 'উরস' পালনের প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'মাকাশিফাত ই রাহমাত' গ্রন্থে তিনি বলেন নবীজীর সুন্নাহ্ পরবর্তী দুই প্রজন্মে উরস পালনের প্রমাণ নেই। এমনটি মযহাবের চারজন ইমামের লেখনীতেও পাওয়া যায় না। সুতরাং 'উরস' একটি পাপাকীর্ণ প্রথা। তিনি অবশ্য বলেন পূর্ব পুরুষদের কেউ কেউ অবশ্য 'উরস' পালন করেছেন।

কিন্তু তারা ভুলবশত অথবা অজ্ঞতার কারণে তা করেছিলেন।[২০২] পূর্বের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে যে 'ফাতিহা' উরস এবং মিলাদ বহিরাগত মুসলমানদের দ্বারা পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রচলিত হয়েছিল যা সনাতন ধর্মীয় সামাজিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। যদিও এইগুলোর উৎপত্তির ইতিহাস স্পষ্টভাবে জানা যায় না, তা

---

১৯৭ ঐ পৃ. ১ এবং ১৯৪।

১৯৮ মওলবী সাইফুল্লাহ্ খানের ফতোয়া। 'ফতোয়া'র পাণ্ডুলিপি বর্তমান লেখকের কাছে সংরক্ষিত।

১৯৯ দ্রষ্টব্য, হাফিজ আবদুল শাকুর, ইলান ওয়াজিব আল ইজান, মিলাদওয়া কিয়াম পার, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ ১২৯৫ হিজরী, পৃ. ৫-৬।

২০০ দ্রষ্টব্য, মওলবী কেরামত আলী, হাক্কআল ইয়াকিন কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরী, কলিকাতা, পৃ. ৩৯।

২০১ 'ইহিয়া আল কুলাব ফি মৌলুদ আল মাহবুব (এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকাতে সংরক্ষিত)।

২০২ দ্রষ্টব্য, মওলবী কেরামত আলী : মাকাশিফাত ই রাহমাত কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরী, পৃ. ১২

সত্ত্বেও বলা যায় যে,সময়ের বিবর্তনে উক্ত প্রথাসমূহ ইসলামিক চরিত্র অর্জন করে এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তা পালিত হতে থাকে। উপরন্তু দীর্ঘদিন ধরে সমাজে 'ফাতিহা' মিলাদ ইত্যাদি পালন করার ফলে এইগুলো ইসলামী উৎসবে পরিণত হয়। এভাবে 'সাবেকী' উলামাবৃন্দ জনগণের আবেগকে ব্যবহার করে উক্ত প্রথাসমূহ সমাজে প্রচলন করার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছিলেন।[২০৩]

স্থানীয় ঐতিহ্য হিসেবে 'মহররম' 'বেড়া' অথবা সুফি ধর্মমত ইত্যাদির রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিত্তি। এইগুলোর সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন পূঁজার সাদৃশ্য। তাই এই সকল প্রথার ইসলামী ভিত্তি পাওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু উক্ত প্রথাসমূহের বিভিন্ন আচারে রয়েছে ইসলাম পূর্বযুগের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে 'ফাতিহা' 'মিলাদ' এবং 'ওরশ' এর উৎস সম্পর্কে ইতিহাস নির্ভর স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় এইগুলোর বৈধতা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই কারণে শতাব্দী ধরে বিভিন্ন আন্দোলন ও বিতর্কের পরেও 'ফাতিহা' ওরশ ও 'মিলাদ' টিকে আছে। অন্যদিকে 'মহররম' এবং 'বেড়া' বাংলার সুন্নী মুসলিম সমাজ থেকে বিদূরিত হয়েছে।

সেকশন (গ) আর্থ- সামাজিক পটভূমি

হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে দুদু মিয়া আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেন। এর ফলে ফরায়েযী আন্দোলন জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। হিন্দু জমিদার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আশ্রয় হিসেবে ফরায়েযী আন্দোলন কাজ করেছিল।[২০৪] পারিপার্শিকতাই এই আন্দোলনের স্বাভাবিক বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ্ যে 'তৌহীদ' বা একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন, তা দুটি অংশে বিভক্ত ছিল (১) আল্লাহর 'একত্ব' মতাদর্শ গ্রহণ ও (২) সকল পৌত্তলিকতা এবং পাপাচার প্রত্যাখ্যান করা।[২০৫] এই মতাদর্শের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁর অনুসারীরা বলেন যে, এমন কিছু করা ঠিক হবে না, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহর 'একত্ব' অনুসরণে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে ফরায়েযীগণ নিম্নোক্ত কারণে জমিদারদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হিন্দু সমাজের বিত্তশালীগণ পূর্ব বাংলার বড় বড় জমিদারি অর্জন করে। কৃষকদের উপর আবওয়াব বা অবৈধ করধার্যের মাধ্যমে জমিদারগণ নির্যাতনের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই সকল অবৈধ করের মধ্যে ছিল শ্রাদ্ধ খরচা, পৈতা খরচা, রথ খরচা এবং দুর্গাবৃত্তি[২০৬]। হাজী শরিয়তুল্লাহ্ একত্ববাদের একজন প্রকৃত প্রচারক হিসাবে, জমিদারদের ধার্যকৃত এ করসমূহ পরিশোধের বিরোধিতা করেন।

---

২০৩ 'সাবেকী' এবং নতুন চিন্তাধারার ওলামাদের চিন্তা চেতনার মধ্যে পরিস্কারভাবেই বৈপরিত্য দেখা যায়। 'তকলিদ' সম্পর্কে মওলানা কেরামত আলী 'ইজতিহাদ' সম্পর্কে মওলবী বিলায়েত আলী, ও মওলবী আবদুল জব্বারের মতামত দেখা যেতে পারে। বর্তমান গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২০৪ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের ৪র্থ ও ৮ম অধ্যায়।

২০৫ পূর্ববর্তী অধ্যায়।

২০৬ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট - গ।

এই ধরনের কর পরিশোধকে তিনি 'পৌত্তলিকতা'কে উৎসাহ দেওয়া বলে বিবেচনা করেন। এই কারণে তিনি এসব অবৈধ কর প্রদান করতে তাঁর অনুসারীদেরকে বারণ করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহর এই ধরনের পদক্ষেপ জমিদারদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত করে। জমিদারগণ এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে 'ফরায়েযী' অনুসারীদের উপর 'দাঁড়ি কর' ধার্য করে। ২৪ পরগনা জেলায় তিতুমীর অনুসারীদের উপরও একই ধরনের কর ধার্য করা হয়েছিল।[২০৭] এর ফলে ফরায়েযী কৃষক সমাজের সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের সংঘাত অবসম্ভাবী হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়ত মুসলিম সাধারণের দুর্বলতা ও মুসলিম কর্মকর্তাদের অপসারণের ফলে গ্রামীণ মুসলিম অভিজাত শ্রেণী দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে হিন্দু জমিদারগণ তাদের এলাকায় গরু জবাই করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফরায়েযী নেতা জমিদারদের উক্ত নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ করেন। তিনি এই পদক্ষেপকে অন্যায় আখ্যা দিয়ে বলেন যে, এর দ্বারা পৌত্তলিকতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ হিন্দু সম্প্রদায় গরুকে তাঁদের দেবতা মনে করে থাকে।[২০৮]

তৃতীয়ত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে হিন্দু জমিদারগণ হাজী শরীয়তুল্লাহর কর্মসূচীর মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করে। হাজী কৃষকদের মধ্য থেকে আগত অনুসারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। ঢাকা জালালপুর (বৃহত্তর ঢাকা ও ফরিদপুর) জেলার অধিকাংশই ছিল মুসলিম। তাই হাজী শরীয়তুল্লাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জমিদারদেরকে আতংকগ্রস্ত করে তোলে।

অতএব ফরায়েযী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার জন্য জমিদারগণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[২০৯] হাজী শরিয়তউল্লাহ অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে একজন ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন এবং তিনি রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পরিহার করেছিলেন। তাই উত্তেজনা সত্ত্বেও তাঁর জীবদ্দশায় জমিদার এবং ফরায়েযী কৃষকদের মধ্যে তেমন বড় ধরনের সংঘাত হয়নি। অপর দিকে একজন বাস্তবধর্মী মানুষ হিসেবে দুদু মিয়া এই পরিস্থিতিকে অন্যদৃষ্টিতে দেখেন। আন্দোলনের নেতৃত্বে যাবার পূর্বেই দুদু মিয়া জমিদারদের বিরুদ্ধে দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেছিলেন।[২১০]

জমিদারগণ নানা ধরনের বিপত্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এর ফলে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রসার খুব সামান্যই বিঘ্নিত হয়।[২১১]

---

২০৭ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের পূর্বের অধ্যায়।

২০৮ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থকার বরিশাল শহর থেকে যে তথ্য যোগার করেন তাতে দেখা যায় যে এখানে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ্যে প্রথম গরু জবাই করা হয়। সে সময়ে একজন মুসলিম ডেপুটি পুলিশ সুপার শহরে চাকুরিরত ছিলেন।

২০৯ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

২১০ দেখুন, গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়।

২১১ দ্রষ্টব্য, James wise. Eastern Bengal. পৃ. ২২ থেকে ১৩ Trail of Dodo Miyan. পৃ. ৩ এবং ৪৭।

দুদু মিয়া নির্যাতিত কৃষকদের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আন্দোলন করার কারণে ফরায়েযী আন্দোলন পূর্বের চেয়ে আরও বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এই আন্দোলন সারা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।[২১২] আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার দ্বিতীয় বছরে (১৮৪১ খ্রি.) দুদু মিয়া যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেন এবং জমিদারদের দ্বারা অবৈধ করারোপ বা আদায় করাকে শক্তি দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। দুদু মিয়া অনুসৃত নয়া নীতি জমিদার শ্রেণী প্রত্যাখ্যান করে এবং দু পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি সহিংস ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। একপক্ষ অপর পক্ষকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করে। প্রায় প্রতিটি সংঘর্ষে দুদু মিয়া জয়ী হওয়ার ফলে জমিদারদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।[২১৩] ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বহু সংখ্যক ইংরেজ নীল চাষের জন্য গ্রাম বাংলায় অর্থ বিনিয়োগ করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা অঞ্চলের লাভজনক রফতানিযোগ্য পণ্য হিসাবে নীলের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশী। ঢাকা ফরিদপুর এবং বরিশাল জেলার মাদারীপুর মহকুমায় ইউরোপীয়দের বহুসংখ্যক নীল ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত অঞ্চলগুলোতে 'ফরায়েযীদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। চুক্তির মাধ্যমে এই সকল এলাকায় নীল চাষের প্রক্রিয়াটি ছিল বল প্রয়োগের নামান্তর। একজন 'রায়ত' এর জমি সম্পর্কে নীলকর ইচ্ছা মতো দাদন দিয়ে নীল চাষের জন্য হুকুম প্রদান করত। এতে রায়ত নীল চাষ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না।

উপরন্তু নীলচাষের জন্য প্রাপ্য টাকা পরিশোধে নীলকরগণ নানা ধরনের টালবাহানার আশ্রয় নিত। এই ক্ষেত্রে রায়ত কিছুই করতে পারত না। স্বাভাবিক কারণেই ১৮২২ সাল থেকে নীলচাষের বিরুদ্ধে রায়ত শ্রেণী ক্ষুব্ধ ছিল।[২১৪]

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযীগণ মাদারীপুরের নীলকর মি:ডানলপের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘাত শুরু হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, মি.ডানলপের পাঁচ চর নীলকুঠির ম্যানেজার কালিপ্রসাদ কাজিলাল ফরায়েযীদেরকে নির্যাতন করতো। মি.ডানলপের হাত থেকে ফরায়েযীদেরকে রক্ষা করার জন্যে দুদু মিয়া স্বাভাবিক কারণেই এগিয়ে আসেন। ফলশ্রুতিতে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে দুই পক্ষের মধ্যে সহিংস ঘটনার সুত্রপাত ঘটে।[২১৫]

সুতরাং এইভাবে একটি নিখাঁদ ধর্মীয় মতাদর্শ থেকে ফরায়েযী আন্দোলন অর্থনৈতিক সংগ্রামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অত্যাচারি জমিদার এবং নীলকরদের হাত থেকে কৃষক সমাজকে রক্ষা করার কারণেই আন্দোলনের চরিত্র বদলে যায়। জমিদার এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের জমে থাকা ক্ষোভকে দুদু মিয়া সফলভাবে ব্যবহার করেন। এর ফলে ফরায়েযী আন্দোলন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জমিদার এবং

---

২১২ দ্রষ্টব্য, গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়।

২১৩ ঐ

২১৪ দ্রষ্টব্য, সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮ মে, ১৮২২ খ্রি. উদ্ধৃত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত : সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ১ পৃ. ১০৮-১০৯।

২১৫ দেখুন, গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়, উল্লেখ্য যে, মি. ডানলপ এর পূর্বেই জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচারে বাধা দেন : ১৮৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে মি. ডানলপ দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন দ্রষ্টব্য Trail of Dudu Miyan. পৃ. ৩, ৪৭, এবং পরিশিষ্ট পৃ. ৩

নীলকরদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে তা নিজের পক্ষে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুদু মিয়া কালক্ষেপণ করেননি। উপরন্তু জমিদার এবং নীলকরদের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য দুটি বিষয় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। একটি ছিল জমিদার-কৃষক সম্পর্ক ও অপরটি ছিল নীলকর-রায়ত সম্পর্ক। দুদু মিয়ার সময়ে (অর্থাৎ ১৮৪০-৬২খ্রি:) উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য ফরায়েযী আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি রচনা করে।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এবং পরে বাংলার জমিদার শ্রেণীর অবস্থান

মুসলিম শাসনাধীন বাংলা অঞ্চলে জমিদার শ্রেণী সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। জমিদারী ছাড়াও জমিদারগণ সরকারের রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করত। এই সকল জমিদার প্রতিবেশী ভূমির মালিক এবং রায়তদের থেকে রাজস্ব আদায় ছাড়াও কম গুরুত্ব সম্পন্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করত। মামলার সাজা প্রদানের সময় অবশ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হতো।[২১৬] জমিদারগণের কাছে তাদের এলাকার পুলিশের দায়িত্বও ছিল। এই ক্ষেত্রে তাদের জমিদারীর সঙ্গে গ্রামীণ পুলিশ রাখার ব্যবস্থা ছিল।[২১৭] এ ছাড়াও তাদের এলাকায় যদি কোন ডাকাতির ঘটনা ঘটে, তাহলে তাদেরকে ডাকাত ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির করতে হতো। জমিদারী পাওয়ার 'সনদে' এই ধরনের শর্ত ছিল।[২১৮] অসামাজিক ও অপরাধীদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতকে সাহায্য করা ও জমিদারগণের দায়িত্ব ছিল।[২১৯] সুতরাং গ্রাম বাংলার জমিদারগণ শুধু উচ্চবিত্ত শ্রেণীই ছিল না, সাথে সাথে এরা সরকারের স্বার্থও সংরক্ষণ করত।

এখানে উল্লেখ্য যে,জমিদারী সাধারণত একজন ব্যক্তিকে অস্থায়ীভাবে কয়েক বছরের জন্য অথবা সারা জীবনের জন্য দেয়া হতো। কিন্তু বাস্তবে একজন জমিদারের উত্তরাধিকারী হিসেবে জমিদারী পৈতৃক সূত্রেও লাভ করত। অবশ্য নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধের উপর তা নির্ভর করত। কিন্তু বাংলার জমিদারগণ প্রায়ই ছিল স্বার্থান্বেষী এবং অন্তরদর্শী। তাই এরা রায়তদের প্রতি ছিল অত্যাচারী এবং সরকারের কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করত। সারাদেশকে জেলায় বা ফৌজদারীতে বিভক্ত করে প্রতিটিতে একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হতো। প্রতি ফৌজদার ১০০০ থেকে ৪০০০ অশ্বরোহী রাখতে পারত। ফৌজদারদের প্রধান দায়িত্ব ছিল জমিদারকে সার্বক্ষণিক নজরে রাখা এবং প্রয়োজনে তাদেরকে সংশোধন করা।[২২০] প্রধান নির্বাহী হিসাবে ফৌজদার জেলার শান্তি শৃংখলারক্ষক ছিল। এই উদ্দেশ্যে তাকে যে কোনো ধরনের আইন অমান্য করার ঘটনার

---

২১৬ Calcutta Review, vol. xii, 1849, পৃ. ৫১৭ থেকে।
২১৭ ঐ, পৃ. ৫২৮।
২১৮ ঐ
২১৯ ঐ
২২০ দ্রষ্টব্য, সিয়ার আল মুতাখেখরীন (এম রেমভকৃত) ইংরেজি অনুবাদ, কলিকাতা, ১৯০২ খন্ড-৩, পৃ. ১৭৮ থেকে এবং ২০৪ - ২০৫।

প্রতি নজর দেয়া,অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা, রাজপথ নিরাপদ রাখা,কর প্রদানকারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং নির্যাতন থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্বেও[২২১] ন্যস্ত করা হতো।

উপরোক্ত যে কোন বিষয়ে ব্যর্থ হলে অথবা সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে শাস্তি হিসাবে 'জমিদারী' ছিনিয়ে নেয়া হতো। সুতরাং 'জমিদারী' অধিকার অস্থায়ী হওয়াতে এবং ফৌজদারের নজরদারীর ফলে জমিদারগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতো। এই কারণে জনসাধারণের উপর নির্যাতন করার অবকাশ কমই ছিল।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে জমিদারদের অবস্থানে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত জমিদারদের কাছ থেকে ছোট দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা পরিচালনার ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয় এবং এই সকল মামলা আদালতে পাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়ত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'জমিদারী'তে যে পুলিশ বাহিনী ছিল তা অবলুপ্ত করে, সরকারি পুলিশ বাহিনীর প্রবর্তন করা হয়।[২২২]

তৃতীয়ত ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ডাকাতি এবং লুট করা দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের যে দায়িত্ব জমিদারদের কাছে ছিল তা থেকে জমিদারগণের অব্যাহতি দেয়া হয়। ডাকাতির সঙ্গে জমিদারদের যোগাযোগ পুরোপুরি প্রমাণিত হলেই শুধু পূর্বের নিয়মানুযায়ী ডাকাতি ও লুট করা দ্রব্যাদি ফেরত দিতে হতো।[২২৩] ইজারাদার হিসেবে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানকারীকে জমিদারী প্রদান করার (১৭৭২-১৭৯৩) হেস্টিংসের নীতি এবং লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) বাংলার ভূমি নির্ভর অভিজাত শ্রেণীর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ বিরূপ প্রতিক্রিয়া কয়েকটি কারণে সৃষ্টি করেছিল। প্রথমত ইজারাদারী প্রথার নগদ অর্থ সিকিউরিটি হিসাবে প্রদান করার নিয়ম প্রবর্তন করে, যা পুরানো জমিদারগণ দিতে ব্যর্থ হয়। সর্বোচ্চ অংকের ডাক প্রদানকারীকে জমিদারী প্রদানের নিয়মের ফলে, গোমস্তা, মহাজন এবং বেনিয়াগণ তা সহজেই অর্জন করে। এদের কাছে নগদ অর্থ থাকার কারণে জমিদারী অর্জন করতে সমর্থ হয়। উল্লেখ্য যে, এরা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত জমিদারীর এক তৃতীয়াংশ থেকে অধিকাংশ ছিল পুরনো অভিজাত শ্রেণীর মালিকাধীন। কিন্তু চিরস্থারী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় যে, হিন্দু নায়েব এবং শিকদারগণ (যারা জমিদারীর ম্যানেজার ও খাজনা সংগ্রাহক ছিল) জমিদারী অর্জন করে বসে, যদিও পূর্বে এরা মুসলিম জমিদারদের কর্মচারী হিসাবে কাজ করত।

১৮৪২ সালে একজন ইংরেজ কর্মকর্তা একটি বৃটিশ দলিলের খোঁজ পান। এই দলিলে বাংলার একটি জেলার জমিদারী সম্পর্কে বলা হয় যে, এখন এই জেলার বারটি জমিদারীর পুরোটাই পূর্বেকার জমিদারদের হাত ছাড়া হয়েছে। শুধু এদের হাতে রয়েছে খাজনামুক্ত কিছু জমি। এর মধ্যে পূর্বতন জমিদারের বংশধরদের দ্বারা দুটি ও অবশিষ্ট

২২১ ঐ ২০৪।
২২২ Calcutta Review, vol. xii, 1849 A.D, পৃ. ৫২৮।
২২৩ ঐ, vol, পৃ. ৫২৮ এবং vol. iii, ১৮৪৭ খ্রি. পৃ. ১৫০-৫১।

জমিদারী নিম্নশ্রেণীর নব্য ধনীদের দ্বারা অর্জিত হয়েছে।[২২৪] জেমস্ ওকেনলী বলেন যে, উক্ত নীতির ফলে হিন্দু কর আদায়কারীগণ গৌণ অবস্থান থেকে জমিদার হওয়ার সম্মান অর্জন করে।[২২৫]

সুতরাং বৃটিশ অনুসৃত রাজস্ব নীতির কারণে জমিদারীর মালিকানাই শুধু পরিবর্তিত হয়নি, সেই সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন আসে। ভূমি নির্ভর অভিজাত শ্রেণীর স্থান দখল করে,বাণিজ্য নির্ভর হিন্দু ম্যানেজার এবং কর ও খাজনা আদায়কারীগণ। এর ফলে জমিদার কৃষক সম্পর্কে পরিবর্তন আসে। একজন অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মকর্তা ১৮৪২ সালে লিখেন যে, সনাতন ভূমি নির্ভর অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাধারণ জনসাধারণের জন্যে এই শ্রেণীটির সহানুভূতি ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রেই এই শ্রেণীটির মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য বিরাজ করছিল। সম্মানিতপদ হিসাবে এই শ্রেণীটি জনসাধারণের মধ্যে গৌরব আভিজাত্য ভালবাসা পেয়েছিল। এর বিনিময়ে এই শ্রেণীটি কৃষক শ্রেণীর কাছ থেকে পেয়েছিল সাধারণ আনুগত্য। এই ধরনের আবেগ কাজ করার ফলে ভূমি নির্ভর শ্রেণী কৃষক সমাজকে রক্ষা করত।[২২৬] জমিদার হিসাবে শ্রেণীটি ছিল সরকারের প্রতিনিধি, জনগণের পৃষ্ঠপোষক এবং রক্ষক।

এই শ্রেণীটি সাধারণ জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাপনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করত। এর বিনিময়ে জনগণ গ্রামীণ জীবনে জমিদারদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করত ও নেতারূপে বরণ করত।[২২৭]

অন্যদিকে নবপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক জমিদার শ্রেণী ছিল বাণিজ্যিক মনোভাব সম্পন্ন একটি শ্রেণী যাঁরা অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় মূলধন জমিদারীতে লগ্নি করেছিল। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পুলিশ প্রধান ফরিদপুর অঞ্চলের জমিদারদের সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, এই অঞ্চলের রায়তদের থেকে অর্থ আদায় করার জন্যে জমিদারগণ তাদের ক্ষমতার বাইরে যে কোন পথ অনুসরণ করত।[২২৮] ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অপর এক দলিলে দেখা যায় যে নতুন জমিদার শ্রেণীর কিছু সদস্যের প্রথম কাজ ছিল ডাকাত দলকে আশ্রয় দেয়া এবং লুটের অর্ধেক ভাগ গ্রহণ করা।[২২৯] এই দলিলে আরও বলা হয় যে, এইসব জমিদারগণ নির্দিষ্ট আয়ের উৎস হিসাবে ডাকাতিকে পৃষ্টপোষকতা করত।[২৩০] এই বিষয়টিকে ঢাকা-জালালপুরের (বর্তমান ঢাকা ও ফরিদপুর) মেজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট সমর্থন করে। উপরন্তু ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের পর ডাকাত ও লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেরত দানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির ফলে,নতুন জমিদার শ্রেণীর কর্মকাণ্ডে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ইংরেজ মেজিস্ট্রেট ও

---

২২৪ দ্রষ্টব্য, N.K. sinha : Economic History of Bengal, From plassey to permanent, Setelment, 1956, খণ্ড-১, পৃ. ৪।
২২৫ দ্রষ্টব্য, Calcutta Review, vol. 1, 1844 খ্রি. পৃ. ১৯৩।
২২৬ ঐ, পৃ. ১৮৯ থেকে।
২২৭ ঐ।
২২৮ দ্রষ্টব্য, Calcutta Review, vol. 1, 1844 পৃ. ২১৫-১৬।
২২৯ ঐ পৃ. ১৯৩।
২৩০ ঐ পৃ. ১৯৪।

বিচারকগণ স্থানীয় আইন বিষয়ক কর্মকর্তা পুলিশ ও করণিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ফলে তাদের পক্ষে ন্যায়-অন্যায় অনুধাবণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে জমিদারগণ উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে টেনে নিত।

জমিদারগণের ধূর্ত কর্মকাণ্ডের ফলে প্রায়শই মেজিস্ট্রেটগণ জমিদারদের হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করত।[২৩১] ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় যে, ফরিদপুরের জমিদারগণ মুসলিম কৃষক শ্রেণীর ধর্ম এবং তাদের নারী সমাজকেও হেয় করেছে।[২৩২] একজন ইংরেজ কর্মকর্তা যে পদ্ধতির মাধ্যমে সনাতন ভূমিনির্ভর অভিজাত শ্রেণীকে নতুন শ্রেণী দ্বারা স্থানচ্যুত করা হয়েছে তাকে "ছদ্মবেশী বিপ্লব বলেছেন"। নতুন শ্রেণীতে ছিল কিছু দুষ্কৃতকারী ভাগ্যান্বেষী;যাদের অত্যাচারী হাত সামাজিক কানুনকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে এবং পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক নমনীয়তাকে অস্বীকার করে, কৃষক শ্রেণীকে অরক্ষিত করেছে।[২৩৩] ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পুলিশ প্রধান লিখেছেন যে, জমিদারদের বহু কর্মকাণ্ড রয়েছে যা তাদের খারাপ আচরণের উদাহরণ হতে পারে। পুলিশের কাছে সর্বদা নির্দোষ থাকার প্রবণতা থাকায়, জমিদারগণ প্রায়শই অপরাধ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করত।[২৩৪]

অপর একজন ইংরেজ কর্মকর্তা মন্তব্য করেন যে, জমিদার শ্রেণীকে "সম্পূর্ণ নির্দোষ" হিসাবে প্রশাসন বিবেচনা করায়, আইনকে উপেক্ষা করা হয়। অন্যদিকে এই শ্রেণীকে দেয়া হয় অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, যার দ্বারা জমিদারগণ অপরাধকে বহুগুণে উস্কে দিয়েছিল।[২৩৫] সুতরাং এটা আশ্চর্যজনক কিছু নয় যে, উনিশ শতকের প্রথমাংশে গ্রামীণ বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অরাজকতাপূর্ণ। একজন ইংরেজ উক্ত অবস্থাকে ফ্রান্সের বিপ্লবোত্তর সময়ে রবোসপিয়ারের শাসনকালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে,[২৩৬] বাংলার প্রতিটি জেলার জমিদারগণ একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল,যা ফরাসী বিপ্লবের রোবসপিয়ারের যুগের সঙ্গে বেশী পার্থক্য সৃষ্টি করে না। এগুলোর ভিত্তি ছিল একই ধরনের। মিথ্যাসাক্ষী প্রদানের মাধ্যমে বিচার কার্যপরিচালনার ফলে, প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব ছিল না, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জনগণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অনেক প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। প্রথমত নতুন জমিদার শ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা হস্তান্তর করা হয়,যা পূর্ববর্তীতে রায়ত বা সরকারের ছিল। উপরন্তু এই শ্রেণীকেই খাজনা ধার্যকারীর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এর ফলে অবাস্তবোচিত হারে খাজনা ধার্য করার ঘটনা ঘটে।[২৩৭] অপরদিকে জমিদারগণ তাদের জমিদারীতে কর আদায়ের ঠিকাদারী প্রদান করে 'পত্তনীদার' সৃষ্টি করে।

---

২৩১ ঐ, খণ্ড-১, ১৮৪৪, পৃ. ১৮৯ থেকে এবং ১৯৪ থেকে;
২৩২ গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।
২৩৩ দ্রষ্টব্য, Calcutta Review, খণ্ড-১, ১৮৪৪ পৃ. ১৯৬।
২৩৪ Calcutta Review, খণ্ড-১, ১৮৪৪ পৃ. ২১৫-২১৬।
২৩৫ ঐ, পৃ. ১৯৬।
২৩৬ ঐ
২৩৭ Mallick, British policy প্রাগুক্ত পৃ. ৫২

পত্তনীদারগণ সরকারি পাওনাসহ সর্বোচ্চ লাভ প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। একই শর্তে পত্তনীদারগণ সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করে এক শ্রেণীর অধস্তন পত্তনীদার তৈরি করে। এদেরকে 'দরপত্তনীদার'বলা হতো। 'দরপত্তনীদারগণও একই শর্তে চুক্তিবদ্ধ থাকে। এর ফলে একই ব্যবস্থায় শোষণের মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং কৃষক শ্রেণীর উপর মারাত্মক আঘাত নেমে আসে।[২৩৮] ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব বোর্ডের প্রধান হাগস্টক একটি মামলার কথা উল্লেখ করেন। যে মামলায় দেখা যায় যে,প্রকৃত জমিদার রায়ত থেকে চার ধাপ দূরে অবস্থান করছে। পত্তনীদার এবং দরপত্তনীদারগণ এই দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। এরা প্রত্যেকেই মুনাফা অর্জন করে যা রায়তদের আয় থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল।[২৩৯] বুকানন লক্ষ্য করেন যে জমিদার বা তাঁর অনুচরগণ বল প্রয়োগের মাধ্যমে খাজনা আদায় করত এবং ভূয়া রশিদ প্রদান করত। রায়ত শ্রেণী অশিক্ষিত হওয়ায় পত্তনীদার বা জমিদার শ্রেণী সহজেই এদেরকে প্রতারণা করতে পারত।[২৪০] হাগস্টকের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংবাদ,সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। এই ধরনের সংবাদে দেখা যায় যে সকল জমিদারীতেই পাঁচটি ধাপে 'পত্তনীদার' রয়েছে।[২৪১]

দ্বিতীয়ত, মেটকাফ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে একটি অত্যাচারের হাতিয়াররূপে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে দেশের ভূ-সম্পত্তি যাঁদের কাছে থাকার কথা ছিল তা না রেখে এই সম্পত্তি একদল 'বাবু' বা হিন্দু ভদ্রলোককে দেয়া হয়েছে। উক্ত 'বাবু' শ্রেণী উৎকোচ বা দুর্নীতির মাধ্যমে বিত্তশালী হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। মেটকাফের মতে লর্ড কর্নওয়ালিশ জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরজনক ছিলেন। দেশের হাজার হাজার ভূমি মালিককে ধ্বংস করে এক একজন জমিদার সৃষ্টি করা হয়েছে।[২৪২] এই প্রক্রিয়ায় অনেক রায়ত এবং জমির আংশিক মালিকগণ জমির উপর তাদের অধিকার হারায়। এটা সম্ভব ছিল, কেননা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোনো জরিপ করা হয়নি। এর ফলে জমির উপর মালিকানার বিষয়টি বিবেচনা হয়নি এবং জমিদারীর সীমানা সম্পর্কেও কোন খোঁজ নেয়া হয়নি।[২৪৩] সুতরাং একজন ইংরেজ কর্মকর্তা ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে গ্রামীণ বাংলার অবস্থা যথার্থই উপলব্ধি করেছেন।

তাঁর ভাষায় কৃষক শ্রেণী অমানবিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত সীমায় অবস্থান করছিল। তাদের দুর্দশার পটভূমি ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমি নীতি। এর ফলে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিনষ্ট হয়েছিল। এই বিষয়টি যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট। উক্ত কর্মকর্তার

---

২৩৮ ঐ পৃ. ৫১-৫২।

২৩৯ ঐ পৃ. ৫২।

২৪০ দ্রষ্টব্য, M.Martin : The History, Antiquities Topography and Statistics of Eastern India, London, ১৮৩৮ খ্রি. খণ্ড-২, পৃ. ৯০৯।

২৪১ দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত : সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, কলিকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ খণ্ড ৩, পৃ. ২৯৮।

২৪২ দ্রষ্টব্য, J.W.kaye : Selections From the papers of Lord Metcalfe, London.1855 পৃ. ২৫৪।

২৪৩ Mallick. British policy. পৃ. ৩৩।

মতে কৃষক শ্রেণীর দুর্দশার প্রধান কারণ ছিল ভূমিনির্ভর অভিজাত শ্রেণীর বিকল্প হিসেবে ভাগ্যান্বেষী একটি শ্রেণী সৃষ্টি।[২৪৪]

তৃতীয়ত বিচার ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল অনুপযুক্ত। এই ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর কোন সুবিচার পাওয়ার উপায় ছিল না। বৃটিশ প্রবর্তিত জটিল দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় মামলা অনুসরণ করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। জমিদার ও তাদের অনুচরদের পক্ষে দুর্নীতি ও উৎকোচের মাধ্যমে সেই ধরনের বিচার ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলা সম্ভব ছিল।[২৪৫] এক সময়ে হেস্টিংসের নিকট প্রচুর অভিযোগকারী ভীড় জমায়। এতে তাঁর লজ্জিত হওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না।

কারণ বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় অভিযোগ অনুসারে নির্যাতনের বিচার করার কোন নির্দিষ্ট আইন ছিল না।[২৪৬] ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে গোলাম হোসেন খান বলেন যে জমিদারগণ তাঁদের চাকর, সমর্থক,প্রতিপাল্য,গুপ্তচর এবং অনুচরদেরকে সরকারি প্রশাসনে নিয়োগদানে সফল হয়। এর ফলে এদের ছত্রছায়ায় জমিদারগণ নিরাপদে নির্যাতন চালাতে সমর্থ হয়।[২৪৭] ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা-জালালপুরের মেজিস্ট্রেট অভিযোগ করেন যে, জমিদারগণ ডাকাতদেরকে আশ্রয় বা গোপনে রক্ষা করছে। জমিদারের অনুচরগণ ডাকাতদের প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর সরবরাহ করে থাকে, যাতে মেজিস্ট্রেট তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিতে পারে।[২৪৮] ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পুলিশ প্রধান এই মর্মে পুলিশকে অভিযুক্ত করেন যে, এরা জমিদারদের সঙ্গে যোগসাজসে জড়িয়ে পড়েছে।[২৪৯] উপরোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে এটা বলা যায় যে, রায়তদের পক্ষে জমিদারদের বিরুদ্ধে কোন সুবিচার পাওয়া সম্ভব ছিল না।

বাংলা অঞ্চলে নীল শিল্প

বেশ পূর্বকাল থেকেই বাংলায় নীলচাষ হতো। সপ্তদশ শতক থেকেই এখান থেকে নীল ইউরোপে রফতানী শুরু হয়।[২৫০] অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নীলচাষ ইউরোপীয় পুঁজি মালিকদের আকর্ষণ করে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার রুপদিয়াতে মি.বন্ড নামের একজন ব্যবসায়ী নীলকুঠি স্থাপন করেন।[২৫১] পরের বছর মি.টাফ্‌ট সরকার থেকে অনুমতি নিয়ে এই জেলার মাহমুদশাহীতে নীলকুঠি স্থাপন করেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মি.ট্যাইলর কয়েকটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। এরপর ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্জন ডা: এন্ডারসন যশোর জেলার নীলগঞ্জ এবং বারান্দিতে দুটি বড় নীলকুঠি স্থাপন করেন।

---

২৪৪ Calcutta Review vol. i 1844 A.D. পৃ. ১৮৯ থেকে।
২৪৫ Mallick : British policy পৃ. ৫৩।
২৪৬ ঐ।
২৪৭ দ্রষ্টব্য, সিয়ার আল মুতাখেখরিন (রেমন্ডের ইংরেজি অনুবাদ) পূর্বোক্ত খণ্ড-৩ পৃ. ১৭৫।
২৪৮ দেখুন, JPHS. খণ্ড-৭, অংশ-১, পৃ. ৩৩।
২৪৯ গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় দেখুন।
২৫০ দ্রষ্টব্য, Mallick. British policy. পৃ. ৫৩, পাদটীকা ৩।
২৫১ L.S.S.O. Malley : Bengal District gazetteers. Jessore. কলিকাতা, ১৯১২ পৃ. ৪০।

সরকারি উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, নীলকুঠি ছিল নদীয়ার স্থানীয় একটি শিল্প। বড় বড় নীলকুঠিগুলো স্থানীয় ছোট ফ্যাক্টরিগুলো থেকে গড়ে উঠে। ইউরোপীয়নগণ এই ছোট ফ্যাক্টরিগুলো ক্রয় করে বড় ফ্যাক্টরিতে রুপান্তরিত করে।[২৫২] ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও বিহার থেকে ৬৪,০০০ পাউন্ড নীল উৎপাদিত হয়। এর দ্বারা প্রমান হয় যে,নীলচাষ ব্যাপকভাবে হয়েছিল এবং এটা রফতানিযোগ্য এবং বেশ লাভজনক পণ্য ছিল।[২৫৩] ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই যশোর জেলা নীল কুঠিতে ছেয়ে যায়।[২৫৪] ক্রমান্বয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলা বিশেষ করে নীল চাষের জেলা হিসাবে পরিচিত ফরিদপুর, ঢাকা,যশোর,রাজশাহী,নদীয়া এবং মুর্শীদাবাদ ইংরেজ পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত হয়।[২৫৫] ইংরেজদের পুঁজি বিনিয়োগের ফলে গ্রামীণ বাংলার নীল চাষ বিস্তার লাভ করে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও বিহারের নীল উৎপাদন ১৮০৫[২৫৬] খ্রিস্টাব্দের উৎপাদনের দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ নীল উৎপাদন ১,২৯,৬১০ পাউন্ড দাঁড়ায়। স্বাভাবিক কারণেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নীল শিল্প বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল।[২৫৭]

সুতরাং রাজস্ব পাওয়ার নীতি এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত,কলিকাতার ব্যবসায়ী মহলকে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। এর ফলে বাংলা গ্রামীণ অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার সৃষ্টি করে এবং ভূমির মালিকানা বদল হয়,কিন্তু পুঁজির মালিকগণ শিল্পপতি হিসেবে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে মুনাফা অধ্যায়ের সূচনা করে। তবে নীলকরদের মুনাফার বিষয়টি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। স্থানীয় জনগণের ও গ্রামীণ জীবনের উপর নীলকরদের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল সীমিত থাকবে। সুতরাং তিনটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। এইগুলো হল (১) গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নীলকরদের মর্যাদা (২) নীল চাষের ধরন (৩) নীল চাষ কৃষক শ্রেণীর জন্য কতটুকু লাভজনক ছিল তা নিরূপণ করা।

(১) নীলকরদের মর্যাদা

একটি ফ্যাক্টরি স্থাপনের পর দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (ক) সরকারের কাছে লাইসেন্সের জন্য আবেদন (২) জমির জন্য আবেদন।[২৫৮] কিন্তু নীলকরগণ ফ্যাক্টরির জন্য যতোটুকু জমির প্রয়োজন ছিল তাঁর চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে জমি হুকুম দখল করত। কিন্তু যখনই একজন নীলকর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতো তখনই জমিদারদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ দেখা দিত। ক্রমাগত প্রভাব বিস্তারে শংকিত হয়ে জমিদারগণ নীল করদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করে। এই স্বার্থের দ্বন্দ্বে নীলকরদের সঙ্গে জমিদার শ্রেণীর প্রায়ই সহিংস সংঘর্ষ হয়। সরকারি সূত্রমতে নীলকরগণ এই ধরনের পরিস্থিতি

---

২৫২ J.H.E.Garret : Bengal District Gezetteers. Nadia, কলিকাতা, ১৯১০ পৃ. ৩২।
২৫৩ দ্রষ্টব্য, Mallick. British policy, পূর্বোক্ত পৃ. ৫৩।
২৫৪ L.S.S.O. Melley : Bengal District Gezetteers. Jessore. পূর্বোক্ত পৃ. ৪০।
২৫৫ দেখুন, J.H.E.Garret. Bengal District Gazetteers. Nadia. পূর্বোক্ত পৃ. ৩২।
২৫৬ দ্রষ্টব্য, Mellick. British policy, পৃ. ৫৩।
২৫৭ J.H.E.Garret : Bengal District Gazeetteers. Nadia. পূর্বোক্ত পৃ: ৩২।
২৫৮ L.S.S.O.Malley : Bengal District Garetteers. Jassore, পূর্বোক্ত পৃ. ৪০।

শক্ত হাতে মোকাবেলা করত এবং লাঠিয়াল দ্বারা জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো।[২৫৯] গারেট লিখেছেন যে, নীলকরগণ সহিংসতায় যাওয়ার পেছনে একটি কারণ কাজ করেছিল। আদালত থেকে সুবিচার পেতে ব্যর্থ হওয়ার[২৬০] কারণেই নীলকর শ্রেণী চরমপথ বেছে নেয়। ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও আদালত নীল করদের পক্ষ নেয়নি। এতে ধারণা করা যায় যে,নীলকরগণ ভুল পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

এই বিরোধের ফলে নীলকরগণ জমি ক্রয় করতে বাধ্য হয়। ফ্যাক্টরির চারপাশের জমিসমূহ চড়াদামে হলেও ক্রয় করে এবং কৃষকদেরকে নীল চাষ করার জন্য জমি দেয়। এইভাবে জমিদারদের বিরক্তি ও বিরোধিতা থেকে নীলকরগণ মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। এই রূপে নীল চাষের উদ্দেশ্যে নীলকরগণ ফ্যাক্টরির চার পাশের জমির মালিক অথবা পত্তনদার হওয়ার সুযোগ পায়। ও ম্যালি দ্বিধা না করেই বলেছেন যে, একটি জেলায় নীল চাষ সম্পর্কে এর ম্যানেজারই ছিল প্রধান নিরামক।[২৬১] নীলকরগণ জমিদার শ্রেণীর মতোই আচরণ করত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ার জজ কর্তৃক তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগে বলা হয় যে নীলকরগণ কৃষকদের উপর অবৈধ করারোপ করেছে। তা ছাড়া শ্রমিক,মাঝি এবং গাড়ী চালকদেরকে এরা অল্প মজুরি প্রদান করত।[২৬২] সুতরাং শিল্পপতি হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে একজন নীলকর বিনিয়োগ করলেও পরবর্তীতে জমিদাররের চরিত্র অর্জন করে।

(২) নীলচাষের প্রকৃতি

নীল শিল্পের শুরুর দিকে ইউরোপীয়দের হাতে নীলচাষ করার মতো জমি ছিল না। তাই নীলকরগণ সাধারণত কৃষকদের সঙ্গে একটি চুক্তি করত। গ্রামের মোড়লের মাধ্যমে সম্পাদিত এই চুক্তি অনুযায়ী কৃষক তার জমির একাংশে নীল চাষ করত। নির্বাচিত রায়তদের হাতে নির্দিষ্ট জমিতে নীল চাষ করার জন্য নীলকরগণ অক্টোবর মাসে বীজ পৌঁছে দিত।[২৬৩] ও ম্যালি মনে করেন যে,নীলচাষের জন্য নির্দিষ্ট জমিগুলোতে সাধারণত ধান ভাল জন্মাত না। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে,ও ম্যালির মতটি বাস্তবোচিত ছিল না।

(৩) তিনি বলেন যে, নীল ও ধান চাষ করার মাধ্যমে একজন কৃষক দুটি ফসল উৎপাদনের সুবিধা পেত।[২৬৪] যে কোনো ফসল উৎপাদনের চেয়ে নীল চাষ ছিল সহজতর এবং কম শ্রমসাধ্য। নীল গাছ কাটার পর এইগুলোকে আঁটি বাঁধা হতো এবং কৃষক ফ্যাক্টরিতে বহন করে নিয়ে যেত। এক বিঘা জমিতে নীল উৎপাদন ভাল হলে ৬ আঁটি নীল গাছ হতো। প্রতি আঁটি নীলের জন্য একজন রায়ত ৬ আনা বা আট ভাগের তিন টাকা পেত। সুতরাং একটি ভাল ফলনের জন্য একজন রায়ত বিঘা প্রতি

---

২৫৯ J.H.E.Garret : Bengal District Garetteers. Nadia, পূর্বোক্ত পৃ. ৩২।
২৬০ ঐ, পৃ. ৩২-৩৩।
২৬১ দ্রষ্টব্য, L.S.S.O.Malley : Bengal District Garetteers. Jessore, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৩।
২৬২ Selections From the Records of the Govemment of Bengal, No. xxxiii, part. i, papers related to Indigo cultivation in Bengal, calcutta, 1866 পৃ. ৪।
২৬৩ দ্রষ্টব্য L.S.S.O. Malley : Bengal District Gazetteers. Jessore, পূর্বোক্ত পৃ. ১০৪
২৬৪ ঐ।

মাত্র আড়াই টাকা অর্জন করত।[২৬৫] ও ম্যালি মনে করেন যে, উনিশ শতকের প্রথম দিকে উক্ত অর্থ বেশ ভাল একটি উপার্জন, যদিও উক্ত সময়ের শেষের দিকে তা ছিল মারাত্মকভাবে কম। কারণ একটি ভাল মওসুমে নীলের পরিবর্তে বিঘা প্রতি যে ধান উৎপন্ন হতো তার মূল্য ছিল ১৬ থেকে বিশ টাকা।[২৬৬]

(৪) উপরোক্ত হিসাবে ইংরেজ লেখকগণ মনে করেন যে, প্রথম দিকে আর্থিক সুবিধা মোটামুটি থাকার কারণে কৃষকগণ নীল চাষে অনুৎসাহী ছিল না। কিন্তু পরের দিকে অন্যান্য ফসল বিশেষ করে ধান চাষের আয় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় এবং কৃষি মজুরি বেড়ে যাওয়ায় কৃষকেরা নীলচাষ বিরোধী হয়ে পড়ে। নীল চাষের বিনিময়ে নীলকরগণ যে অর্থ প্রদান করত তা স্থির থাকে, যদিও কৃষকেরা জমিতে পূর্ববৎ নিয়মে নীলচাষ করত।[২৬৭] উপরোক্ত তথ্যাদি দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে,১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ধানের বদলে নীল চাষ করার কারণে একজন রায়ত ৭ গুণ কম অর্থ পেত।

(৫) নীল শিল্প এবং কৃষক শ্রেণী

ডাইরেক্টর অব সার্ভে মি:গ্যাসট্রেল (১৮৫৬-১৮৬২) উল্লেখ করেন যে যশোর এবং ফরিদপুরে বহু সংখ্যক নীল কুঠি এবং চিনিকল স্থাপিত হওয়ায় এই অঞ্চলে সভ্যতার হাওয়া বইতে শুরু করে।[২৬৮] ও ম্যালি ও গ্যারেট এর মতে যশোর এবং নদীয়া জেলা ১৯১১[২৬৯] সালের দিকে নীলকুঠিতে ছেয়ে যায়। গ্রাম বাংলায় বৃহদাকার শিল্প স্থাপন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপনের ফলে নতুন চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রথমত এই সুযোগসমূহে গ্রামবাসীরা নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখে,দ্বিতীয়ত ফ্যাক্টরিসমূহের ম্যানেজার এবং কর্মচারীগণ গ্রামে বাস করায় গ্রামের দোকানীরা লাভবান হয়। সেই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদকগণও সুবিধা অর্জন করে।

(৬) তৃতীয়ত গ্রামীণ সমাজে বহু সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন নীলকুঠির ম্যানেজার, সাব-ম্যানেজার, করণিকের উপস্থিতির ফলে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং নীল শিল্প গ্রাম বাংলার জীবন যাত্রার মানই শুধু বাড়ায়নি সেই সাথে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতিও সাধিত করে। কিন্তু ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তদন্ত কমিশন দেখে যে,নীল চাষ কৃষক শ্রেণীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাকেরগঞ্জের একজন জজ বলেন যে,সাধারণভাবে নীল চাষ সুবিধাজনক হলেও "আমি নিঃসন্দেহ যে এর দ্বারা নীলকর, কৃষক ও অন্যান্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" নীল একটি মূল্যবান বাণিজ্যিক দ্রব্য হলেও কৃষকদের স্বার্থের জন্যে হলেও এই অঞ্চলে নীল চাষ বিলুপ্ত করা হোক। নদীয়া জেলার জজ বলেন যে,ইউরোপীর পুঁজির সুবিধা পরিমাপ না করে কৃষকদের উপর এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে বিবেচনা করা প্রয়োজন।[২৭০] মন্তব্যটি ভালভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

---

২৬৫ L.S.S.O. Malley : Bengal District Gazetteers. Jessore, পূর্বোক্ত পৃ. ১০৪।
২৬৬ ঐ।
২৬৭ L.S.S.O.Malley, Bengal District Gazetteers. Faridpur, পূর্বোক্ত পৃ. ৩০।
২৬৮ দেখুন, Bengal District Gazetteers. Jessore. পূর্বোক্ত পৃ. ৪০ এবং নদীয়া পৃ. ৩২।
২৬৯ Selections From the Records of the Govermment of Bengal, No. xxxiii, part-I. Papers related to Indigo Bengal Calcutta, 1860 পৃ. ৬৮-৬৯।
২৭০ ঐ, পৃ. ১।

প্রথমত এখানে উল্লেখ্য যে, একজন নীলকর কুঠি স্থাপন করার জন্য প্রথমে সরকারের কাছে লাইসেন্স এবং জমি বরাদ্দের আবেদন করত। প্রথম দিকে নীল কুঠির অধীনে কোনো বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে জানা যায় না। নীলকুঠি স্থাপনের পরই বিভিন্ন গ্রামে নীলকরদের সঙ্গে নীল চাষ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হতো। বিশেষ করে অপর নীল কুঠির সন্নিহীত জমি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হতো।[২৭১] এমন কি ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের দিকেও এই বিষয়ে নীলকরদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে।[২৭২] অবশেষে সরকারিভাবে বিভিন্ন নীল কুঠির সীমানা নিদিষ্ট করে দেয়া হয় এবং যদি কেউ নিদিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হতো। সুতরাং একটি সময়ের মধ্যে প্রতিটি নীলকুঠি নিদিষ্ট সীমানার জমি অর্জন করে এবং এই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নীলচাষ করার অধিকার লাভ করে।

দ্বিতীয়ত নীলকরদের সুবিধাজনক অবস্থান এবং ইংরেজ হওয়ার কারণে তাদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। এর ফলে নীলকরগণ রায়তদেরকে নীলচাষে বাধ্য করত। রায়তদের অনিচ্ছা থাকলেও নীলচাষ করা ছাড়া অন্যকোন উপায় তাদের ছিল না। সমসাময়িক একটি পত্রিকা লিখে যে রায়তগণ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নীলচাষের বিরোধী ছিল। নীলকরদের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি মূলে রায়তগণ নীলচাষে বাধ্য থাকায় রায়তগণ এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিল।[২৭৩] পত্রিকার তথ্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর ধারা ইংরেজ লেখকদের ধারণাটি ভুল প্রমাণিত করা যায়।

তাদের মতে ধান চাষ লাভজনক হওয়ায় রায়তগণ নীলচাষের বিরোধিতা করেছিল।[২৭৪] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শুরুতে নীল চাষ সাধারণভাবে করা হতো। নীলের বীজ বিনামূল্যে প্রদান করার ব্যবস্থা ছিল। রায়ত সেই বীজ তাঁর জমিতে বপন করত। এরপর নীল কাস্তে দ্বারা কাটার উপযোগী হওয়ার পর তা কেটে আঁটি বাঁধা হতো। অতঃপর আঁটিগুলো নীল কুঠিতে সরবরাহ করে রায়ত তাঁর প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করত।[২৭৫] কিন্তু জমি নিদিষ্ট করে দিত নীলকর, এই বিষয়ে রায়তদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং রায়ত তাঁর জমিতে নীল চাষে বাধ্য থাকত ধান অনেক কম দামে বিক্রি হতো বলে নীল চাষ ছিল লাভজনক। ১৮২০-এর দশকে নীলকর এবং রায়তদের মধ্যে আদান প্রদানের বিষয়ে পরিবর্তন আসে। এই সময়ে রায়তদেরকে দাদন (অগ্রিম অর্থ) দেয়ার ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই ছিল। ফলে নীলকরদের সঙ্গে রায়তদের চুক্তির ধরন বদলে যায়।

চুক্তির শর্তে দেখা যায় যে,রায়ত আগের মতই নীলের বীজ গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে দাদন হিসাবে বিঘা প্রতি দুই টাকা নীলকর থেকে পায়। নীলের আঁটি পৌছিয়ে

---

২৭১ দ্রষ্টব্য, J.H.E.Garrett : Bengal District Gazetteers Nadia, পূর্বোক্ত পৃ ৩২।

২৭২ দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত : সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, পূর্বোক্ত ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪।

২৭৩ সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮ মে, ১৮২২ খ্রি. উদ্বৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, খণ্ড-১, পৃ. ১০৮-১০৯।

২৭৪ গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।

২৭৫ ঐ।

দেয়ার পর অবশিষ্ট চার আনা দেয়া হতো।[২৭৬] ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখে যে, রায়তেরা অগ্রিম টাকা এবং নীল চাষ করতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী রায়তগণ দাদন গ্রহণ ও নীল চাষ করতে বাধ্য ছিল।[২৭৭] ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ১ টাকায় ৪ মন ধান পাওয়া যেত।[২৭৮] নীল চাষের জন্য প্রাপ্ত ২ টাকা চার আনা বেশ ভাল অংকের অর্থ। সুতরাং ইংরেজ লেখকদের মত অনুযায়ী চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রায়তগণ নীল চাষে অনীহা প্রদর্শন করেছিল, এই ধরনের মতামত গ্রহণ করা যায় না।

তৃতীয়ত আইনগত দিক থেকে একটি চুক্তিতে উভয় দলই স্বাধীনভাবে পছন্দ অপছন্দ করতে পারে। কিন্তু রায়ত শ্রেণীর জমি সংক্রান্ত বিষয়ে বা নীল বপনের ক্ষেত্রে কোন মতামত দেয়ার অধিকার ছিল না। সুতরাং নীলচাষ সবসময়ই বল প্রয়োগের মাধ্যমে করা হোত। নদীয়ার জজ এ স্কোঞ্চ (Sconce) ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বলেছেন যে, রায়ত শ্রেণী জমিতে পশুর মতোই শ্রম দিয়ে থাকে। এরা আর্থিক সুবিধা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি।[২৭৯] নদীয়া বিভাগের অফিসিয়েটিং কমিশনার এ. গ্রোট (Grot) বলেন যে, রায়ত এবং নীলকরদের মধ্যে যে,'বিরোধ' সৃষ্টি হয়েছে তা মূলত নীল চাষের ক্ষেত্রে,জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাই দায়ী। এটা সর্বজন বিধিত যে, রায়তদের কাছে নীল চাষ কোনো আগ্রহের ফসল নয়। স্বেচ্ছায় কোনো রায়ত দাদন গ্রহণ করা ব্যতীত রায়ত ধান অথবা অন্যান্য ফসল উৎপাদনেই বেশী আগ্রহী ছিল।[২৮০]

চতুর্থত ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে যশোরের জেলা মেজিস্ট্রেট মি.জে ডানবার মন্তব্য করেন যে, নীলকরগণ সবসময়ই উত্তম জমিতে নীল চাষ করার জন্য রায়তদেরকে চাপ দিত। কিন্তু নীলের আঁটি কুঠিতে পোঁছানোর পর অর্থ প্রদান করত বেশ কম।[২৮১]

পঞ্চমত এ, স্কোঞ্চ (Sconce) বলেন যে, নদীয়ার নীলকরগণ সাধারণত রায়তের আড়াই বিঘা জমিকে এক বিঘা পরিমাপ করত এবং নীল উৎপাদনের পর দুটি আঁটিকে একটি আঁটি হিসেবে গ্রহণ করত।[২৮২] নাটোরের ডেপুটি মেজিস্ট্রেট গোপাল লাল মিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে, নীলকরদের এজেন্টগণ দেড় বিঘা জমিকে ১ বিঘা হিসাবে পরিমাপ করত এবং ছয় আঁটি নীলকে ফ্যাক্টরি মানের দুটি আঁটি হিসাবে গ্রহণ করা হতো।[২৮৩]

---

২৭৬ দেখুন, Selections From the Records of The Government of Bengal, No. xxxii, Part-1, papers related to Indigo Cultivation in Bengal, Calcutta, 1860 পৃ. ১১১০-১১১।

২৭৭ দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, খণ্ড-১, পৃ. ১০৮-০৯.

২৭৮ ঐ, খণ্ড-৩, পৃ. ২৯৭।

২৭৯ Selections From the Records of the Government of Bengal, No. xxxiii, part-I : papars related to Indigo cultivation in Bengal, পূর্বোক্ত পৃ. ৪।

২৮০ ঐ, পৃ. ৯৩।

২৮১ ঐ, পৃ. ১৫।

২৮২ ঐ, পৃ. ৩।

২৮৩ Selections From the Records of the Govermment of Bengal, No. xxxiii, part-1 papers related to Indigo Cultivation in Bengal, পূর্বোক্ত পৃ. ১১০-১১১।

ষষ্ঠত গোপাল লাল মিত্র (১৮৫৬ খ্রি.) আরও বলেন যে, বর্তমান দাদনী ব্যবস্থায় কৃষকগণ নীল চাষে অনিচ্ছুক ছিল। প্রতি বিঘার জন্য দুই টাকা দাদন দেয়া হতো। কিছু গোমস্তা,আমিন ও নির্যাতনকারীগণ অগ্রিম টাকায় ভাগ বসাত। এরা রায়তদের আর্থিক ক্ষতির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করত।[২৮৪] জজ এ. স্কোঞ্চ (Sconce) বলেন যে এটা সর্বজন বিদিত যে একজন রায়ত এর ফলে দাদনে প্রাপ্ত টাকার অর্ধেকের বেশী,দুই-তৃতীয়াংশ বা এর কম টাকা পেত।[২৮৫] তিনি আরও বলেন যে, আমি নিশ্চিত নই যে,দাদনের টাকার কত অংশ অগ্রিম অথবা কত অংশ পূর্বের বছরের পাওনা। তিনি লক্ষ্য করেন যে একটি ঘটনায় একজন রায়ত আট আনা নগদ গ্রহণ করে এবং সাড়ে ছয় টাকা পূর্বের পাওনা হিসেবে সমন্বয় করা হয়। উক্ত রায়ত সাড়ে তিন বিঘা জমিতে নীল চাষ করেছিল।[২৮৬] জজ মি.স্টিয়ার মন্তব্য করেন যে, যে কোনো সৎ নীলকর স্বীকার করবেন যে, রায়ত তখনই দাদন গ্রহণ করে যখন তাঁর কোনো উপায় থাকে না এবং কেউ একবার নীল করের খাতায় নাম উঠালে নীল চাষ থেকে আর অব্যাহতি পায় না। নীলকর এবং মহাজন একই কায়দায় কাজ করে থাকে। উভয় শ্রেণী রায়তদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় এবং সুদের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে।[২৮৭] উপরন্ত যদি পিতার ঋণ (মৃত্যু বা পালিয়ে থাকার কারণে) পুত্রের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে যায় তাহলে 'ঋণগ্রস্ত' হওয়ার কারণে নীলকরদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমা হতে থাকে।[২৮৮]

সপ্তমত ১৮২২ সালের দিকে স্থানীয় পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' নীলকরদেরকে অভিযুক্ত করে। পত্রিকাটি রায়তদেরকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করা এবং দাদন গ্রহণ করতে বাধ্য করার সংবাদ দেয়। এর ফলে যে সকল রায়ত দাদন গ্রহণ করেছে এরা আমৃত্যু নীলকরদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। উপরন্ত নীলকরদের কাছে দায়বদ্ধ থাকার কারণে রায়তগণ তাদের জমিতে অন্যকোন ফসল বুনতে পারত না। এতে প্রায়শই রায়তগণ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত।[২৮৯] ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে যশোরের মেজিস্ট্রেট রিপোর্ট করেন যে,খুলনার নীলকর মি.রেইলী রায়তদেরকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেন। এই গ্রামে তাঁর নীল কুঠি ছিল।[২৯০] ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত স্থানীয় পত্রিকাটি লিখে যে,যদি কোন রায়ত দাদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করত তাহলে নীলকর, রায়তের হাল চাষের বলদ নীল কুঠিতে আটক করে রাখত। কুঠিতে আটকাবস্থায় বলদগুলোকে ঘাস অথবা পানি খেতে না দেয়ার কারণে এগুলো ক্রমান্বয়ে রোগা এবং দুর্বল হতে থাকে। এই অবস্থায় রায়ত তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এবং তাঁর মূল্যবান বলদগুলো উদ্ধার করার জন্য দাদন গ্রহণ করে।[২৯১] ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রায়তগণ অভিযোগ করে যে, তাদেরকে নীল চাষ করার জন্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভয় দেখানো হয়। এ

---

২৮৪ ঐ।

২৮৫ ঐ, পৃ. ৫১।

২৮৬ ঐ, পৃ. ৫২।

২৮৭ ঐ, পৃ. ৬৮।

২৮৮ J.H.E. Garrett, Bengal District Gazeetteers, Nadia, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩ থেকে

২৮৯ দ্রষ্টব্য, সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮ মে, ১৮২২, উদ্বৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সম্পাদিত : সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, কলিকাতা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, খণ্ড-১ পৃ. ১০৮-১০৯।

২৯০ Selections From the Records of the Government of Bengal, No. xxxiii, পূর্বোক্ত পৃ. ৫

২৯১ দ্রষ্টব্য, সমাচার চন্দ্রিকা, উদ্বৃত, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, পূর্বোক্ত খণ্ড-১, পৃ. ১০৮-১০৯

ছাড়া নীল চাষ না করে অন্যকোন ফসল চাষ করার সুযোগ দেয়া হয় না। প্রথমে নীলকরদের নিজস্ব জমিতে নীল চাষ করে রায়তদের জমিতে তা করতে হতো। চাষের বলদ সীমিত থাকার কারণে নীল চাষ করার পর অন্যকোন ফসল বপন করার অবকাশ ছিল না।[২৯২]

সুতরাং এটা নিশ্চিত যে নীল করদের ছাড়া রায়তগণ কখনও নীল চাষের মাধ্যমে লাভবান হতে পারেনি।[২৯৩] নীল চাষের দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী ব্যবস্থায় রায়ত শ্রেণী কখনও লাভবান হতে পারে না। এটা প্রমাণিত যে,ইংরেজ হিসেবে নীলকরগণ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় রায়তদের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। প্রথমত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের নীল কমিশন মন্তব্য করে যে,'অবচেতন মনেই ইংরেজ মেজিস্ট্রেটগণ' তাদের স্বদেশী নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করত।[২৯৪] দ্বিতীয়ত এশলী ইডেন প্রমাণ করেন যে,নীলকরগণ প্রায়শই উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে উৎকোচ প্রদান করত।[২৯৫]

তৃতীয়ত ড. এ.আর. মল্লিক উল্লেখ করেছেন যে, গ্রাম্য চৌকিদারের সামনে অত্যাচারের ঘটনা ঘটলেও বল প্রয়োগের দ্বারা তাকে দাবিয়ে রাখা হতো অথবা তাকে বন্দী করে রাখা হতো। উদহারণ হিসেবে গনি দফাদারের ঘটনা বলা যায়,একজন নীলকর একটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ায় সে প্রতিবাদ করেছিল। এই কারণে তাকে আক্রমন করে আহত করা হয় এবং চার মাস সময় ধরে একটি অন্ধকার কক্ষে আটক রাখা হয়। চতুর্থত ব্রিটিশ হিসেবে একজন নীলকর সুপ্রিম কোর্ট,কলিকাতার অধীনে থাকায় রায়তদের পক্ষে আইনের আশ্রয় নেয়া সম্ভব হতো না। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন অশিক্ষিত লোক হিসেবে একজন রায়ত কলিকাতায় এসে সুপ্রিম কোর্টে বিচার প্রার্থনা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং নীলকরগণ ছিল বাস্তবে আইনের উর্ধ্বে।[২৯৬] এমন কি বেশ পরের দিকে অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে জেম্‌স হোয়াইট নামের একজন নীলকর নদীয়াতে শেখ মুন্সিফ নামের করে রায়তকে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কলিকাতা হাই কোর্টের জুরী, মেজিস্ট্রেট এবং বিচারপতি পন্টি ফোসের পক্ষপাতিত্বের কারণে উক্ত নীলকর হত্যার অভিযোগ থেকে রেহাই পায়।[২৯৭]

সুতরাং এটা ধারণা করা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাই একজন কর্মকর্তা এই অবস্থাকে যথাযথভাবেই বিপ্লোবত্তর ফ্রান্সের রোবস্ পিয়ার যুগের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

উপসংহার ঃ উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে,১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী ব্রিটিশ রাজস্ব নীতি এবং ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে গ্রাম বাংলার বৃহদাকার নীল শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে কলিকাতা থেকে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ হয়। কিন্তু সকল প্রত্যাশার

২৯২ Selections From the Government of Bengal, No. xxxiii, part-1, papar related to Indigo Cultivation in Bengal, পূর্বোক্ত পৃ. ০৩।
২৯৩ ঐ, পৃ. ৬৮।
২৯৪ দ্রষ্টব্য, Mallick. British policy, পৃ. ৫৬।
২৯৫ ঐ।
২৯৬ ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬।
২৯৭ দেখুন, পরিশিষ্ট-১।

বিপরীত পদক্ষেপ হিসেবে পুঁজিপতিগণ তাদের মুনাফার কোন অংশ কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে ভোগ করেনি। এই সকল পুঁজিপতি নীলকরদের জন্য তাদের শ্রমদান করলেও অত্যাচার এবং নির্যাতনের ফলে কৃষক শ্রেণীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে খারাপ হয়ে পড়ে। একদিকে জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার এবং অন্যদিকে নীলকরদের শোষণের ফলে কৃষক শ্রেণীর অবস্থা চরমে পৌঁছে। তা সত্ত্বেও কৃষকদের ক্ষোভ বা অভিযোগ নিরসনে সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ক্রমাগত জমে থাকা ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ কৃষকদের মধ্যে অন্যরকম মানসিকতা গড়ে তোলে। ফলশ্রুতিতে সুযোগ পেলেই কৃষক শ্রেণী প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। শুধু উক্ত পটভূমিকে সামনে রেখেই কৃষকদের সঙ্গে জমিদার এবং নীলকরদের সহিংসতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। স্বল্প সময়ে তিতুমীরের চমকপ্রদ সাফল্য (১৮২৭-১৮৩১) এই ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। ২৪ পরগনা জেলার কৃষক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে হিন্দু জমিদার এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথমবারের মত প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। উক্ত দুই শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বও ছিল প্রথম বারের মতো অবিসংবাদিত। অন্যকথায় বলা যায় যে, এই প্রতিবাদ ছিল বাংলার কৃষক শ্রেণীর গণবিক্ষোভ যা অর্ধশতাব্দীর বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনকে আলোড়িত করেছিল। ১৮৩৮-১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জমিদার এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে ফরায়েযী কৃষকদের সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন দুদু মিঞা।

এ ছাড়া ১৮৫৪ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নীলকরদের বিরুদ্ধে ফরায়েযীদের সংগ্রাম অত্যাচার এবং নির্যাতনের ফলশ্রুতিতেই হয়েছিল। দলগত সংঘর্ষে তিতুমীর জমিদার এবং নীল করদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। জমিদার এবং নীলকরদের দল পরাজিত হলেও কূটনৈতিক শক্তিতে এরা সরকারের সহানুভূতি অর্জন করে। সরকারি হস্তক্ষেপে তিতুমীর এবং তাঁর দল সম্পর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। তিতুমীরের বিরোধীরা তাকে রাজনৈতিক ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তিনি সরকার বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হন।[২৯৮] জমিদার এবং নীলকরদের উপর দুদু মিঞার জয় কৌশলগত কারণে সম্ভব হয়েছিল বিধায় তাকে তিতুমীরের দশা প্রাপ্ত হতে হয়নি। দুদু মিয়া আইনগত এবং রাজনৈতিকভাবে যাতে ফাঁদে না পড়েন সেজন্যে তিনি কৌশলে সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। বাংলার কৃষক আন্দোলনের বৃহত্তর পটভূমিতে ফরায়েযী আন্দোলন ছিল হাজার হাজার কৃষকদের সংঘবদ্ধ' একটি আন্দোলন। ধর্মীয় এবং আদর্শিক কারণে কৃষক শ্রেণী নতুন অভিজাত জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল।

তিতুমীর এবং দুদু মিঞার ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে এই ধরনের নেতৃত্বই সময়ের চাহিদা ছিল। উপরন্তু তিতুমীর এবং দুদু মিঞার অনুসারীগণ ছিল সমাজের নীচুস্তরভুক্ত। এর ফলে সমাজের উচু শ্রেণী থেকে নয় বরং তাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরাই নেতৃত্বে আসে। সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলন যেমন মুসলিম সমাজকে শুদ্ধ করার জন্য শুরু হয়েছিল তেমনি এই আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজের নীচুস্তরভুক্ত জনগণের নেতৃত্বের প্রয়োজনে আর্থ-সামাজিক চরিত্র অর্জন করেছিল।

---

২৯৮ দেখুন, Muinuddin Ahmed Khan, The struggle of Titumir : a re-examinction, JASP, vol. iv, 1959, পৃ. ১১৩-৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

ফরায়েযী আন্দোলন

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.) ফরায়েযী আন্দোলনের রূপকার

প্রাথমিক জীবন : হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ৩৮ বছর বয়সে তিনি এই ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। এরপর থেকেই তিনি পরিচিতি পেতে শুরু করেন।

১। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। দেখুন "Tomb of Haji Shariatullah, JASP, Dhaka, vol. ৩, ১৯৫৮, পৃ. ১৯৫ এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন (এই অধ্যায়ের পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ) তিনি একটি ছোট তালুকদার[১] পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাই তিনি নিজেকে উচ্চশ্রেণীভুক্ত বা অভিজাত হিসেবে দাবি করেননি। সুতরাং এটা ধারণা করা যায় যে, তাঁর জীবন সম্পর্কিত তথ্যাদি পারিবারিক বংশলতিকায় লিপিবদ্ধ ছিল না। কারণ সাধারণ পরিবারগুলোতে বংশের কোনো ইতিহাস সংরক্ষিত হতো না। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর জীবনের বিভিন্ন তথ্যাদি গবেষকদের মাঝে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।[২] অন্যদিকে কিছু নতুন উপাত্ত যেমন সমাধি থেকে সংগৃহীত একটি শিলালিপি, দুটি পাণ্ডুলিপি (যেগুলো জীবনীমূলক) একটি বাংলা ভাষায় ও অপরটি ফার্সিভাষায় লিখিত, আমাদের হাতে রয়েছে।

এইগুলো ছাড়া ও কতকগুলো বাংলা পুঁথি[৩] সংগৃহীত হয়েছে যেগুলো দ্বারা হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী পূর্ণভাবে লেখা সম্ভব। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুর মহকুমার শামাইল গ্রামে জন্ম[৪] গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সে সময়ে

---

১ দেখুন JASP, vol.III, পৃ. ১৮৭, পাদটিকা ৪, J.E. Gastrell, Geographical and statistical Report of the Districts of Jassore, Fureedpure and Backergunj, Calcutta, 1868 পৃ. ৩৬ এবং ১৫১, এখন থেকে যশোর, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ হিসেবে উদ্ধৃত হবে। এবং ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের দুটি মামলার কার্যবিবরণী Translation of proceedings held in two cases tried in 1847 before the Session Judge, Dacca (Dhaka) in which Dudu Miyen and his follawers belonging to the sect of Hajees or Faraizees, Calcutta, Military Orphan Prass 1848 (এর পর থেকে Trail of Dudu Miyan, হিসেবে উদ্ধৃত হবে) পৃ. ২৬৮। এর দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হাজী ছিলেন একজন ছোট আকারের ভূম্যাধিকারী, তাঁর নিজস্ব একটি তালুক ছিল।

২ বিভিন্ন বিতর্কের বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, JASP, vol. iii পৃ. ১৮০ থেকে।

৩ বর্তমান লেখক কর্তৃক, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সংগৃহীত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকাতে সংরক্ষিত।

৪ JASP, vol. iii, পৃ. ১৮৭ পাদটীকা ৪। স্থানীয় কিছু ব্যক্তির মতে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম হাজিপুরে জন্ম গ্রহণ করেন।

মাদারীপুর বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এই মহকুমাটিকে ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৫]

তাঁর পিতা আবদুল জলিল তালুকদার খুব বিত্তশালী ছিলেন না। শরীয়তুল্লাহ'র বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন।[৬] এরপর তিনি তাঁর পিতৃব্য আজিম উদ্দিনের কাছে বড় হতে থাকেন। স্বাভাবিক কারণেই শরীয়তুল্লাহ তাঁর শৈশবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর চাচা-চাচীর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় শরীয়তুল্লাহ তাদের স্নেহে লালিত হন। ফলে ছেলে বেলায় শরীয়তুল্লাহ সুশৃংখল জীবনের পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খল জীবন অতিবাহিত করেন।[৭]

কোন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় শরীয়তুল্লাহ তাঁর চাচা কর্তৃক ভর্ৎসনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় চলে আসেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল বার বছর। সেখানে তিনি পবিত্র কোরআন শিক্ষক মওলানা বাশারত আলীর কাছে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনি শরীয়তুল্লাহকে কোরআন শিক্ষা ক্লাশে ভর্তি করিয়ে নেন।[৮] কোরআন পাঠশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি তাঁর শিক্ষকের পরামর্শে ফুরফুরায় গমন করেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত ফুরফুরাতে তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন।[৯] দুই বছরের মধ্যেই তিনি উক্ত ভাষাসমূহে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর তিনি তাঁর অন্য চাচা আশিক মিয়ার কাছে যান, শরীয়তুল্লাহ'র চাচা মুর্শীদাবাদ কোর্টের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[১০] চাচার সঙ্গে অবস্থানের সময় তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষা অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। এখানে এক বছর অবস্থানের পর তিনি তাঁর চাচার সঙ্গে তাদের শামাইল গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বাকেরগঞ্জে যাওয়ার জন্য আশিক মিয়া একটি ছোট পালতোলা নৌকা ভাড়া করেন।[১১] শরীয়তুল্লাহ তাঁর চাচা এবং চাচীর সঙ্গে উক্ত নৌকায় রওয়ানা হওয়ায় পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়েন। নৌকা ডুবি হওয়ায় তাঁর চাচা-চাচীর মৃত্যু হয় এবং শরীয়তুল্লাহ ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।[১২]

হঠাৎ বিপর্যয়ে শরীয়তুল্লাহ'র মনে গভীর আঘাত হানে এবং তিনি বাড়ি ফেরার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে শরীয়তুল্লাহ কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং তার পুরনো শিক্ষক মওলানা বাশারত আলীর সঙ্গে দেখা করেন।[১৩] উক্ত মওলানা

---

৫ দ্রষ্টব্য, Beveridge : District of Bakergange. Its History and statistics, London, 1876 পৃ. ২৮৯।

৬ হাজী শরীয়তুল্লাহর পরিবারে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর পিতা মারা যান এবং তাঁর মা আরও আগেই মৃত্যুবরণ করেন। বাংলা ভাষায় শরীয়তুল্লাহর জীবনী লেখক মুনশী আবদুল হালিম এবং ওয়াজির আলী তালুকদার উক্ত মত সমর্থন করেন। দ্রষ্টব্য মুনশী আবদুল হালিম রচিত পাণ্ডুলিপি, হাজী শরীয়তুল্লাহ, পৃ. ১ এবং ওয়াজির আলী লিখিত পাণ্ডুলিপি, মুসলিম রত্নহার, পৃ. ২।

৭ হাজী শরীয়তুল্লাহর পরিবারের মধ্যে প্রচলিত শ্রুতি থেকে জানা যায়। এবং মুনশী আবদুল হালিম তা সমর্থন করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ (পাণ্ডুলিপি) ১নং অংশ।

৮ ঐ, ২নং অংশের পর।

৯ ঐ, ৪নং অংশের পর।

১০ ঐ, ৪নং পাতা এবং ওয়াজির আলী, মুসলিম রত্নহার, পৃ. ২।

১১ আবদুল হালিম, হাজী শরীয়তুল্লাহ (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৫।

১২ ঐ, পাতা ৫ ও ৬।

১৩ ঐ, পৃ. ৬ ও ৭।

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পবিত্র মক্কায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[১৪] কিশোর শরীয়তুল্লাহ তাঁর শিক্ষকের সঙ্গে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর শিক্ষক মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দেন।[১৫] সুতরাং পরবর্তীকালের বাংলায় ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এইভাবে আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র মক্কায় যাওয়ার সুযোগ পান। উল্লেখ্য যে, মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত শরীয়তুল্লাহর পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না।

শিক্ষা জীবন

কলিকাতা এবং হুগলীতে শরীয়তুল্লাহ যে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন তাই মক্কায় উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। মক্কায় প্রাপ্ত শিক্ষাই তাঁকে পরবর্তীকালে মহান নেতৃত্ব দেবার প্রেরণা দেয়। গবেষকগণ শরীয়তুল্লাহ'র জীবনের কালপঞ্জি সম্পর্কে একমত নন। তবে সমসাময়িক ও পরবর্তী লেখকদের মতে শরীয়তুল্লাহ ১৮ বছর বয়সে মক্কা যান এবং ২০ বছর পর বাংলায় ফিরে আসেন।[১৬] তাঁর সমাধিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি (পূর্বের লেখকদের কাছে অজানা ছিল) অনুযায়ী শরীয়তুল্লাহ'র জীবনের কালপঞ্জি নিম্নোক্তভাবে দেখা যায়।[১৭]

জন্ম ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ, মক্কায় হজ্জযাত্রী ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ, বাংলায় ফিরে আসা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৮৪০ খ্রি .

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৯৯ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মক্কায় অবস্থান করেন। তাঁর পরবর্তী জীবন অর্থাৎ প্রচারক হিসাবে তাঁর ভূমিকা মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, আরব দেশে অবস্থান করে তিনি যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা-ই তাঁর দিশারী হিসাবে কাজ করেছিল। জেমস্ ওয়াইজ এবং হিদায়েত হোসেনের মতে শরীয়তুল্লাহ আরব থেকে একজন উত্তম আরবি পণ্ডিত ও তার্কিক হিসাবে ফিরে আসেন।[১৮] তাঁর সমাধি শিলালিপিতে তাঁকে সকল জ্ঞানীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী, সুমধুর ও সুশ্রাব্য ধ্বনিতে ঐশীবাণী প্রচারক, হিন্দুস্তান ও বাংলায় সকল কিছুর প্রদর্শক, শিয়া এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদের থেকে ধর্ম রক্ষাকারী, সকল মিথ্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা, তমসাচ্ছন্ন ইসলামী আকাশে সত্যের প্রচারক বিশেষণে ভূষিত করা হয়।[১৯]

শরীয়তুল্লাহ'র আরব দেশে অবস্থানের সময়টিকে তিনটি ধাপে বিভক্ত করা যায় :

(১) প্রথম ধাপে শরীয়তুল্লাহ'র প্রাথমিক বছরগুলোতে মক্কায় বসবাসকারী বাঙালি মওলানা মুরাদের[২০] বাসগৃহে অবস্থান করে আরবি সাহিত্য এবং ইসলামী আইন-

---

১৪ ঐ, পৃ ৭ ও ৮।

১৫ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

১৬ দ্রষ্টব্য, JASP, খণ্ড-৩, পৃ. ১৯১।

১৭ পৃ. ১৯৫।

১৮ James wise, Notes on the Races, castes and Trades of Eastern Bengal, London. 1884 (এর পর থেকে Eastern Bengal হিসেবে উদ্ধৃত হবে।) পৃ. ২২ এবং M. Hidayat Hossain Faraidi, Encyclopedia of Islam, প্রথম সংস্করণ, খণ্ড-২, পৃ. ২৭।

১৯ দ্রষ্টব্য, JASP, খণ্ড-৩, পৃ ১৯৮।

২০ আবদুল হালিম, হাজী শরীয়তুল্লাহ (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৮।

শাস্ত্র শিক্ষা করেন। মক্কায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর এই শিক্ষা সহায়তা দিয়েছিল।

(২) দ্বিতীয় ধাপটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শরীয়তুল্লাহ ১৪ বছর সময় ধরে হানাফী আইনজ্ঞ তাহির সোম্বলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফরায়েযীদের মতে তাহির সোম্বল ছোট আবু হানিফা নামে খ্যাত একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।[২১] এই জ্ঞানী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে হাজী শরীয়তুল্লাহ ধর্মীয় বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তিনি সুফিবাদের রহস্যসমূহ সম্পর্কে অবগত হন। এই সময়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ সুফিতত্ত্বের কাদেরিয়া তরীকার অনুসারী হন।[২২] ফরায়েযীগণ সেই সময় থেকে অদ্যাবধি উক্ত তরীকা অনুসারী হিসাবে নিজেদেরকে দাবি করে।

তাহির সোম্বলের পরিচিতি

বাংলার ফরায়েযীদের কাছে তাহির সোম্বলের নাম পরিচিত। হাজী শরীয়তুল্লাহর আধ্যাত্মিক শিক্ষক (মুর্শিদ) এবং শিক্ষক (উস্তাদ) হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন। এখানে উল্লেখ্য যে, ফরায়েযীগণ কাদেরীয়া তরীকার অনুসারী হিসাবে তাহির সোম্বলের মাধ্যমে তাদের সিলসিলাত অন মুর্শিদিন বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আবদুল কাদির জিলানী পর্যন্ত দাবি করে।[২৩] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরায়েযীগণ তাহির সোম্বলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। তা ছাড়া শরীয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ফরায়েযী ব্যাখ্যা তাহির সোম্বলের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর ছিল। কিন্তু আমরা তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অল্পই জানতে পারি। তাহির সোম্বল সম্পর্কে একমাত্র হাজী শরীয়তুল্লাহ'র জীবনী থেকে পরোক্ষভাবে কিছু জানা যায়। দেশের বাইরের কোনো উপাদান না থাকায় এবং বহু পূর্বের বিষয় হওয়ায় তাহির সোম্বলের পরিচিতি জানা খুব দুরুহ হয়ে পড়ে।

ফরায়েযী আন্দোলন সম্পর্কিত উপাদান থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, তাহির সোম্বল মক্কায় একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর কাছে ১৪ বছর সময় ধরে ধর্মীয় বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে আমরা দেখব যে হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন দ্বিতীয়বার মক্কা ভ্রমণ করেন (১৮২০ খ্রি.) তখন তাহির সোম্বলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বাংলায় বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচারের অনুমতি গ্রহণ করেন।[২৪] সুতরাং ১৮০১ থেকে কমপক্ষে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে তাহির সোম্বল তাঁর খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিলেন।

এম. হিদায়েত হোসেন বলেছেন যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর শিক্ষক ছিলেন 'শেখ তাহির আল সোম্বল আল মক্কী' যিনি মক্কার শাফী সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন।[২৫] এই

---

২১ ঐ, ৮-৯ নং পাতা, ওয়াজির আলী, মুসলিম রত্নহার, পৃ. ২ এবং দুরর ই মোহাম্মদ পুঁথি, পৃ. ৯।
২২ আবদুল হালিম : হাজী শরীয়তুল্লাহ (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৯।
২৩ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৫২-৫৫।
২৪ গ্রন্থের পরবর্তী অংশে দ্রষ্টব্য।
২৫ দ্রষ্টব্য'ফরায়েযী' : Enclypaedia of Islam, খণ্ড-২, পৃ. ৫৭।

তথ্যটি সঠিক নয় বলা যায়। প্রথমত এম. হিদায়েত হোসেন তাঁর মতের স্বপক্ষে কোন সূত্র উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত ফরায়েযী মতবাদসমূহ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এই সম্প্রদায়ের সকল অনুসারীগণ ছিল হানাফী মযহাবের অন্তর্গত। এদের ধারণাসমূহে শাফী মতবাদের কোন চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। উপরন্তু শাফী মযহাবের অন্তর্গত 'আহল ই হাদিস' সম্প্রদায়ের সঙ্গে ফরায়েযীদের রয়েছে লক্ষণীয় পার্থক্য। তৃতীয়ত হাজী শরীয়তুল্লাহর সমাধিতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, 'হাজী ছিলেন হানাফী মতবাদের অনুসারী যা ছিল আহল আল সুন্নাত ওয়াল জমাআত[২৬] এর অন্তগর্ত যদি শরীয়তুল্লাহর শিক্ষক তাহির সোম্বল শাফী মতবাদের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে শাফী মতবাদের প্রভাব শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীদের উপর থাকা বিচিত্র ছিল না। উপরন্তু ফরায়েযী উপাত্তসমূহ তাহির সোম্বলকে 'আবু হানিফার সঙ্গে তুলনা করেছে যা হিদায়েত হোসেনের মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তাহির সোম্বল সম্পর্কে ফরায়েযী পুঁথিসমূহে সর্বপ্রথম উল্লেখিত হয়েছে। পুঁথিতে তাকে সাধারণভাবে 'তাহির সোম্বল বা মোহাম্মদ তাহির সোম্বল' বলা হয়েছে।[২৭] এই বিষয়টি ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহ্যগত বিবরণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। উপরন্তু পুঁথিতে মন্তব্য করা হয়েছে 'সোম্বল' হল পদবী যা ফরায়েযীগণ তাকে রোহিলাখণ্ডের মুরাদাবাদ জেলার সোম্বল শহর থেকে এসেছে। বর্তমানে এটি রোহিলাখণ্ডের গঙ্গাতীরে অবস্থিত।[২৮]

তৃতীয় ধাপে আমরা দেখি যে হাজী শরীয়তুল্লাহ কায়রো শহরের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হাজী সাহেবের জীবনীকার আবদুল হালিম লিখেছেন যে, মক্কায় ধর্মীয় বিজ্ঞানে শিক্ষা শেষ করার পর শরীয়তুল্লাহ ইসলামী আদর্শের সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য আল আজহারে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেন।[২৯] এই উদ্দেশ্যে তিনি কায়রো গমন করেন এবং দুই বছর এই স্থানে অবস্থান করেন।[৩০] প্রচলিত বিবরণের দেখা যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন 'দর্শন শাস্ত্র' শিক্ষা করার জন্য কায়রো যাওয়ার অনুমতি চান তখন তাহির সোম্বল নিবিঘ্নে অনুমতি দেন।[৩১] সম্ভবত যুক্তিবাদী দর্শন হাজীকে পরিবর্তন করে ফেলবে এই ধারণায় সোম্বল দ্বিধা করেছিলেন। বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কোনো কোর্স অধ্যয়ন করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে আল আজহারের গ্রন্থাগারে তিনি অনেক সময় কাটিয়েছেন বলে জানা যায়। এরপর হাজী শরীয়তুল্লাহ মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কা থেকে তিনি মদীনায় সংক্ষিপ্ত সফরে যান। অতঃপর ইসলামী মতাদর্শ প্রচারের জন্য

---

২৬ দ্রষ্টব্য, JASP. খণ্ড-৩, পৃ. ১৯৮।

২৭ আবদ আল হালিম : হাজী শরীয়তুল্লাহ (পাণ্ডুলিপি) অংশ-৮, দুরর ই মোহাম্মদী পুঁথি, পৃ. ৯ এবং ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার পৃ. ২।

২৮ ১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'সম্বল' ছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল দ্রষ্টব্য, A.C.L.Carllcyle : Archological Survey of India Report, vol. xii, পৃ. ২৪-২৭।

২৯ আবদুল হালিম 'শরীয়তুল্লাহ' পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯।

৩০ ঐ।

৩১ হাজী শরীয়তুল্লাহর পরিবারে প্রচলিত বিশ্বাস, তাহির সোম্বলের দ্বিধা ছিল এই কারণে যে হাজী হয়ত কায়রো থেকে গ্রীক দর্শন শিক্ষা করে বিপথগামী হতে পারেন।

বাংলায় ফিরে আসেন।[৩২] শরীয়তুল্লাহ বাংলায় ফিরে আসার সময়ও তাহির সোম্বল আপত্তি করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহকে আরও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নেয়ার কথা বলেন।[৩৩] তা সত্ত্বেও দীর্ঘ ২০ বছর অনুপস্থিত থাকার পর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শরীয়তুল্লাহ বাড়ি ফিরে আসেন।[৩৪]

ফরায়েযী আন্দোলনের প্রচারক হিসাবে শরীয়তুল্লাহ্

ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ নিজের দেশে তা প্রচারের জন্য এগিয়ে আসেন। ২০ বছর পূর্বে তিনি যখন মক্কা যান তখন সমাজে প্রচলিত বেশ কিছু ধর্মীয় সামাজিক আচার তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কিন্তু মক্কা থেকে ফিরে আসার পর এই সকল আচার অনুষ্ঠান তাঁর কাছে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক বলে মনে হয়েছে। এই সকল আচার সম্পর্কে সমসাময়িক অথবা উক্ত সময়ের কাছাকাছি সময়ের লেখা থেকে আমরা ধারণা নিতে পারি। জেমস্ ওয়াইজের মতে 'তিনটি প্রজন্ম বা পঞ্চাশ বছর ধরে' অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভের পর (১৭৬৫ খ্রি.) থেকে পূর্ববাংলার মুসলমানদের কোন অভিভাবক ছিল না। এর ফলে এলাকার মুসলিম সমাজ তাদের জাতীয় বিশ্বাস থেকে ক্রমশ দূরে চলে যায় এবং তাদের আচারসমূহ হিন্দুদের কুসংস্কারসমৃদ্ধ আচারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখা যায়।[৩৫] হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক জেমস্ টেইলর কুসংস্কারপূর্ণ আচার এবং সামাজিক প্রথাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করেছেন, যেগুলো মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল। ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ জেলার মুসলিম সমাজে 'ছুটিপট্টি' এবং 'চিল্লা' প্রচলিত ছিল, যেগুলো শিশুর জন্ম, খৎনা এবং দাফনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সকল আচার হাজী শরীয়তুল্লাহ বিলুপ্ত করেন।[৩৬] পরবর্তী সময়ে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী লিখেন[৩৭] 'কোন সাধারণ ব্যক্তি যদি ১৮৭২/ ১৩৮৯ হিজরী সময়ে দক্ষিণ বাংলা সফর করে, তাহলে সে ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুসংস্কার, অলসতা এবং অবহেলা দেখতে পাবে, যা অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশী। 'দুরর ই মোহাম্মদ তাঁর পুঁথিতে বলেন যে[৩৮] "হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন বাংলায় আসেন তখন তুমি কোথায় ছিলে ?" নৈতিকতা বিবর্জিত মোল্লাদেরকে থামানো, ফাতিহা প্রথা এবং সমাধিতে প্রার্থনা করার রেওয়াজকে বিলুপ্ত করেছেন ?

"যখন তিনি বাংলায় পা রাখেন তখন সকল শিরক এবং বিদাত বিদূরিত হয়।"

তারপর তিনি শিরক এবং বিদাতের একটি তালিকা তৈরি করেন, যেগুলো হাজী শরীয়তুল্লাহ বিদূরিত করেন। এগুলোর মধ্যে ছিল বিবি ফাতিমার[৩৯] সমাধিসৌধ পূজা

---

৩২ আবদুল হালিম, শরীয়তুল্লাহ (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ১০।
৩৩ হাজী সাহেবের পরিবারে প্রচলিত বিশ্বাস থেকে।
৩৪ দেখুন, JASP, খণ্ড-৩, পৃ. ১৯২।
৩৫ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২১।
৩৬ James Taylor : A Sketch of the Topography and Statistics of Decca, Calcutta. 1840 পৃ. ২৪৮। এরপর থেকে Topography উল্লেখিত হবে।
৩৭ মওলানা কেরামত আলী : কওল আল সাবিত, পৃ. ৩।
৩৮ দুরর ই মোহাম্মদ পুঁথি, পৃ. ২৭।
৩৯ দেখুন, জেমস ওয়াইজ : Eastern Bengal, পৃ. ৯।

করা গাজী[৪০] কালু[৪১] পাঁচ পীর[৪২] বেড়া ভাসানো[৪৩] জারী অনুষ্ঠান অথবা হাসান এবং হোসেনের শাহাদত বরণ স্মরণ অনুষ্ঠান।[৪৪] এছাড়া অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন, সঙ্গীত এবং ফাতিহা, মেয়েদের প্রথম মাসিক উপলক্ষে ঘরের চারদিকে কলাগাছ রোপণ করা, 'রথযাত্রা'য় অংশ গ্রহণ করা এবং হিন্দু সমাজের অনেক পৌত্তলিক আচার উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুরর ই মোহাম্মদ, এ সম্পর্কে বলেন যে, [৪৫]এই সকল বেদাত বিদূরিত করা হয় এবং ইসলামের সূর্য আকাশে উদিত হয়।

'বাংলায় আগমনের পর হাজী শরীয়তুল্লাহ্ সত্য প্রচার করেন'।

ইসলামী বিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ইসলামের জন্ম ভূমি এবং কেন্দ্রে অবস্থান করার সুযোগ পেয়ে ছিলেন। সেই আলোকে তিনি বাংলার ইসলামী সমাজের করুন অবস্থা অবলোকন করেন। তাই পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজকে সংস্কার করার জন্য তিনি তাকে উৎসর্গ করেন। এই বিষয়ে হান্টারের মন্তব্যটি তাঁর অবদানকে মূল্যায়ন করেছে এভাবে 'ফরায়েযী আন্দোলনের প্রবক্তার জীবদ্দশায় এই আন্দোলনের দ্রুত প্রসার তাঁর যথেষ্ট উৎসাহের উদাহরণ।[৪৬]

বাংলায় আগমনের পথেই হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর প্রচার কার্য শুরু করেন। তাঁর দেশে ফেরার পথ সম্পর্কে কিছু প্রবাদ প্রচলিত আছে। এগুলো কিছু নিম্নে দেয়া হলো :

(ক) জেমস্ ওয়াইজ বলেছেন যে, তাঁর ফেরার পথে হাজী সাহেব ডাকাতদের কবলে পড়েন। ডাকাত দল তাঁর সবকিছু এমন কি বই পুস্তকও লুট করে। কিন্তু বই পুস্তক ছাড়া জীবন যাপন করা অসম্ভব মনে করে হাজী ডাকাতদের সঙ্গে যোগদেন এবং তাদের অনেক অভিযানে অংশ নেন। 'তার চরিত্রের সরলতা এবং বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠা দেখে এই দুষ্টচক্র চেতনা ফিরে পায় এবং 'শেষে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী' হয়। ওয়াইজ এই গল্প বলে মন্তব্য করেছেন 'এভাবেই বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়।[৪৭]

(খ) অপর একটি গল্প থেকে জানা যায় যে, হাজী যখন বিহারের মুঙ্গের জেলা অতিক্রম করেছিলেন তখন তিনি মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কার দেখতে পান। অল্প সময়ের জন্য ওখানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন এবং মুসলিমদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হন। তিনি বাংলার পথে পুনরায় যাত্রা করার পূর্বেই তা করেন।[৪৮]

(গ) এটা বর্ণিত আছে যে যখন হাজী তাঁর চাচা আজিম উদ্দিনের বাড়িতে ফিরে আসেন তখন তাকে কেউ চিনতে পারেনি। তাঁর লম্বা দাঁড়ি এবং পাগড়ির জন্য এরূপ

---

৪০ ঐ, পৃ. ১৩-১৪।

৪১ ঐ।

৪২ ঐ, পৃ. ১৭।

৪৩ ঐ, পৃ. ১২থেকে।

৪৪ উল্লেখ যে, জারী শব্দটি এসেছে ফার্সী শব্দ যারি থেকে যাঁর মানে হল ক্রন্দন করা। বাংলা সাহিত্যে এই ধারণাটি হাসান ও হোসেনের শাহাদাৎ বরণকে নিয়ে রচিত সাহিত্যকে বুঝায়, যা জারী গান হিসেবে পরিচিত।

৪৫ দুরর ই মোহাম্মদ : পুঁথি পৃ. ২৭।

৪৬ W.W.Hunter, edited, Imperial Gazetteer of India vol. iv, পৃ. ৩৩৯।

৪৭ James wise : Eastarn Bengal, পৃ. ২২।

৪৮ আবদুল হালিম : পাণ্ডুলিপি/হাজী শরীয়তুল্লাহ্, পৃ. ১০।

ঘটেছিল। একজন হাজী মক্কা থেকে এসেছেন এই ধরনের খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে দেখার জন্য অনেক লোক ভিড় জমায়।

তখন মাগরীব এর নামাজের সময় ঘনিয়ে আসে। তখন তিনি উচ্চস্বরে আযান দেন। কিন্তু আযান শেষে তিনি বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন যে, সেখানে একজন লোকও উপস্থিত নেই। তিনি তাদের ধর্মবোধহীনতায় দুঃখিত হন এবং একাকী নামাজ আদায় করেন।

মাগরিব নামাজের পর তিনি অন্দর মহলে যান এবং তাঁর চাচাকে মৃত্যু পথ যাত্রী হিসাবে পান। তাঁর চাচা তাকে চিনতে পারেন এবং শেষ মুহূর্তে তাকে দেখে আশ্বস্ত হন। যেহেতু তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না সেহেতু পরিবারকে দেখাশুনার দায়িত্ব হাজীকে প্রদান করেন রাত্রিকালে তাঁর চাচা মৃত্যুবরণ করেন।[৪৯]

এগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, ফরায়েযীগণ এগুলোর মধ্যে অতিমানবীয় কোন বিষয় যুক্ত করেনি। হাজী শরীয়তুল্লাহ পরেরদিন তাঁর চাচার দাফনের সময় আবারও মানসিকভাবে দুঃখ পান। অনৈসলামিক আচারের বিষয়ে তাঁর আপত্তি থাকায় গ্রামবাসীরা দাফন কার্যে সহায়তা করতে অস্বীকার করে।[৫০]

এই ঘটনা হাজী শরীয়তুল্লাহকে দৃঢ় মনোবল নিয়ে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ঐ দিন থেকেই হাজী গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে মুসলমানদের জমায়েতে তাঁর সংস্কার আন্দোলন প্রচার শুরু করেন। আলোচনা ক্রমে তা তিনি তাঁর নিজের জেলা ও প্রতিবেশী জেলাগুলোতেও প্রচার করতে থাকেন।

এই সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্কারের রূপরেখা তৈরি করেন যা তিনি পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মীয় সংস্কারসমূহ অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো তিনি ইসলাম নির্দেশিত আবশ্যক বিষয় বা ফরজ নীতিসমূহ পালন করার বিষয়ে জোর দেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সূচিত আন্দোলন ফরায়েযী আন্দোলন হিসাবে পরিচিত। শুরুতে তাঁর আন্দোলন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এই ব্যর্থতাই সম্ভবত তাঁকে দ্বিতীয়বার মক্কায় যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় বার মক্কা সফর

হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক জেমস্ টেইলর স্পষ্ট বলেছেন যে, 'হাজী শরীয়তুল্লাহ দ্বিতীয়বার মক্কা সফর করেছেন। এই সময় জাহাজে ওয়াহাবিদের মাঝে ছিলেন।[৫১] এই বিষয়টি ওয়াজির আলী এবং আবদুল হালিমও উল্লেখ করেছেন।[৫২] শেষোক্ত গ্রন্থে হাজীর মক্কা সফরের দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে। এছাড়া ফরায়েযীদের মাঝে এই বিষয়ে

---

৪৯ আবদুল হালিম : হাজী শরীয়তুল্লাহ পৃ. ১০-।
৫০ ঐ, পৃ. ১২।
৫১ James Taylor : Topography, পৃ. ২৪৮।
৫২ দ্রষ্টব্য, ওয়াজির আলী, মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৩, আবদুল হালিম হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (পাণ্ডুলিপি) ১৪-১৫ তম অংশ।

উপকথা চালু আছে। এর দ্বারা আমরা ধারণা করতে পারি যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ'র সফরের সময়কাল ছিল ১৮১৮ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ সময়টি ছিল তাঁর প্রচার কার্যের প্রথম পর্যায়। ব্যর্থতার কারণেই মক্কায় তাঁর দ্বিতীয়বার সফর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহ অনুভব করেছিলেন যে তাঁর এই ব্যর্থতার পেছনে একটি বিষয় কাজ করছিল। এটি ছিল তাঁর শিক্ষকের [৫৩] কাছ থেকে অনুমতি ছাড়াই সংস্কার আন্দোলন শুরু করা। বলা হয়ে থাকে যে হাজী শরীয়তুল্লাহ দ্বিতীয়বার মক্কা সফরের সময়ে একটি স্বপ্নে নবীজী তাকে বাংলার প্রকৃত ইসলাম প্রচার করার জন্য আদেশ করেন।[৫৪] তাঁর মক্কা গমনের কারণটি সত্য বা অসত্য যা ই হোক না কেন অথবা স্বপ্নের বিষয়টি স্থানীয়ভাবে তৈরি এ ধারণা মনে রেখেও বলা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের ফরায়েযীগণ এবং তাদের বংশধর এখনও 'সাতাশ সনী' ফরায়েযী হিসাবে পরিচিত (অর্থাৎ বাংলা সন ১২২৭ বা ১৮২০-২১ খ্রি. এর ফরায়েযী)। এই বিষয়টি থেকে তাঁর দুইবার মক্কা গমনের মধ্যবর্তী সময়টি পাওয়া যায়। প্রথমবার তিনি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয় বার ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে[৫৫] ফিরে আসেন। হাজীর প্রথম ও দ্বিতীয় বারের মক্কা গমনকে ফরায়েযীগণ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও আমাদের কাছে তা শুধু সাধারণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, হাজী দ্বিতীয়বার ফিরে এসে অনেক বেশী উৎসাহ সহকারে তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক নেতা তাহির সোম্বলের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত একারণেই সাধারণভাবে বলা হয় যে, ফরায়েযী আন্দোলন শুরু হয়েছিল হিজরী ১২২৭ বা ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। যদিও আমরা লক্ষ্য করেছি যে, হাজী প্রথমবার অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে যখন মক্কা থেকে আসেন তখন থেকেই প্রচার শুরু হয়।

ফরায়েযী আন্দোলনের প্রসার

হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক জেমস্ টেইলর বলেন যে, ফরায়েযী আন্দোলন 'অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ' করে। হাজী ফিরে আসার পর প্রচার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সফল হন। ধারণা করা যায় যে, ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের মুসলিম জনসংখ্যা এক ষষ্ঠাংশ ফরায়েযী মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়। টেইলর আরও বলেন যে, ঢাকা শহরের মুসলিম জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ফরায়েযী ছিল।[৫৬]

১৮৫৬-৬২ খ্রিস্টাব্দে জে, ই, গ্যাসট্রেল ফরিদপুর, যশোর, এবং বাকেরগঞ্জ জেলার জরীপ কার্যপরিচালনা করেন। এই সময়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, ফরিদপুর ও

---

৫৩ দ্রষ্টব্য, আবদুল হালিম, হাজী শরীয়তুল্লাহ (পাণ্ডুলিপি) ১৩-১৫ তম অংশ।

৫৪ ঐ, পৃ. ১৫। ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৪ এবং দুরর ই মোহাম্মদ পুঁথি, পৃ. ১০।

৫৫ হাজী শরীয়তুল্লাহর ফার্সী জীবনী লেখক মওলবী আদিল উদ্দীন লিখেছেন যে হাজী মক্কা থেকে দ্বিতীয়বার ফিরে এসে (হিজরী ১২২৭/১৮২০-২১খ্রি.) শুদ্ধ ইসলামের ধারণাসমূহ প্রচার করেন। দ্রষ্টব্য, হালাত ই কারগুজারী, পাণ্ডুলিপির ৭ম পাতা। আবদুল বারি তাঁর গ্রন্থ নিসারআলদীন আহমেদের জীবনী, (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) প্রথম পৃষ্ঠায় একই মত ব্যক্ত করেছেন।

৫৬ James Taylor. Topography পৃ. ২৪৮

নিকটস্থ জেলাসমূহের মুসলিম সমাজে ফরায়েযীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং এই সম্প্রদায়ের অন্তভুর্ক্ত হচ্ছে।[৫৭] একইভাবে হাজীর জীবদ্দশায়ই ত্রিপুরা জেলায় (বৃহত্তর কুমিল্লা) ফরায়েযী আন্দোলন প্রসার লাভ করে।

জেমস্ ওয়াইজ মনে করেন শরীয়তুল্লাহ্ ছিলেন ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে প্রথম যিনি পূর্ববাংলায় হাওড়, বিল এলাকায় মুসলিম সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা, 'হিন্দু পৌত্তলিকতা এবং দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান'।[৫৮] ওয়াইজ বলেন তাঁর নিষ্কলুষ এবং অনুকরণীয় জীবনযাত্রা দেশবাসী গ্রহণ করে এবং তাকে তাদের পিতা হিসাবে অভিহিত করে। শরিয়তুল্লাহ ছিলেন তাদের বিপদের ত্রাণকর্তা এবং সবকিছুর দিশারী।[৫৯]

কিন্তু সাধারণভাবে সকল নতুন আন্দোলনের যেমন বিভিন্ন বাঁধা পার হতে হয়েছে, তেমনি ফরায়েযী আন্দোলনের ভাগ্যেও একই দশা হয়েছে। আন্দোলনের শুরুতেই রক্ষণশীল মুসলিমদের একটি অংশ হাজী কর্তৃক প্রচারিত শুদ্ধিবাদী ইসলামের বিরোধিতা করে। দীর্ঘদিনের সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে শরীয়তুল্লাহ্'র প্রচারণা এই বিরোধিতার কারণ ছিল। যতই সময় যাচ্ছিল ততই এদের বাঁধা শক্তিশালী হচ্ছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল ঢাকা-জালালপুরের ফৌজদারী আইন সম্পর্কিত রিপোর্ট (রুবকারী) অনুযায়ী দেখা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়ে শরীয়তুল্লাহর অনুসারী এবং রামনগর গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে মতান্তর ঘটেছে এবং সহিংসতা দেখা দিয়েছে।[৬০]

উক্ত 'রুবকারী'তে বা রিপোর্টে ফরায়েযীদেরকে বলা হয়েছে 'তাইউনীহাল' এবং তাদের বিরোধীদের বলা হয়েছে 'তাইউনী সাবিক'। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ফরায়েযী বিরোধিরা সাধারণত মোহাম্মদ (ছ:) এবং একাধিক পীরের উপাসনা করত কিন্তু ফরায়েযীগণ উক্ত বিষয়ে উপাসনা করত না এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বিষয়েও ভিন্নমত পোষণ করত।[৬১] মুসলিম ধর্মীয় বিষয়ে ইংরেজ মেজিস্ট্রেটের ভুল ধারণা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে, পুরনো সমাজ স্থানীয় আচার পালনে অভ্যস্ত ছিল। অন্যদিকে হাজী শরীয়তুল্লাহ্ প্রচারিত শুদ্ধিবাদী নতুন ধারা সম্পর্কেও জানা যায়। সুতরাং এখানে উল্লেখ্য যে, ফরায়েযীগণ ছিল শুদ্ধিবাদী যাঁরা ওয়াহাবীদের মত পুনরুজ্জীবনবাদী ছিল। অবশিষ্ট মুসলমানেরা ছিল কুসংস্কারে নিমজ্জিত এবং স্থানীয় আচার পালনের অভ্যস্ত, যারা পীরপূজা এবং পীর বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের প্রতি ছিল গভীরভাবে অনুরক্ত।

উপরোক্ত বর্ণনায় যে, সকল পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। 'তাইউনী' যা সঠিকভাবে এসেছে আরবি শব্দ 'তাইউনে' থেকে, যার মানে হল নির্দিষ্ট করা। সুতরাং 'তাইউনী' শব্দটি একজন ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ মযহাবের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিতি করে। এটা সকলেই জানেন যে, বাংলার প্রায় সব মুসলিমই 'হানাফী' মযহাবের অন্তর্ভুক্ত। ফরায়েযী বিরোধিরা যেহেতু 'তাইউনী'

---

৫৭ J.E. Gastrell : Jessore, Fureedpore and Backergung, পৃ. ৩৬, নং ১৫১।
৫৮ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২১-২২।
৫৯ ঐ, পৃ. ২৩।
৬০ দ্রষ্টব্য, 'Two Faraidi Documents' JASP, vol. vi, 1961 পৃ. ১২০-২৪
৬১ ঐ, পৃ. ১২৪।

হিসাবে পরিচিত ছিল তাতে বুঝা যায় যে, এই দু পক্ষই ছিল হানাফী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত।[৬২] সম্ভবত উক্ত নামটি ফরায়েযী এবং তাদের বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ফরায়েযীরা হানাফী মযহাবের অনুসারী বলে মনে করে। পক্ষান্তরে ওয়াহাবীরা কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কোন মযহাবের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাদেরকেলী-মযহাবী' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ফরায়েযীদের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 'তাইউনী হাল' দ্বারা বুঝা যায় যে, ফরায়েযীগণ হানাফী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত সাম্প্রতিক পরিচয়ে পরিচিত একটি সম্প্রদায়। অন্যদিকে 'তাইউনী সাবিক' ছিল অবশিষ্ট মুসলিমগণ যাঁরা পুরনো আচার আচরণে অভ্যস্ত হানাফী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্থানীয় আচার পালনকারীগণ পরবর্তীতে সাবেকী হিসেবে পরিচিত হয়।[৬৩] যাহোক 'ফরায়েযীগণ যে তাইউনী হিসাবে পরিচিত ছিল এ সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বাংলার মওলানা কেরামত আলীর অনুসারীগণ সুনির্দিষ্টভাবেই 'তাইউনী' হিসাবে পরিচিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে উক্ত নামে পরিচিত কেরামত আলীর অনুসারীগণ ফরায়েযীদের ঘোর বিরোধী ছিল।[৬৪] যদিও 'তাইউনী হাল' দ্বারা অস্পষ্টভাবে ফরায়েযীদের মতাদর্শিক অবস্থান বুঝায়, তা সত্ত্বেও ফরায়েযীদের নিজস্ব ইতিহাসে উক্ত নাম সম্পর্কে সামান্যতম উল্লেখ নেই যাঁর দ্বারা ফরায়েযীদেরকে 'তাইউনী হাল' বলা যায়। এই বিষয়ে একমাত্র উপসংহার টানা যায় যে, ফরায়েযীগণ আন্দোলনের শুরুতে নিজেদেরকে সম্ভবত 'তাইউনী হাল' হিসাবে পরিচিতি দিত, যাতে করে এদেরকে হানাফী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। এবং অন্যদিকে তাদেরকে যাতে করে 'লা মযহাবী' বলা না যায় । এ ক্ষেত্রে ফরায়েযীদের ঘোর বিরোধী মওলানা কেরামত আলী ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলার 'তাইউনী' আন্দোলন শুরু করলে, স্বাভাবিক কারণেই ফরায়েযীগণ 'তাইউনী হাল' নাম ত্যাগ করে।

'রুবকারী' তে আরও দেখা যায় যে, ফরায়েযীদেরকে একটি আদালতে অভিযুক্ত করে তাদের নেতাদেরকে দণ্ড হিসাবে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে দুইশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর জেল প্রদান করা হয়। অনুসারীদেরকে একই দণ্ড দেয়া হয় এবং প্রত্যেককে একশত টাকা জরিমানা করা হয়। শেষে হাজী শরীয়তুল্লাহ নিজে পুলিশের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে মুক্তি দেয়া হয় এবং শান্তি রক্ষার কবচ হিসাবে এক বছরের জন্য ২০০ টাকা আমানত হিসাবে রাখা হয়।[৬৫]

---

৬২ দেখুন বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ, 'Research in the Islamic Revivalisms of the Nineteenth century and its effect on the Muslim Society of Bengal' Social research in East Pakistan edited by Pirre Bassaignet, ASP, Dacca, 1960, পৃ. ৩৩ ও পর এবং ৩৯ ও তারপর।

৬৩ দেখুন, ঐ, পৃ. ৫৬ এবং James wise. Eastern Bengal, পৃ. ৭।

৬৪ দেখুন, James wise. Eastern Bengal, পৃ. ৭ এবং মওলানা কেরামত আলী, হুজ্জত ই কাতি, পৃ. ৮৭-৮৮।

৬৫ দেখুন, JASP. ৬ষ্ঠ ভলিউম পৃ. ১২৪।

এই ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বিহারীলাল সরকার বলেন, '১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফরিদপুরের শরীয়তুল্লাহ একটি গ্রাম আক্রমন করে লুট করে। ঐ গ্রামের এক ব্যক্তি ফরায়েযী মতবাদ গ্রহণ না করায় এই আক্রমনের ঘটনা ঘটে।[৬৬] অন্যদিকে ফরায়েযীগণ অভিযোগ করে যে শক্তিশালী হিন্দু জমিদারগণ এই সংঘর্ষের এবং মামলার সূত্রপাত ঘটায়। দুই বিরোধী মুসলিম দলের মধ্যে বিরোধ ছড়িয়ে পড়ত না যদি জমিদারগণ উস্কানী প্রদান না করত। ফরায়েযীগণ আরও মনে করে যে ঘটনাটি নয়া বাড়িতে (বর্তমানে ঢাকা জেলার চারিগ্রাম) ঘটেছিল এবং প্রভাবশালী জমিদারগণ বিচারে প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৬৭]

জেমস্ ওয়াইজ মনে করেন[৬৮] হিন্দু জমিদারগণ নতুন মতাদর্শ প্রসারে সংকিত হয়ে উঠে। নতুন মতাদর্শ মুসলিম কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে। সংঘর্ষ এবং বিতর্কের সৃষ্টি করে। ঢাকা জেলার নয়াবাড়িতে বসতি স্থাপনাকারী শরীয়তুল্লাহকে উৎখাত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয়বার মক্কা থেকে আসার পর শরীয়তুল্লাহ নয়াবাড়িতে বেশ কিছু অনুসারী পান। তিনি নয়াবাড়ি প্রায়ই পরিদর্শন করতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর অনুসারীগণ এখানে একটি ঘর তৈরি করে। কালক্রমে নয়াবাড়ি ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচারের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

উক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বিহারী লাল সরকার হাজী এবং তাঁর অনুসারীদের অভিযুক্ত করেন। তাঁর এই মত একপেশে এবং হিন্দু জমিদারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের নিমিত্তও বলা যায়। দুর্ভাগ্যবশত মামলার বিশদ বিবরণ আমাদের কাছে নেই। নয়াবাড়ি ঘটনা একটি বিষয় প্রমাণ করে যে, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযী আন্দোলন একদিকে রক্ষণশীল মুসলিমদের সঙ্গে অপর দিকে হিন্দু জমিদারগণের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এরপর যতোই সময় গড়াতে থাকে ততোই সংঘাত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। সনাতন পন্থীদের সঙ্গে হাজীর সংঘাতের কারণ সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। পরবর্তী সময়ে রক্ষণশীল মনোভাবকে তাইউনী নেতা মওলানা কেরামত আলী ব্যবহার করেন। ফরায়েযীদের সঙ্গে বহুসংখ্যক বিরোধের সময় তিনি তা ব্যবহার করেন। ফরায়েযী এবং তাইউনীদের সম্পর্কের বিষয়ে এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই। এটা বলা যথেষ্ট যে 'বাহাস' বা জনসমক্ষে বিতর্কের মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রায়ই প্রকাশ পায় এবং এইভাবে ফরায়েযীগণ শক্তিশালী ধর্মীয় ভাতৃত্ববোধের মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে শরীয়তুল্লাহর সংঘাতের কারণ সহজেই পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শুরুতে মুসলিম কৃষক শ্রেণীর দুর্বলতার সুযোগ হিন্দু জমিদারগণ এই শ্রেণীর উপর নানা ধরনের বাধা নিষেধ এবং অবৈধ করারোপ করে। জমিদারগণ

---

৬৬ বিহারীলাল সরকার : তিতুমীর, কলিকাতা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩।

৬৭ এই ধরনের গল্প শরীয়তুল্লাহর পরিবারে প্রচলিত আছে। তা ছাড়া নয়াবাড়ির ফরায়েযী খলিফাদের মধ্যে ও এই ধারণা বিদ্যমান।

৬৮ James wise : Eastern Bengal পৃ. ২২।

৬—

তাদের এলাকায় গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণ ছাড়াও নানা ধরনের পৌত্তলিক কর ধার্য করে[৬৯] যা মুসলিম সমাজের জন্যে তিক্তকর অভিজ্ঞতা।

ইসলামী পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তুল্লাহ জমিদারগণের নিবর্তনমূলক করসমূহের বিরোধিতা করেন, বিশেষ করে যেগুলোতে পৌত্তলিকতা বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু শরীয়তুল্লাহকে ফরায়েযীগণ তাদের নেতা এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করায় স্বাভাবিক কারণেই ফরায়েযীগণ জমিদারগণের অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। সুতরাং হাজী শরীয়তুল্লাহ্ জিমদারদের নির্যাতন থেকে ফরায়েযীদের রক্ষা করার লক্ষ্যে সকল পৌত্তলিক কর পরিশোধ না করার জন্য অনুসারীদের নির্দেশ দেন এবং ইদুল আজহার সময়ে গরু জবাই করতে বলেন, যা সে সময়ের বাংলায় ছিল সবচেয়ে সস্তা এবং সুবিধাজনক। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুরুতে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনরূপে শুরু হওয়া বিষয়টি, একটি সামাজিক প্লাটফরমে পরিণত হয়। ফরায়েযীদের সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের সংঘাত আর্থ-সামাজিক প্রকৃতির ছিল শরীয়তুল্লাহর বিরোধীরা এটাকে ধর্মান্ধতা বললেও, আসলে তা ছিল না।

জমিদারগণ তাৎক্ষণিকভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ গৃহীত নীতির বিরোধিতা করে। পূজা পার্বনের জন্য ধার্যকৃত কর আদায় না হওয়ায় তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত লাগে এবং গো- হত্যা চালু হওয়ায় জমিদারগণ মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পূজা কর না দেয়ার ফরায়েযী নীতি জমিদারদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল পুলিশ প্রধান এই বিষয়টি যাচাই করেন।[৭০] গো-হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার একজন হিন্দু ভদ্রলোক ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় পত্রিকা 'দর্পণ' এর সম্পাদককে চিঠি লিখেন, আর শ্রুত হওয়া গেল শরীতুল্লাহর দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তর্গত পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিনীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেব দেবীর পূজার আঘাত জন্মাইয়া গো-হত্যা ইত্যাদি কু-কর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের (রবার্ট গ্রোট) হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক একজন জবনকে কারাগারে বন্দি করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিচক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন।[৭১]

উক্ত চিঠির লেখক হাজী" শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীদের কার্যকলাপের একটি ভয়ানক চিত্র তুলেধরেন। প্রথমত লিখেন যে হাজী শরীয়তুল্লাহ একটি রাজ্য বা বাদশাহী স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১২, ০০০ তাঁতি এবং মুসলমানদের জড় করেন। তিনি নতুন একটি ধর্মীয় মতাদর্শের পথ ও তাঁর অনুসারীদের দাঁড়ি রাখতে বলেন। তা ছাড়া ধূতি দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে না টেনে 'কাচা খোলা' রেখে পড়তে বলেন। তাঁর অনুসারীগণ কোমরে গরুর চামড়া তৈরি বেল্ট পরিহিত অবস্থায় হিন্দু বাড়িতে গিয়ে দেব দেবীর পূজা করার বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, চিঠি লেখক ফরায়েযীদের

---

৬৯ দ্রষ্টব্য, James wise : Eastarn Bengal, পৃ. ২৪।
৭০ দেখুন, Calcutta Review, Calcutta, 1844 vol. I, পৃ. ২১৫-১৬।
৭১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা কলিকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, খন্ড-৩, পৃ. ৩১১-৩১২।

অভিযুক্ত করে লিখে যে, ফরায়েযীগণ দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয়ের তৈরি ১২ টি শিবলিঙ্গ ধ্বংস করে। ঢাকা জেলার রাজনগরে এই ঘটনা ঘাটে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তৃতীয়ত ফরিদপুর কোর্টের সকল করণিক বা আর্মলা এবং মোক্তারগণ হাজী শরীয়তুল্লাহর অনুসারী ছিল। সুতরাং ১২০০০ সংঘবদ্ধ ফরায়েযী আদালতে মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা কোনো মামলা প্রমাণ অথবা অপ্রমাণ করতে পারত বলে চিঠি লেখক মনে করেন।[৭২]

চিঠির লেখক হাজী শরীয়তুল্লাহকে তিতুমীরের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর মতে তিতুমীরও নিজের এলাকায় একটি রাজ্য বা বাদশাহী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। হিন্দুদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে সরকার তাঁর প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয়। লেখকের মতে হাজী শরীয়তুল্লাহর বিরুদ্ধে একই ধরনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তাঁর মতে শরীয়তুল্লাহর বিরুদ্ধে আরও কঠিন ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কারণ তিতুমীর শরীয়তুল্লাহর চেয়ে একশত ভাগের একভাগ অপরাধ করেছিল।[৭৩] পত্র লেখক বলেন 'আমি বোধ করি শরীয়তুল্লাহ যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবে।[৭৪] তাই তিনি 'দর্পণ' সম্পাদক এবং মি: গ্রোটকে অনুরোধ করেন যাতে করে শরীয়তুল্লাহর দলকে নিরস্ত্র করা হয় এবং হিন্দু ধর্ম ও দেশকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা হয়।[৭৫] ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে শরীয়তুল্লাহর আর এক জন সমসাময়িক জেমস্ টেইলর (ঢাকার সিভিল সার্জন) লিখেন যে, ঠিক দু'বছর পর হাজীকে একাধিকবার পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়। শহরে সংঘাত এবং গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগে তা করা হয়। সম্ভবত ফরিদপুর শহরকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন 'হাজী বর্তমানে পুলিশের নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছেন। আমি মনে করি রাজস্ব না দেওয়ার জন্য অনুসারীদের উত্তেজিত করার কারণে তা ঘটেছে।[৭৬] এটা সুপরিকল্পিত বিষয় যে হাজী শরীতুল্লাহ হিন্দুদেরকে পূজা পালন অথবা চাঁদা প্রদান করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মতে এগুলো পালন করা ইসলামের একত্ববাদকে অস্বীকার করা । টেইলর বর্ণিত রাজস্ব না দেওয়ার বিষয়টি সম্ভবত বিভিন্ন পৌত্তলিক কর যেমন 'কালিবৃত্তি' 'দুর্গা বৃত্তি'কে বুঝানো হয়েছে। কারণ বৈধ রাজস্ব পরিশোধ না করার বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই মতটি ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের বেঙ্গল পুলিশ প্রধানের রিপোর্টেও প্রতিফলিত হয়েছে।[৭৭] উল্লেখ্য যে, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে শরীয়তুল্লাহ'র পুত্র দুদু মিয়া মক্কা থেকে ফিরে আসেন এবং ফরায়েযীদেরকে একটি সুসংঘবদ্ধ দলে পরিণত করেন। তাছাড়া এদেরকে লাঠিবাজি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে বেশ কিছু বাড়ি লুট করার অভিযোগে পুলিশ দুদু মিয়াকে অভিযুক্ত করে।[৭৮] উপরোক্ত প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে হাজী শরীয়তুল্লাহর শেষ জীবনে ফরায়েযী

---

৭২ ঐ, পৃ. ৩১২।

৭৩. ঐ, পৃ. ৩১১-১২। 'আমি বোধ করি শরীতুল্লাহ যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক'।

৭৪. ঐ।

৭৫. ঐ।

৭৬. James Taylor, Topography, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০।

৭৭. দ্রষ্টব্য, CalCutta Review, খণ্ড-১, পৃ. ২১৫ থেকে।

৭৮. James wise, Eastern Bengal, পৃ. ২৫।

কৃষকদের সঙ্গে হিন্দু জমিদারগণের বিরোধ বাড়তে থাকে। সম্ভবত ফরায়েযীদের অধিকার আদায়ে দুদু মিয়ার নেতৃত্বের কারণে তা হয়েছিল। কিন্তু সহিংস সংঘাত এবং বড় ধরনের সংঘর্ষ যা কয়েক বছর পর ফরায়েযীদের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, তা হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবদ্দশায় দেখা যায়নি ; দুদু মিয়ার নেতৃত্বেই তা ঘটেছিল। যদি হাজী সাহেবের জীবিতকালে বড় ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটত, তাহলে তা ১৮৩৮, ১৮৪২ এবং ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের পুলিশ রিপোর্টে বিশেষ গুরুত্ব পেত।[৭৯] এমনকি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না, যখন আদালতে তাঁর বিচার করা হয়েছিল।[৮০]

হাজী শরীয়তুল্লাহ সূচিত আন্দোলনের চরিত্র

জমিদারদের সঙ্গে হাজী শরীয়তুল্লাহর সংঘষ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও বলা যায় যে, তিনি রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, অথবা এটাও বলা যায় না যে, প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওয়াইজ এবং বেভারিজ সুস্পষ্ট-ভাবেই উক্ত ধারণাকে নাকচ করেছেন । ওয়াইজ বর্ণনা করেছেন যে, হাজীর আন্দোলন 'রাজনীতি আশ্রিত ছিল না' এবং নয়াবাড়ি ঘটনার পর (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস) হাজী সাহেব 'অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ করেন এবং ধর্মীয় সংস্কার ব্যতীত অন্য কিছু করেননি।[৮১] বেভারিজ বলেন, [৮২] এটা প্রতীয়মান হয় না যে, ফরায়েযীগণ ওয়াহাবীদের মতো বিপদজনক রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করে। জমিদারদের ধার্যকৃত খাজনা সম্পর্কে বিতর্ক করা ছাড়া তাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অন্য কিছু ছিল না। হিন্দু জমিদার এবং তাদের সমর্থকগণ ফরায়েযীদেরকে রাজনৈতিকভাবে বিপদজনক মনে করে। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ ব্যতীত আমরা এটা গ্রহণ করতে পারি না। যদিও সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে ফরায়েযীদের মধ্যে উদ্দীপনা বেশী ছিল। এটা তাদের চরিত্রের জন্য অপরাধ হতে পারে না।

উপরোক্ত প্রমাণাদিতে প্রতীয়মান হয় যে হাজী বৈধ একজন ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবেই থাকতে চেয়েছেন। সুতরাং পুলিশ তাকে আটক করলেও তার কোনো অপরাধ প্রমানিত হয়নি। রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য নয় বরং নির্যাতিত কৃষকদের উপর অবৈধ কর ধার্য করায় অত্যাচারী জমিদারগণের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, সে জন্যেই তাকে পুলিশ আটক করে ছিল। তিনি যদি ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতেন, তাহলে ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিত, যেমনটি তাঁর সমসাময়িক তিতুমীরের বেলায় ঘটেছিল।[৮৩] সুতরাং এটা বলা যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ সূচিত সংস্কার আন্দোলনটি রাজনৈতিক ছিল না বরং তা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয়।

---

৭৯. দ্রষ্টব্য, ঐ, ও Calcutta Review, vol. I, পৃ. ২১৫ থেকে।
৮০. দ্রষ্টব্য, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫।
৮১. ঐ, পৃ. ২২।
৮২. H.Beveridge : District of Bakergang, পূর্বোক্ত পৃ. ২২৫।
৮৩ বর্তমান লেখকের 'The Struggle of Titumir, A re-xaminatian, JASP. vol. iv, 1959 পৃ. ১১৩ থেকে

হাজী শরীয়তুল্লাহর চরিত্র

তিতুমীরের মতোই হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলিম সমাজের সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে তিতুমীরের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এই কারণেই তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে পেরেছিলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর ছিল জীবনযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। তাই তিনি জানতেন কিভাবে তাঁর আন্দোলনকে ষড়যন্ত্র এবং উত্তেজনার ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানকাল পর্যন্ত ফরায়েযী আন্দোলনের উত্তরণের অন্যতম কারণ ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা যা এই আন্দোলনকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে পেরেছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহর ছিল দৃঢ় এবং বিনম্র ব্যক্তিত্ব। জেমস্ ওয়াইজের মতে তাঁর ছিল মাঝারি উচ্চতা, গৌরবর্ণ ও লম্বা বিস্তৃত শ্মশ্রু।[৮৪] তাঁর ছিল শক্তিশালী ও ঋজু দেহ। তা ছাড়া তিনি তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড একটি পাগড়ি ব্যবহার করতেন।[৮৫] জনশ্রুতি অনুযায়ী হাজী শরীয়তুল্লাহর অবয়ব ছিল সুন্দর এবং ভিন্নধর্মী, যা তাঁর অন্তরের নম্রতা এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি ছিল। ওয়াইজ মনে করেন যে তার মধ্যে সমাজ 'একজন সহানুভূতিশীল এবং নিষ্ঠাবান প্রচারক' পেয়েছিল যাঁর মাধ্যমে বাংলার কৃষক শ্রেণী উৎসাহিত হয়েছিল। তিনি মনে করেন শরীয়তুল্লাহর মতো অন্য কেউই কৃষকদের নিকট দৃঢ়ভাবে আবেদন করতে পারেনি। তার ছিল নির্দোষ এবং অনুকরণীয় জীবন।[৮৬] ওয়াইজের মতে হাজী নিজের উত্থানের চেয়ে বাংলার মুসলমানদেরই জাগিয়ে তোলা ছিল 'অধিক আশ্চর্যজনক'। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের নিচু এলাকায় প্রথম প্রচারক যিনি ইসলামের শুদ্ধবাদী মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন।[৮৭]

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর নিজের গ্রাম শামাইলে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ৫৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে তার বাসস্থানের পেছনে প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। যা তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর আড়িয়াল খাঁ নদীর প্রবাহে ভেসে যায়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে (ঢাকা) সংরক্ষিত তাঁর সমাধি শিলালিপিটিই শুধু আমাদের কাছে রয়েছে।[৮৮]

৮৪ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩।
৮৫ হাজীর পরিবারে এই ধরণের ঐতিহ্য প্রচলিত।
৮৬ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩।
৮৭ ঐ।
৮৮ দেখুন, JASP, vol. 4 পৃ. ১৮৭ থেকে।

চতুর্থ অধ্যায়

মোহসিন উদ্দীন আহমদ প্রকাশ দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২)

মোহসিন উদ্দীন আহমদ প্রকাশ দুদু মিয়া[১] ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহর একমাত্র পুত্র। কেউ কেউ তাকে ফরায়েযী আন্দোলনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকেন।[২] তিনি ১৮১৯[৩] খ্রিস্টাব্দে মুলফতগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে এই স্থানটি বাকেরগঞ্জ জেলার মাদারীপুর মহকুমার একটি থানা ছিল, যা পরবর্তীতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও তিনি তাঁর পিতার মতো জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি, তা সত্ত্বেও তিনি ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাসে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতাকে ছাড়িয়ে যান। বিশেষ করে ফরায়েযীদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তিনি এই সম্প্রদায়কে একটি শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে পরিণত করেন।[৪]

১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ সময়ে দুদু মিয়ার উদ্যমী কর্মজীবন। তাঁর বিরোধীদের কাছে ছিল ভীতিময় এবং বন্ধু ও অনুসারীদের নিকট ছিল তা পরিত্রাণের মতো। অত্যাচারী ও শোষক জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী পদক্ষেপ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আদালত নথি এবং পুলিশ রেকর্ডে এই সকল কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর কর্মজীবন নিয়ে বেশ কয়েকটি পুঁথি লিখিত হয়েছে। কালের গর্ভে এই সকল উপাদান অধিকাংশ বিলীন হয়ে গিয়েছে। সৌভাগ্যবশত ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক ফৌজদারী মামলার বিবরণী আমাদের হাতে রয়েছে।[৫] এ ছাড়া বেশ কিছু আদালতের নথি, পুলিশ রেকর্ডে, সরকারি রিপোর্ট, দুরর, দুরর ই মোহাম্মদ এর পুঁথি, যা নাজিম আলদীন এবং ওয়াজির আলী কর্তৃক লিখিত, এবং সবশেষে কেরামত আলী জৌনপুরীর বিভিন্ন লেখা রয়েছে। এই সকল

---

১ তাঁর পারিবারিক পরিধিতে তাকে আদর করে দুদু মিয়া ডাকা হোত। যে নামটি পরবর্তী জীবনে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ওয়াইজ তাকে 'দুদু মিঞা' হিসেবে লিখেছেন (দ্রষ্টব্য James wise, Eastern Bengal) পৃ. ২৮। অন্যরা তাঁকে 'দুদু মিয়া'বলেছেন (দ্রষ্টব্য, H, Beveridge: District of Bakergong, পুর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪) অথবা 'দুদু মিয়ান' (দ্রষ্টব্য, কেরামত আলী : হুজ্জত, পৃ. ৮৬) তার অনুসারীগণ তাকে উস্তাদ দুদু মিয়ান অথবা মওলবী দুদু মিয়া 'হিসাবে স্মরণ করে থাকে। অনুসারীগণ তাকে শুধু 'উস্তাদ' বা মওলবী বলে থাকে। তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করার সময় সাধারনত মোহসিন উদ্দীন আহমদ উরুফে দুদু মিঞা 'লিখতেন। সর্বশেষ বানানটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

২ উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, এইচ বেভারিজ দুদু মিঞা এবং তাঁর পিতা শরীয়তুল্লাহকে ফরায়েযী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। H.Beveridge, District of Barisal, পৃ. ২৫৪।

৩ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩। Trail of Dudu Miyan, পৃ. ৪ এর সঙ্গে তুলনীয়। এখানে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জুলাইতে তাঁর বয়স ২৮ বছর উল্লেখিত হয়েছে।

৪ এই বিষয়টি গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৫ Trail of Dudu Miyan, পৃ. ৩৫৪ ও এই গ্রন্থের ১ম অধ্যায়।

বিবরণীতে ও উপাদানে দুদু মিয়ার বর্ণাঢ্য কার্যকলাপের চিত্র পাওয়া যায়। নিম্মোক্ত জীবনী রচনায় এ সব উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে।

শিক্ষা জীবন

দুদু মিয়া পিতার যত্নে তাঁর শৈশব যাপন করেন। তাঁর পিতা তাকে বাড়িতে আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষাদান করান। প্রাথমিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের পর বার বছর বয়সী দুদু মিয়াকে মক্কায়[৬] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়।[৭] প্রচলিত ধারণা মতে দুদু মিয়া মক্কা যাওয়ার পথে কলিকাতায় কিছু দিনের জন্য অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত গ্রামের বাড়িতে তিতুমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৮] মক্কায় তাঁর কার্যকলাপের অথবা অবস্থানের সময় সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। প্রচলিত ধারণা মতে তিনি পাঁচ বছর পর বাংলায় ফিরে আসেন।[৯] ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারি তথ্যে দুদু মিয়া সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য করা হয়।[১০]এই তথ্যে তাঁকে ফরিদপুর অঞ্চলের শান্তি বিনষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে ধারণা করা হয় যে, তিনি আরও আগেই ফিরে আসেন। এরপর থেকে দুদু মিয়া তাঁর পিতার দলে থাকেন এবং শরীয়তুল্লাহ'র কাছে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। দুদু মিয়ার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে এতটুকুই জানা যায়।

লাঠিয়াল বাহিনীর সংগঠক

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, শরীয়তুল্লাহ তাঁর জীবনের শেষের দিকে হিন্দু জমিদারগণের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এর ফলে জমিদার এবং তাঁর অনুচরদের হাত থেকে ফরায়েযী কৃষকদের রক্ষা করার জন্যে দক্ষ লাঠিয়াল বাহিনীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাজী শরীয়তুল্লাহ লাঠিয়াল সংগ্রহ করার জন্য তাঁর প্রভাবশালী অনুসারী ফরিদপুরের জালাল উদ্দীনকে দায়িত্ব দেন।[১১] মক্কা থেকে ফেরার পর দুদু মিয়া জালাল উদ্দীনের সঙ্গে হাত মেলান এবং লাঠিয়ালদের নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি লাঠিয়ালদের নিয়ে একটি বড় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন এবং এদেরকে দক্ষ যোদ্ধায় পরিণত করেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে কেন পুলিশ দুদু মিয়াকে ঘরবাড়ি লুটের জন্য অভিযুক্ত করেছিল।[১২] জেমস্ টেইলর মন্তব্য করেন যে, পুলিশ হাজী শরীয়তুল্লাকে ১৮৩১

---

৬ M.Hidayet Hossain : 'Faraidi' Encyclopaedia of Islam, Ist edition, vol. vii পৃ. ৫৮, ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৮ এবং James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩।

৭ দুদু মিয়ার পরিবারে প্রচলিত তথ্য।

৮ দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের স্থায়ী নিবাস বাহাদুর পুরে 'একটি তসবিহ সংরক্ষিত আছে। এটি পরবর্তী ফরায়েযী প্রধান বাদশাহ মিয়া কর্তৃক সনাক্ত করা হয়। বাদশাহ মিয়ার মতে 'তসবিহটি তিতুমীর উপহার হিসেবে দুদু মিয়াকে প্রদান করেন মক্কা যাওয়ার পথে দুদু মিয়া তা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতি হিসাবে ফরায়েযীদের প্রধানগণ সংরক্ষণ করেন।

৯ চাঁদপুরের ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত।

১০ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৮।

১১ শরীয়তুল্লাহ এবং জালাল উদ্দীনের পরিবারে প্রচলিত ধারণা।

১২ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫।

খ্রিস্টাব্দের দিকে তাদের নজরে রাখে।[১৩] এ সম্পর্কে আরও দেখা যায় যে, দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনী ঐ সময়ের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। দুদু মিয়ার ছিল প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি এবং কূটনৈতিক জ্ঞান। তিনি ইসলামের অনুশাসনের চেয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধান হিসাবে দুদু মিয়ার ভূমিকা

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে হাজী শরীয়তুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তখন ফরায়েযীগণ মিলিত হয়ে দুদু মিয়াকে তাদের উস্তাদ বা প্রধান হিসাবে স্বীকার করে। এই নির্বাচন দুদু মিয়ার কর্মজীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাসেও তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর দুদু মিয়ার অপ্রতিরোধ্য শৌর্য প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁর পিতা হাজী শরীয়তুল্লাহ এতদিন তাঁর রশি টেনে ধরেছিলেন।[১৪] তিনি চিন্তা করেন যে, ফরায়েযী কৃষকদের উপর জমিদারদের উচ্চাভিলাষী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে গ্রামীণ বাংলার সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে জমিদারদের ইচ্ছাই বেশী কার্যকর ছিল।

১৮৪১ এবং ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া দুটি অভিযান পরিচালনা করেন। একটি অভিযান ছিল কানাইপুরের 'সিকদার' ও অপরটি ছিল ফরিদপুরের 'ঘোষ' জমিদারদের বিরুদ্ধে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ফরায়েযী কৃষকদের বিষয়ে জমিদারদের মনোভাব নমনীয় করা। দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীদের কাছে এ ছাড়া কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না। বল প্রয়োগ না করে যুক্তির মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়া ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই অভিযানগুলো সফলতা অর্জন করে। এর ফলশ্রুতিতে দুদু মিয়া আন্দোলনের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেন, যা ফরায়েযী আন্দোলনকে নবজীবন দান করে। এই অভিযানসমূহ নিম্নে আলোচিত হয়েছে ঃ ফরায়েযীগণ দাবি করে যে, 'সিকদার' এবং 'ঘোষ' জমিদারগণ তাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে। 'গো হত্যা' নিবারণের প্রচেষ্টা (ফরায়েযীগণ প্রকাশ্যে করত) এবং পৌত্তলিক আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কর আদায় অর্থাৎ 'দুর্গাপূজা' কালি পূজা'র (ফরায়েযীগণ এই ধরনের কর প্রত্যাখ্যান করে) জন্য কর আদায়ের লক্ষ্যে জমিদারগণ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নিযার্তনের আশ্রয় নেয়।

জেমস্ ওয়াইজ বলেন 'জমিদারগণ তাদের প্রজারা যাতে ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ না দেয়, সে উদ্দেশ্যে নির্দেশ অমান্যকারীদের শাস্তি ও নির্যাতন করে। অত্যাচারের পদ্ধতি ছিল বেদনাদায়ক। কিন্তু অত্যাচারের কোনো চিহ্ন পাওয়া যেতনা। এই পদ্ধতি উভয় পক্ষ থেকেই করা হতো। অবাধ্য প্রজার শ্মশ্রু বেঁধে নাকে নস্যি হিসাবে লাল মরিচের গুড়া দিত। অত্যাচার করা সত্ত্বেও জমিদারগণ এই আন্দোলনের প্রসার রোধ করতে ব্যর্থ হয়।[১৫]

---

১৩ James Taylor : Topography, পৃ. ২৫০।

১৪ J.E.Gastrell : Jessore, Fureedpore and Backergonge, পৃ. ৩৬ নং ১৫১। আভিধানিক অর্থে 'উস্তাদ' শব্দের অর্থ হলো 'শিক্ষক' যা ফরায়েযীগণ তাদের প্রধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বোধন করে থাকে।

১৫ James wise : Eastern Bengal. পৃ. ২৪।

ফরায়েযীগণ জমিদারদের নির্যাতনের উদাহরণ হিসাবে বেশ কয়েকটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে। এগুলো ছিল (১) নির্দয়ভাবে চাবুক মারা (২) বস্ত্রহীন শরীরে লাল পিঁপড়া ছড়িয়ে দেয়া (৩) ময়লা গর্তে বুক সমান শরীর দেবে রাখা (৪) নির্যাতিত ব্যক্তিকে শুইয়ে তাঁর পিঠে সাদা পিঁপড়া এবং ঝিল্লি পোকা উপুড় করা গামলা দ্বারা আট-কিয়ে রাখা।[১৬] এই সকল নির্যাতন দুদু মিয়া থেকে ফরায়েযীদের বিচ্ছিন্ন করতে না পেরে জমিদারগণ কুখ্যাত 'শ্মশ্রু কর' ধার্য করে। এই কর এরপূর্বে ২৪ পরগনা জেলায় তিতুমীরের অনুসারীদের উপর হিন্দু জমিদারগণ ধার্য করেছিল।[১৭] জমিদারদের এই নির্যাতন দুদু মিয়ার ধৈর্যের উপর আঘাত হানে। তিনি এই সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধে চুপ করে থাকা সমীচীন মনে করেননি।[১৮]

কানাইপুরের সিকদার (জমিদার) পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযান

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া এবং জালাল উদ্দীন মোল্লা কানাইপুরের দিকে অগ্রসর হন। তাদের সঙ্গে ছিল কয়েকশত লাঠিয়াল। এই দলটি জমিদারের প্রাসাদের নিকটবর্তী স্থানে জমায়েত হয়।[১৯] দুদু মিয়া জমিদারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, যদি ফরায়েযীদের সঙ্গে সমঝোতায় না আসে তাহলে জমিদার প্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে ফেলা হবে। সিকদার (জমিদার) অন্য কোন উপায় না দেখে সমঝোতায় উপনীত হন। জমিদার ফরায়েযীদের উপর শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করে এবং অবৈধ ও পৌত্তলিক কর আরোপ করা বন্ধ হবে মর্মে ঘোষণা দেয়।[২০]

ফরিদপুরের ঘোষ (জমিদার) পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযান

সিকদারদের বিরুদ্ধে সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে দুদু মিয়া ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ফরিদপুরের শক্তিশালী ঘোষ পরিবারের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন।[২১] পুলিশ রিপোর্টে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :

"রাত্রে পরিচালিত একটি আক্রমণের প্রকৃতি ছিল গুরুতর জয়নারায়ণ ঘোষেরা রায়ত কমপক্ষে ৮০০ ফরায়েযীর একটি দল তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে এবং সবকিছু লুট করে। এরপর তাঁর ভাই মদননারায়ণ ঘোষকে অপহরণ করে।[২২] ফরায়েযী উপাত্ত

---

১৬ চাঁদপুর এবং ফরিদপুরের ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত।

১৭ দেখুন। বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর, পৃ. ১৪, W.W.Hunter, Indian Musalmans. পৃ. ৪৫। পাদটিকা, ২ হান্টার বলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায় মাথা পিছু কর হিসাবে নতুন আদর্শের প্রতি অনুগতদের উপর ৫ শিলিং ধার্য করে। বিহারীলাল সরকার 'শ্মশ্রু' কর হিসাবে আড়াই টাকা উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, যে শরীয়তুল্লাহ এবং তিতুমীর উভয়েই দাঁড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। ফরায়েযীদের মতে হিন্দু জমিদারগণ কর হিসাবে আড়াই টাকা ধার্য করে।

১৮ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫।

১৯ এই প্রাসাদটি ফরায়েযীদের কাছে 'রাবন কুঠি' হিসাবে পরিচিত.

২০ ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস থেকে বিবরণ নেয়া হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাবে

২১ দেখুন Calcutta Review, vol. I (1844) পৃ. ২১৫-২১৬ মি : ডাম্পিয়ারের রিপোর্ট (১৮৪২) অংশ, 'Rural Population of Bengal.নিবন্ধ।

২২ ঐ।

অনুসারে দেখা যায় যে, মদন ঘোষকে হত্যা করে পদ্মা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়।[২৩] ওয়াজির আলী লিখেছেন[২৪]

"বারশ' সাতাইশ সন এই বাঙ্গালার
হিন্দুগণ শত্রু হল মোসালেম উপর ॥
গরীব লোকেরে কত মত সাজা দিত।
নাপীত বন্দ দাড়ি বাঁধা সাজা দেলাইত ॥
এই মত সাজা কত মোসলমান পাইল।
মদন ঘোষ জমিদারে মারিয়া ফেলিল॥
প্রকাশ করিয়া দিল খেয়েছি মদন ঘোষে।
সেই হইতে হিন্দুগণ পড়িল তরাশে ॥
ইসলামিতে বাধা দিতে না উঠিল মন।
সানন্দে এসলামি চলে বাড়িয়া তখন ॥

পুলিশ রিপোর্ট আরও লিখে যে এই আক্রমণ ফরায়েযী সম্প্রদায় একতা প্রমাণ করে। চারদিক থেকে ফরায়েযীগণ গোপনে হঠাৎ করেই জমায়েত হয় এবং আক্রমণের পর একইভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।[২৫] বেঙ্গল পুলিশ প্রধানের মতে এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেয়া। তিনি বলেন, ফরায়েযীগণ লুটের উদ্দেশ্যে নয় বরং অত্যাচার এবং জমিদার কর্তৃক করারোপের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই তা হয়েছে। ফরায়েযীদের দাখিলকৃত দরখাস্তে বর্ণিত অত্যাচারের এক দশমাংশ যদি সত্যি হয় তাহলেও ঘটনার ভয়াবহতার তীব্রতা কম দেখে আমি বিস্মিত তাদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। জমিদারগণ ফরায়েযীদের ধর্ম এবং জেনানাদের অবমাননা করার জন্য সব কিছুই করেছিল।[২৬] এরপর তিনি জেলার মেজিস্ট্রেটকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বলেন ঃ মেজিস্ট্রেটকে অবশ্যই কড়া নজর রাখতে হবে। শুধু ফরায়েযীদের উপর নয় জমিদারদের উপরও নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে হিন্দু জমিদারদের বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। পূজা খরচের জন্য ধার্যকৃত করসমূহ আদায় না করায়, হিন্দু জমিদারগণ যে কোন উপায়ে কর উসূল করতে যাওয়ায়, ফরায়েযীদের মধ্যে অসন্তোষ জাগ্রত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে (ফরায়েযীগণ) মনে করে যে এই সকল কর একজন নাস্তিককে প্রদান করা মানে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করা। যেখানে একজন জমিদার রায়ত সম্পর্কে কোনো বিবেচনা না রেখে, কর আদায়ের জন্য যে কোনো উপায় ব্যবহার করছে, সেখানে নির্যাতিতরা ক্ষুব্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাশিত।[২৭]

---

২৩ ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত।

২৪ ওয়াজির আলী মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৬-৭। "বারশ' সাতাইশ সন এই বাঙ্গালার হ্বন হিন্দুগণ শত্রু হল মোসলেম উপর" গরীব লোকেরে কত মত সাজা দিত। নাপীত বন্দ দাঁড়ি বাধি সাজা দেলাইত এই মত সাজা কত মোসলমান পাইল, মদন ঘোষ জমিদারে মারিয়া ফেলিল প্রকাশ করিয়া দিল খেয়েছি মদন ঘোষে সেই হইতে হিন্দুগণ পড়িল তরাশে ইসলামিতে বাধা দিতে না উঠিল মন সানন্দে এসলামি চলে বাড়িয়া তখন।

২৫ Calcutta Review, খণ্ড-১, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৫-১৬।

২৬ ঐ।

২৭ ঐ।

উক্ত ঘটনায় মেজিস্ট্রেট ১১৭ জনকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ১০৬ জনের বিচার হয়। শেষে ২২ জনকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।[২৮] প্রচলিত সূত্র অনুযায়ী দুদু মিয়াকে অভিযুক্ত করা হলেও সেশন জজ প্রমাণের অভাবে তাকে মুক্তি দেন।[২৯]

দুদু মিয়ার এই প্রারম্ভিক বিজয়ে সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করে। এর ফলে ভবিষ্যতে ফরায়েযী আন্দোলনের গতিপথ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথমত দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দুদু মিয়ার সম্মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কৃষক শ্রেণী তো তাকে তাদের পরিত্রাণ হিসাবে বিবেচনা করে। এর ফলে তার নাম জেমস ওয়াইজের ভাষায় 'ফরিদপুর, পাবনা, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালীর ঘরে ঘরে উচ্চারিত হতে থাকে।[৩০]

দ্বিতীয়ত এই ঘটনা ফরায়েযী আন্দোলনে বাড়তি শক্তি যোগায় এবং যে সকল মুসলিম এতদিন জমিদারগণের নির্যাতনের ভয়ে দূরে ছিল তারাও আন্দোলনে এগিয়ে আসে। সুতরাং এটা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বেঙ্গল পুলিশ দেখতে পায় যে, দুদু মিয়া প্রায় ৮০, ০০০ অনুসারীদের নেতা হিসাবে কৃষক সম্প্রদায়কে এক সূত্রে আবদ্ধ করেন এবং সকলের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেন।[৩১]

জমিদারগণের প্রতিক্রিয়া

জমিদারগণ ফরায়েযী আন্দোলনের ক্রমপ্রসারে আতংকিত হয়ে পড়ে। আন্দোলনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসাবে ইংরেজ প্রশাসক এবং নীলকরদের মনে আন্দোলন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। জমিদারদের প্ররোচনায় মাদারীপুর[৩২] নীল কুঠির প্রভাবশালী নীলকর মি. এন্ড্রু এন্ডারসন ডানলপ দুদু মিয়ার ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। জেমস ওয়াইজ বলেন মি. ডানলপ দুদু মিয়াকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করতে সক্ষম হন এবং তাকে অবৈধ কর্মকাণ্ডের জন্য বিচারের ব্যবস্থা করেন। জেমস ওয়াইজ আরও বলেন যে, দুদু মিয়াকে অবৈধ কার্যক্রম এবং সীমানা অতিক্রমের জন্য ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে এবং লুটের কারণে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিচার করা হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে উভয় মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পান।[৩৩] ফরায়েযীগণ যাঁরা অত্যাচারী জমিদারদের[৩৪] শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল তাঁরা ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মি.ডানলপের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার কোনো অভিযানের উল্লেখ করেননি। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযীরা মি. ডানলপের ব্রাহ্মণ

---

২৮ ঐ।

২৯ দুদু মিয়ার পরিবারে প্রচলিত তথ্য।

৩০ James wise : Eastern Bengal পৃ. ২৩।

৩১ W.W. Hunter, Indian Musalmans, পৃ. ১০০।

৩২ H. Beveridge : District of Bakergunj, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯।

৩৩ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫, ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিচারের সময় দুদু মিয়া কোর্টে বলেন যে, ১৮৩৯-১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে মি:ডানলপ তাঁর সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন আচরণ কখনোও বন্ধ করেননি এবং তাকে বিভিন্ন ফৌজদারী মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেন। Trail of Dudu Miyan, পৃ. ৪৭।

৩৪ উদাহরণস্বরূপ, Calcutta Review, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে লিখে যে, ফরায়েযীগণও যুদ্ধ করতে পারে। দ্রষ্টব্য, vol. II, 1847 খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার বক্তব্যের জন্য দেখুন, James wise, Eastern Bengal, পৃ. ২৫

গোমস্তাকে আক্রমণ করে। নিম্নে বর্ণিত জেমস্ ওয়াইজের বক্তব্যে দেখা যায় যে, জমিদার এবং নীলকরগণ দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে একই উদ্দেশ্যে জোট বেঁধেছিল। স্পষ্টই তা ছিল তাদের কায়েমী স্বার্থ, যা দুদু মিয়ার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ওয়াইজ বলেন, দুদু মিয়ার পিতার জীবদ্দশায় এই সম্প্রদায়টি দেশের আইনের সংস্পর্শে ছিল। তাঁর আন্দোলনের প্রকৃতির কারণে জমিদার এবং নীলকরগণ তাঁর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়।[৩৫] ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরের সরকারি প্রসিকিউটর স্বীকার করেন যে, মি.ডানলপ এবং (জমিদারগণ) রায়তদের মাঝে ফরায়েযী মতবাদ প্রসারে বাধা দেন। এর ফলে দুদু মিয়ার সঙ্গে সংঘষের সূত্রপাত ঘটে।[৩৬] দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে নীলকরদের অপপ্রচার গ্রহণ করার জন্য কলিকাতায় একটি মহল কান পেতে রেখেছিল। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে Calcutta Review লিখে '১৪ বছর আগে বারাসতে তিতুমীর যেভাবে সরকারকে বেগ দিয়েছিল ফরায়েযীগণ তাদের মতই একটি দল। এরা বর্তমানে দুদু মিয়ার নামের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ফরিদপুর, ঢাকা এবং বাকেরগঞ্জ জেলায় ব্যাপক প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। নিজেদেরকে মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে এবং হত্যা করা হলো দলের প্রধান কাজ। তাদের ঐ সকল কার্যকলাপ বিচার কার্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরায়েযীগণ নিম্ন বাংলায় গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যদিও এক কোম্পানি সিপাহী তাদের পরাজিত করতে পারবে। তা সত্ত্বেও রক্তপাত ছাড়া তাদের দমন করা সম্ভব হবে না।[৩৭]

জে.ই.গ্যাসট্রেল ছিলেন সার্ভেয়ার জেনারেল এবং রাজস্ব জরিপের সুপার । তিনি দুদু মিয়ার সমসাময়িক ছিলেন এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬২[৩৮] খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে যশোর, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জে জরিপ কার্যপরিচালনা করেন। এই কারণে তাঁর কাছ থেকে ফরায়েযী নেতা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য থাকা সম্ভব।

কিন্তু নিম্নে বর্ণিত তাঁর বক্তব্যে দুদু মিয়া সম্পর্কে যে তথ্য তিনি দিয়েছেন, তা সমসাময়িক কোন সূত্র থেকে প্রমাণযোগ্য প্রতীয়মান হয় না। তিনি বলেন দুদু মিয়া বেশ কয়েকবার অনুসারীদের আমানতের অর্থ তছরূপ করে, যা অনুসারীগণ তাঁর কাছে রেখেছিল। ঐ ছাড়া ধর্মীয় কাজের জন্যে তাঁর কাছে গচ্ছিত অর্থ দিয়ে সে নিজের জন্য জমি ক্রয় করে। এরপর সে একজন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই অভিযোগগুলোর একটির জন্য তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। সে অভিযুক্ত হয় এবং কারারুদ্ধ হয়।[৩৯] তিনি আরও বলেন '১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে কলিকাতায় স্থানান্তর করে নিরাপদে বন্দী রাখা হয় মহাবিদ্রোহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।[৪০]

---

৩৫ James wise, Eastern Bengal, পৃ. ২৪।

৩৬ Trail of Dudu Miyan, পৃ. ৩।

৩৭ Calcutta Review, vol-vii, জানু-জুন, ১৮৪৭, পৃ. ১৯৯ : Indigo in lower Bengal শীর্ষক নিবন্ধ। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত সংখ্যাটি ছাপাখানায় যাবার পর মাদারীপুরের পাঁচচর নীলকুঠিতে ফরায়েযীগণ আক্রমণ করেছিল। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে মি. ডানলপের কুঠিতে আক্রমণের খবরটি এই কারণে উল্লেখিত হতে পারেনি।

৩৮ J.E.Gastrell : Jassore, Furreedpore and Buckergonge প্রথম পাতা এবং পৃ. ৪৬।

৩৯ ঐ, ১৫১।

৪০ ঐ।

প্রথমত আমরা জেমস্ ওয়াইজ এবং পুলিশ রিপোর্টের মাধ্যমে জানি যে দুদু মিয়া কখনও দণ্ডপ্রাপ্ত হননি, যদিও তাকে অভিযুক্ত করে আদালতে মামলা চলেছিল। তাছাড়া তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কখনও জেলে বন্দী থাকেননি। তাকে রাজনৈতিক কারণে কলিকাতা স্থানান্তর করা হয়েছিল। জেমস্ ওয়াইজ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শেষ মামলার সময় তাকে কলিকাতার জেলে রাখা হয়। এই সময়ে শোনা গিয়েছিল যে, তাকে হয়ত মুক্তি দেয়া হবে। দুদু মিয়া যদি ৫০, ০০০ লোককে প্ররোচনা না দেয় অথবা তাঁর কথা ও হুকুম অনুযায়ী যেখানে সেখানে তৎপরতা না চালায়, তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হতে পারে।[৪১] দ্বিতীয়ত গ্যাসট্রেল ফরায়েযীদের একটি সূত্র ব্যবহার সম্পর্কে বলেন, 'নিম্নে বর্ণিত ফরায়েযীদের উত্থান সম্পর্কিত বিবরণ ফরিদপুর থেকে এই সম্প্রদায়ের একজন সদস্যের মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে।[৪২] সুতরাং একজন ফরায়েযীর কাছ থেকে তাঁর নেতা সম্পর্কিত কুৎসা আশা করা যায় না যদি সে কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে থাকে। অন্য দিকে জেমস্ ওয়াইজ বলেন যে, ফরায়েযীগণ শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন দিয়ে যায় যদিও একটি সময়ে তাঁর কিছু অনুসারী তার দল ত্যাগ করে। তবে এটা ঘটেছিল অন্য কারণে। জেমস্ ওয়াইজ বলেন, দুদু মিয়ার কিছু কার্যকলাপ তাঁর বেশ কিছু অনুসারীদের পছন্দ হয়নি। দুদু মিয়া একজন ব্রাহ্মণ মেয়েকে নিকাহ করার বিষয়টি উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। তা সত্ত্বেও দ্বিমত পোষণকারী অনুসারীগণ তাকে ত্যাগ করেনি। অন্যদিকে ফরায়েযীগণ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে যে তিনি সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তাদের কষ্টার্জিত অর্থ মুক্ত হস্তে ব্যয় করেছেন। একটি সময়ে কিছু অনুসারী তাঁর দলত্যাগ করে। দলত্যাগীগণ মক্কায় গমন করে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে মওলানা কেরামত আলীর শিক্ষা ছিল গোড়াপন্থী অন্যদিকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা হলেন ওহাবী মনোভাবসম্পন্ন এবং গোড়াপন্থী।[৪৩]

উপরন্তু গ্যাসট্রেল একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হওয়ায় তাঁর ভ্রমাত্মক মত পরবর্তী সময়ের লেখকদের বিভ্রান্ত করে। এদের মধ্যে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার[৪৪] অন্যতম। এভাবে দুদু মিয়া ও ফরায়েযীদের বিরোধী পক্ষ ইংরেজ কর্মকর্তাদের কানভারী করার প্রয়াস পায় এবং সফল হয়।

পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি ও ফরায়েযী সূত্রসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৪১ ও ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাগুলোর পর জমিদারগণ ফরায়েযীদের ভয়ে হিংসাত্মক কোনো ঘটনায় না জড়িয়েও ফরায়েযী বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত ছিল। মি.ডানলপের ব্রাহ্মণ গোমস্তা ছিল কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলাল। মুলফতগঞ্জ থানার পাঁচচর নীলকুঠির এই গোমস্তা ফরায়েযীদের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে। ফরায়েযী সূত্রানুসারে এই ব্যক্তি দুদু মিয়ার ঘোর বিরোধী ছিল। তাঁর ইংরেজ মালিকের ছত্রছায়ায় সে ফরায়েযীদের উপর অত্যাচার

---

৪১ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫।

৪২ Jassore, Furreedpore, and Buckergonge : পৃ. ৩৬, নং ১৫১।

৪৩ James wise, Eastern Bengal, পৃ. ২৫-২৬।

৪৪ Imperial Gazetteer of India তে হান্টার গ্যাসট্রেল এর বক্তব্য প্রায় হুবহু পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি লিখেন 'এই ব্যক্তি (দুদু মিয়া) তাঁর অনুসারীদের আস্থা নষ্ট করেছে। তহবিল তছরুপের জন্য অভিযুক্ত করা ছাড়াও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। একাধিকবার তাকে বৃটিশ আদালত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে' খণ্ড-৪, পৃ. ৩৯৯

অব্যাহত রাখে।[৪৫] ফরায়েযীগণ মনে করে যে, কালি প্রসাদ ছোট জমিদারের মতোই আচরণ করে এবং নীল চাষীদের উপর নির্যাতন করে। চাষীদের অনেকেই ছিল ফরায়েযী। সে ফরায়েযী চাষীদের উত্তম ধানী জমিগুলোতে নীলচাষ করার জন্য নির্দেশ দেয়। অবাধ্য চাষীদেরকে মরিচের গুড়া দিয়ে তৈরি নৈস্য দিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে এবং 'শ্মশ্রু কর' ধার্য করে।[৪৬] জমিদারগণের সঙ্গে বিরোধের সমঝোতা হওয়ার পর দুদু মিয়া এই কুখ্যাত গোমস্তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। দুদু মিয়ার একজন প্রভাবশালী অনুসারী নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী কাদির বখস জানকে গোমস্তার বিপক্ষে অভিযান পরিচালনা করার জন্য নির্দেশ দেন। এই সময় দুদু মিয়া মেজিস্ট্রেটসহ গ্রামে যান বুনো মহিষ ষাড় শিকার করার জন্য।[৪৭] জেমস্ ওয়াইজ যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ[৪৮]

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সশস্ত্র ব্যক্তিদের একটি বড় দল পাঁচচর নীলকুঠি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো তছনচ করে স্থান ত্যাগ করে।[৪৯] ব্রাহ্মণ গোমস্তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং বাকেরগঞ্জ জেলায় তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এই বিষয়ে বেভারিজ এর সঙ্গে ওয়াইজের বিবরণের মিল রয়েছে। বেভারিজ একজন মেজিস্ট্রেটের চিঠির উপর ভিত্তি করে লিখেন যে, কাঞ্জিলালের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে সাগরে ভাসিয়া দেয়া হয়।[৫০] সুতরাং প্রচলিত কাহিনীতেও কাঞ্জিলালকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস দেখা যায়।

জেমস্ ওয়াইজের মতে মি.ডানলপের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার অভিপ্রায় থেকেই এই আক্রমণ সূচিত হয়েছিল। ওয়াইজ আক্রমণের তাৎক্ষণিক কারণ সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু দুদু মিয়ার সঙ্গে মি.ডানলপের শত্রুতার কথা উল্লেখ করেন। এই কারণে দুদু মিয়া অনুচরদেরকে তাঁর নির্দেশ পালন করতে বলেন।[৫১]

যাহোক, আমরা দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার কার্যবিবরণী থেকে জানতে পারি যে, ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র তারিখে পাঁচচর ঘটনার দুইমাস ২০ দিন পূর্বে বাহাদুর পুরে একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। পাঁচচর ঘটনা ঘটেছিল ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ২১ শে অগ্রহায়ণ। বাহাদুরপুরে মি.ডানলপের গোমস্তা এবং পাঁচচরবাসী হিন্দু বাবুগণ জমিদারগণ ৭০০ থেকে ৮০০ সশস্ত্র ব্যক্তি নিয়ে দুদু মিয়ার বসতবাড়ি আক্রমণ করেছিল। সেশন জজের কাছে দেয়া জবানবন্দীতে দুদু মিয়া বলেন, তাঁরা আমার বাড়ির সম্মুখের দরজা ভেঙ্গে ৪জন প্রহরীকে হত্যা করে এবং অন্যান্যদেরকে মারাত্মভাবে আহত করে। তারা নগদ একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পদ লুট করে।

---

৪৫ দেখুন.H.Beveridge : District of Bakergonge, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৯৯ এবং ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পূর্বোক্ত পৃ. ৮।

৪৬ ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে।

৪৭ Trail of Dudu Mia, পৃ. ৪৮।

৪৮ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫, বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Trail of Dudu Miyan, গ্রন্থে গৃহীত বহুসংখ্যক বক্তব্য।

৪৯ গ্রামটির নাম ছিল শিমুলিয়া, দেখুন পূর্বের অধ্যায়।

৫০ H.Beveridge : District of Bakergonj. পৃ. ৩৪০।

৫১ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫।

মৃত ব্যক্তিদের গোপন করে এবং অবৈধ জমায়েতের অভিযোগ করে আহতদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। পুলিশ কর্মকর্তা আহতদেরকে মেজিস্ট্রেটের হাতে ন্যস্ত করে এবং অভিযোগ দায়ের করে। এদের মধ্যে আমির উদ্দীন হাসপাতালে মারা যায়। মেজিস্ট্রেট এই মামলায় কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। অন্যদিকে মি.ডানলপের দলের অভিযোগের ভিত্তিতে দারোগা বাহাদুরপুর অভিযোগ তদন্ত করার জন্য আসেন। দুদু মিয়ার অনুসারীদের অবৈধ জমায়েতের বিষয়ে তদন্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। দুদু মিয়ার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে বিরোধী পক্ষ দারোগাকে ঘুষ প্রদান করে এবং দুদু মিয়াকে অপহরণ করে পাঁচচরে নিয়ে যায়। ওখানে তাকে দুইদিন আটকিয়ে রাখে যাতে সে দারোগার কাছে কোন অভিযোগ নথিভুক্ত করতে না পারে। তদন্ত রিপোর্টে হিন্দু দারোগা হিন্দু জমিদারদের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতির কারণে উল্লেখ করে যে, দুদু মিয়া তদন্তকালীন সময়ে অনুপস্থিতে থাকে। দুদু মিয়া বলেন যে, তিনি পাঁচচর থেকে মুক্তি পেয়ে সরাসরি ফরিদপুর শহরে যান এবং এখানে মেজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন পত্র জমা দেন। কিন্তু মেজিস্ট্রেট সে আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। মেজিস্ট্রেট দুদু মিয়াকে পরামর্শ দেন লিখিত সমঝোতায় স্বাক্ষর প্রদানের জন্য। কিন্তু দুদু মিয়া এই প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখ্যান করায় মেজিস্ট্রেট তদন্ত করার জন্য রাজি হন এবং শিবচরের দারোগাকে রাস্তা মেরামতের জন্য নিদের্শ দেন।[৫২] এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দুদু মিয়া ঢাকা ও ফরিদপুর মেজিস্ট্রেটের কাছে তদন্তের জন্য চাপ দিতে থাকেন। এর মধ্যে প্রায় আড়াই মাস অতিক্রান্ত হয়। ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১৯ শে অগ্রহায়ণ পাঁচচর ঘটনার দুই দিন পূর্বে মেজিস্ট্রেট তাঁর সহচরদের নিয়ে ঢাকা থেকে গ্রামে যান। বন্য ষাড় শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি ঐ স্থানে গমন করেন। গ্রামে একটি তাবুতে তিনি কোর্ট স্থাপন করেন যেখানে দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীগণ ১৬ই অগ্রহায়ণ অপেক্ষা করছিল। ২০শে অগ্রহায়ণ মেজিস্ট্রেট একটি ষাড় শিকার করে ঢাকায় ফিরে যান এবং দুদু মিয়া অন্যান্যদের কথা দেন যে তিনি শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন এবং তাদের মামলা গ্রহণ করবেন। ২১শে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত দুদু মিয়া গ্রামে উপস্থিত থাকেন। উক্ত দিন সকালে পাঁচচর ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু যখন মেজিস্ট্রেট ফিরে আসেননি তখন দুদু মিয়া মেজিস্ট্রেটের অধস্তন কর্মকর্তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হন। ২২ শে অগ্রহায়ণ ভোরবেলা নৌকা যোগে দুদু মিয়া ঢাকায় পৌছেন। তিনি মেজিস্ট্রেটের বসতবাড়িতে পৌছানোর পর মেজিস্ট্রেট তাঁর প্রতি রুষ্ট হন। এর কারণ হিসাবে দুদু মিয়া বলেন তাঁর দাঁড়ি দর্শন করে কিছু মহিলা ভয় পেয়েছিল। মেজিস্ট্রেট তাকে গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন এবং তাঁর অভিযোগের শুনানী গ্রহণ করবেন বলে জানান। সুতরাং দুদু মিয়া পাড়া গ্রামে ফিরে আসেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট ২৩ শে অগ্রহায়ণ সেখানে যান। পাঁচচরের ঘটনায় দুদু মিয়ার কোন কিছু করার সুযোগ ছিল না। কারণ পাঁচচর ছিল পাড়া গ্রাম থেকে নৌকায় দেড় দিনের দূরত্ব । তা ছাড়া ঘটনা ঘটেছিল ২১শে অগ্রহায়ণ। যে ভাবেই হোক মি. ডানলপ

---

৫২ Trail of Dudu Miah, পৃ. ৪৭-৪৮ ; মামলার তদন্তকারী দারোগার নাম মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ (ঐ, পৃ. ১৪)

২৩শে অগ্রহায়ণ দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে মেজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেন।[৫৩] এই অভিযোগের বিষয়ে মেজিস্ট্রেট দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এডওয়ার্ড ডি লাটোর প্রমাণ করেন যে, মেজিস্ট্রেট মি.ডানলপের সঙ্গে তাবুতে আহার করেন। এই সময়ে বিষয়টি নিয়ে মেজিস্ট্রেট তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং এরপর তাঁর নিজের কিছু ব্যক্তিদের সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে দুদু মিয়াকে সেশন কোর্টে পাঠান।[৫৪]

মি.ডিলাটোর মনে করেন যে, দুদু মিয়ার বাসগৃহে আগমনের পাল্টা হিসাবে মি.ডানলপের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়।[৫৫] এই বিষয়ে এইচ, বেভারিজও ডি, লাটোরের মতের সঙ্গে একই মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে, ফরায়েযী কৃষক শ্রেণী কাঞ্জিলালকে অত্যাচারী বিবেচনা করেই অপহরণ করেছিল।[৫৬] ফরায়েযী সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফরায়েযী কৃষক শ্রেণী কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে যেমন ক্ষুদ্ধ ছিল তেমনি ডানলপের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার ক্ষোভও ছিল। উদাহরণস্বরূপ ওয়াজির আলী লিখেছেন :[৫৭]

'ফরিদপুর জিলাধীন পাঁচচর পর।
বাঙ্গালার নীলকুঠি ছিল তথা বড়।
কালী কাজলিয়া ছিল কর্মচারী বড়।
উৎপীড়ন করিত বর মোসলমান পর ॥
একদিন মিয়ার শিষ্য কাদের বক্স জান।
দুদু মিয়ার এসারায় লিয়া সুবিদান।
বেইমানের তরে সবে মারিয়া ফেলিল।

এই ঘটনায় দুদু মিয়া এবং তাঁর ৬৩ জন অনুসারীকে ফরিদপুরের সেশন জজ কোর্টে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিচার করা হয়। কিন্তু কলিকাতায় নিজামত আদালতে আপিল করার পর তাদের সকলকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।[৫৮] জানা যায় এই ঘটনাকে গৌরবান্বিত করার জন্য পুঁথি রচনা করা হয় যা বর্তমানে দুর্লভ শুধু মাত্র কয়েকটি লাইন আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি ত্রিপুরার (বর্তমান কুমিল্লা) একজন বৃদ্ধ ফরায়েযী থেকে যা নিম্নরূপ। কবিতাতে বাঁধিয়া করিলাস প্রচার।

সেই মুল্লুকের ধন্যমান না জাই সিকদার ॥
তারা কাঁছাখোলা, জোলার পোলা, খাটি মোসলমান।

---

৫৩ Trail of Dudu Miah পৃ. ৪৮ এবং ১৮৮-৮৯।

৫৪ Parlamentary papers, vol. xiiv, 1861, Indigo Commissian Extract From Minute of Evidence পৃ. ২৫৬ জবানবন্দী নং ৩৯১৭।

৫৫ ঐ।

৫৬ H.Beveridge : District of Bakergonge, পৃ. ৩৪০।

৫৭ ওয়াজির আলী মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৮।

৫৮ দেখুন, Trail of Dudu Miah, পৃ. পরিশিষ্ট xxxiii-xl, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫ H.Beveridge, District of Backergonge, পৃ. ৩৪০ এবং ওয়াজির আলী মুসলিম রত্নহার পৃ. ৮।

দুদু মিয়া নিয়া তাগ্যে দিল বস্ত্রদান।
তোমরা চল্যা ঘরে যাও কাবিলা নাও কাইও মুখের বানী
এই মত জারে ভাই ওস্তাদের নিশানী ॥
ওস্তাদ দুদু মিঞা । দুদু মিয়া তাম দিয়া রাজ্যভালা করে ॥
ছোট লোকের হাতে লাঠি ফাল ফারিয়া ফিরে।
তাতে কমলা ছোঁচা পোকৃকা মোছা ছদরী বাড়ী যার।
লাল মনিয়ার পুকুরেতে হামেশা ঘুরায় ॥
তাতে কব কত মষের মত কত ঘর পাড়া।
দুদু মিয়া শিমুলিয়ার গাঁও কইরা দিল ছাড়া ॥[৫৯]

মামলার বিবরণ অনুযায়ী দুদু মিয়াকে অভিযুক্ত করা হয় 'একটি বৃহৎ দলকে প্ররোচনা, পরামর্শ সরাসরি নির্দেশ এবং ভাড়াটে সংগ্রহ করার জন্য'। এ ছাড়া এই দলটি ছিল হাজীদের বা ফরায়েযীদের অন্তর্ভুক্ত।[৬০] দলটি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গার উদ্দেশ্যে বলপূর্বক মি.ডানলপের নীল ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করে। এ ছাড়া এই দলটি পাঁচচর গ্রামের বিভিন্ন দোকান, মি.ডানলপের কাচারি এবং খাড়াকান্দির হাদানুল্লাহর বাড়ি তছনছ করে। এই কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭,০০০ টাকা। নীল ফ্যাক্টরি ও মি. ডানলপের কাচারি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ ছাড়া জমিদারদের (হিন্দু) ৪০টি কাঁচাবাড়িও পোড়ানো হয়। এই সময়ে কয়েকজনকে আহত করা ছাড়াও মি.ডানলপের গোমস্তা কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলালকে অপহরণ করা হয়। এরপর থেকে 'তার কোন খোঁজ অথবা তাকে কোথাও দেখা যায়নি' এবং তাঁর বন্ধুগণও কোনো খোঁজ দিতে পারেনি।[৬১] মি.ডানলপকে এই আক্রমণের তাৎক্ষণিক কারণ কি জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন গত নীল কাটার মওসুমে দুদু মিয়া তাঁর লোকদের মাধ্যমে আমাদেরকে নীল না কাটার জন্য অনেকবার চেষ্টা করে। এই বিষয়ে তিনি মেজিস্ট্রেটের কাছে নিরাপত্তা চান বলে জানান। এই বিষয়গুলো ছাড়া তিনি অন্য বিশেষ কিছু স্মরণ করতে পারছেন না বলে মি.ডানলপ উল্লেখ করেন।[৬২]

ডানলপ কর্তৃক দুদু মিয়ার বাসগৃহে আক্রমণের বিষয়টি মামলার বিবরণে উল্লেখিত হয়নি। ফৌজদারি কোর্টের মুহরী বব্রুন চন্দ্র রায় দুদু মিঞাকে ঘটনার সঙ্গে জড়াতে চেষ্টা করে। মহরীর সেশন জজের কাছে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি প্রদর্শন করে। প্রথমত পাড়াগ্রামের নিকট মাহতাবপুরে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়। এই জমায়েতটি ছিল পাঁচচর ঘটনার কিছুদিন আগের । এখানে দুদু মিয়া উপস্থিত ছিল এবং

---

৫৯ উপরোক্ত স্তবক স্পষ্টত:ই একটি পুঁথির অংশ। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান লেখকের সফর চলাকালে ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার সদর মহকুমা থেকে সংগৃহীত। মহকুমার বজরিখোলা নিবাসী মুন্সী ইরফানউদ্দীনের স্মৃতি থেকে। শিমুলিয়া ছিল মি. ডানলপের পাঁচচর কুঠির সন্নিহিত গ্রাম। এই গ্রামে উক্ত কুঠির শ্রমিক এবং লাঠিয়ালগণ বাস করত। নীল ফ্যাক্টরি ধ্বংশ করার পর ফরায়েযীগণ শিমুলিয়া তছনছ করে যা উপরোক্ত পুঁথিতের বর্ণিত হয়েছে।

৬০ মামলার বিবরণে একটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। পাঁচচর আক্রমণের সময় দুইজন স্থানীয় খ্রিস্টান অংশ নিয়েছিল। দ্রষ্টব্য, Trail of Dudu Miah, পৃ. ৬৫।

৬১ Trail of Dudu Miah, পৃ. ১-২এবং ৩১৩।

৬২ ঐ, পৃ. ১-২এবং ৬৬-৬৭।

আক্রমণের জন্য নির্দেশ দেয়। এই জমায়েতের এবং আক্রমণের নেতৃত্বে ছিল জাহিদ খান। দ্বিতীয়ত ঘটনার পূর্বের দিন রাতে কিছু দাঙ্গাবাজ দুদু মিয়ার বাড়িতে (বাহাদুর পুর) জমায়েত হয়। দুদু মিয়া রাতের অন্ধকারে বের হয়ে পাঁচচর আক্রমণে অংশ নেয়।[৬৩]

তৃতীয়ত দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীগণ মনে করে তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তিদের আক্রমণ করা পাপ নয়।[৬৪] চতুর্থত মি.ডানলপ বলেন যে এই আক্রমণটি যে দুদু মিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তা 'দিবালোকের মতো স্পষ্ট'।[৬৫] ৬৭ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র একজন সাক্ষী মনে করে যে এই আক্রমণটি বাহাদুরপুর গ্রামবাসীদের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। কিন্তু যারা আক্রমণে অংশ নেয় তারা দূরাঞ্চল থেকে এসেছিল। সে আরও বলে যে ঘটনার পর অন্যান্যদের কাছ থেকে জানা যায় না যে আক্রমণকারীগণ আগের রাতে বাহাদুরপুর গ্রামে জমায়েত হয়।[৬৬] দুদু মিয়ার গোপন খবরের ভিত্তিতে নারায়নগঞ্জের জান নামক একটি স্থান থেকে একটি দল পাঁচচরের উদ্দেশ্যে রাতে রওয়ানা দেয়। ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দলটি পায়ে হেঁটে এবং লাঠি সোটা ছাড়াই অগ্রসর হয়। পাঁচচরের অনতিদূরে পদ্মা নদী পার হয়ে দলটি অপর একটি দলের সঙ্গে মিলিত হয়। পূর্ব নির্দেশ মতো দলটিকে বর্শা, কুঠার ও লাঠি সরবরাহ করা হয়। এই স্থান থেকে দলটি ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পাঁচচরের দিকে অগ্রসর হয়। সূর্য উঠার সময়ে দলটি একত্রিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে। কাজ সুষ্ঠরূপে সমাধান করে দলটি আবার ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়। লাঠি সোটা ফেলে ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দলটি সাধারণ ব্যক্তিদের মতো হেঁটে সরাসরি নারায়নগঞ্জে ফিরে আসে।[৬৭]

মামলায় উত্থাপিত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ছিল অনুমান নির্ভর। পুলিশ অভিযোগের সমর্থনে অনেক জাল কাগজ পত্র আদালতে পেশ করে। দুদু মিয়ার চাতুর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডে মি.ডানলপ এবং হিন্দু বাবুরা হতবিহবল হয়ে পড়ায় উক্ত কাগজ পত্রের কিছু অংশ ঘটনার এক অথবা দুই সপ্তাহ পরে প্রস্তুত করে দাখিল করতে বাধ্য হয়। উপরন্তু সরকারি উকিল এবং পুলিশ ঘটনার গভীরে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। দুদু মিয়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে মামলার বিবরণ অস্বীকার করতে কোন বেগ পেতে হয়নি। দুদু মিয়ার জোরালো যুক্তি প্রদর্শনের ফলে ঘটনার বিষয়বস্তু কল্পনাপ্রসূত বলে ধারণা জন্মে।[৬৮]

মামলার সাক্ষীপ্রমাণ আইন কর্মকর্তা মওলবী আবদুল ওয়াহিদের ফতোয়ার মাধ্যমে ঢাকার সেশন জজ (অর্থাৎ ফরিদপুর[৬৯] সেশন কোর্ট) হেনরী সোয়েটানহাম দুদু

৬৩ ঐ, পরিশিষ্ট পৃ. ১।
৬৪ ঐ।
৬৫ পৃ. ৩।
৬৬ ঐ, পরিশিষ্ট পৃ. ১।
৬৭ ঐ, পৃ. ৪।
৬৮ Trail of Dudu Miah, পৃ. ৪৮।
৬৯ দেখুন, 'A police Report of the zilah Dacca Jalalpur, Dated, AC. 1799. বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত JPHS, খন্ড-২, অংশ-১, ১৯৬৯, পৃ. ২৪। ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ আলাদা জেলা হওয়ার পূর্বে একটি মাত্র জেলা ছিল।

মিয়ার ৪৮ জন অনুসারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু বড় ধরনের শাস্তি প্রদান করার বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় জজ মামলার সকল কাগজপত্র অনুমোদনের জন্য ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কলিকাতার সদর নিজামত আদালতে প্রেরিত হয়।[৭০] নিজামত আদালত ব্যবহৃত সাক্ষী প্রমাণাদির প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয় এবং ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে সেপ্টেম্বরে সেশন জজের রায় নাকচ করে। এই সঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, মামলায় ব্যবহৃত ঘটনার বিবরণ অংশত সম্পূর্ণ অবাস্তব ভ্রান্ত এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। এই সঙ্গে আরও বলা হয় যে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকার অতিরিক্ত সেশন জজ মি.লংম্যান যেভাবে মামলার রায় প্রদান করেছিলেন তাঁর সঙ্গে বর্তমানটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সে সময়ে বন্দী দুদু মিয়া ও তাঁর অনেক অনুসারীদের বিচার হয়েছিল এবং অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।[৭১]

মামলায় পরাজিত হওয়া ছিল মি.ডানলপ ও হিন্দু বাবুদের জন্য মরনাঘাত স্বরূপ। দুদু মিয়ার অনুসারীগণের কাছে এটা ছিল নির্যাতিত কৃষকদের বিজয়। তাঁরা গান বাঁধে দুদু মিয়া তাম্ দিয়া রাজ্য ভালা করে'।[৭২] এডোয়ার্ড ডি, লাটোর (১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন সময়ে ফরিদপুরের ডেপুটি কালেক্টর এবং জয়েন্ট মেজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ পান) মনে করেন যে যদিও ডানলপের ফ্যাক্টরির উপর দুদু মিয়ার আক্রমণ ছিল প্রতিশোধ স্বরূপ, তা সত্ত্বেও তাকে মি.ডানলপের চেয়ে বেশী দায়ী বলা যায় না। মি. ডানলপের নীতিহীনতা এবং নির্যাতনের ফলেই 'ব্রিটিশ মেজিস্ট্রেট'র সঙ্গে দুদু মিয়ার সংঘাত শুরু হয়। তিনি মনে করেন যে একজন ব্রিটিশ মেজিস্ট্রেটের মর্যাদাহীন কার্যকলাপের কারণে স্থানীয় জনগণের কাছে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণ যখন ব্রিটিশ মেজিস্ট্রেটের আওতাধীন এলাকার নীতিহীন কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে, তখন তাদের মধ্যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা থাকতে পারে না।[৭৩] দুর্নীতি, ব্রিটিশ আদালতের কার্যকরহীন ভূমিকা ও প্রশাসনের বিশৃংখলা অবস্থার কারণে ফরিদপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে[৭৪] ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করে বলা যায়।[৭৫]

কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের ফলশ্রুতিতে দুদু মিয়ার পথ থেকে শেষ বাধাটি দূর হয়। এরপর থেকে ফরায়েযীগণ নির্ভয় চিত্তে মাথা উচুঁ করে চলাফেরা করার সুযোগ পায়। জমিদার অথবা নীলকরদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়। এর ফলে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দুদু মিয়া এলাকার শান্তি উপভোগ করেন বলে প্রতিয়মান হয়।

---

৭০ Trail of Dudu Miah, পৃ. ৩১১-১৩ এবং পরিশিষ্ট পৃ. xxvII, xxxvIII.
৭১ ঐ, পৃ. xxxIII.
৭২ ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. xxxIII.
৭৩ Parliamentary papers খন্ড-xiv, ১৮৬১, Indigo commisson Extract from the Minute of Evidence পৃ. ২৬৫, জবানবন্দী নং ৩৯১৮।
৭৪ ঐ।
৭৫ দেখুন, বর্তমান গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহের বা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ঘটলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে এবং তাকে কলিকাতায় আলীপুর জেলে বন্দী রাখা হয়।[৭৬] তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হয়নি । জেমস্ ওয়াইজ শুধু বলেন তাঁকে (দুদু মিয়া) মুক্তি দেয়া হতে পারে যদি তিনি তাঁর ৫০, ০০০ অনুসারীদের উত্তেজিত না করেন অথবা তাঁর ইচ্ছামতো কোথাও অগ্রসর হতে না দেন বলে অঙ্গীকার করেন।[৭৭] দুদু মিয়াকে গ্রেফতারের কারণ সম্ভবত মি.ডাম্পিয়ারের পুলিশ রিপোর্ট। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিত এই পুলিশ রিপোর্টে দুদু মিয়াকে ওয়াহাবী নেতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, তিনি ৮০, ০০০ ব্যক্তির নেতৃত্বে ছিলেন।[৭৮] এই রিপোর্টে তাঁর গ্রেফতারের ভিত্তি রচনা করে। তবে দুদু মিয়ায় গ্রেফতারের কারণটি ছিল রাজনৈতিক। যখন বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে কলিকাতা থেকে মুক্তি দেয়া হয়।[৭৯] কিন্তু দুদু মিয়া যখন বাড়ি পৌঁছেন তখন ফরিদপুর পুলিশ তাকে আবার গ্রেফতার করে এবং ফরিদপুর হাজতে আটক রাখে। জে, ই, গ্যাসট্রেলের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর এই গ্রেফতারের বিষয়টি ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। গ্যাসট্রেল বলেন দুদু মিয়ার জেলায় ফিরে আসার পর তাকে চাতুরতার সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় ফরিদপুর থানার একজন দারোগা কিছু পুলিশকে দুদু মিয়ার আস্তানায় পাঠায় এবং তারা ফরায়েযীদের দলে যোগ দেবার প্রস্তাব করে। দুদু মিয়া এই প্রস্তাব শুনে কিছু সন্দেহ না করে এদের সঙ্গে আস্তানা ত্যাগ করেন। এরপর তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে নৌকায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে দারোগা অপেক্ষা করছিল। দুদু মিয়াকে ফরিদপুর নিয়ে যাওয়া হয় এবং নিরাপদে জেলে রাখা হয়।[৮০]

এবারের গ্রেফতারের কারণও বলা হয়নি। গ্যাসট্রেল শুধু বলেন, যখন তাকে মুক্তি দেয়া হয় তখন চরম উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দুদু মিয়া ঢাকায় আশ্রয় নেন। এখানে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন।[৮১] উপরোক্ত মন্তব্য থেকে প্রথমত ধারণা করা যায় যে, দুদু মিয়া ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মুক্তি পান। দ্বিতীয়ত মন্তব্যের ভাষা থেকে ধারণা করা যায় যে, দুদু মিয়াকে কোর্টে হাজির করা ছাড়াই পুলিশের কাছ থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এই গ্রেফতার এবং হাজতবাসকে পুলিশ কর্তৃক অন্তরীণ রাখা বলা যেতে পারে।

দুদু মিয়া সূচিত সংগ্রামের প্রকৃতি

দুদু মিয়ার জীবন যা আমরা আলোচনা করেছি তা থেকে ধারণা করা যায় যে জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল মূলত ফরায়েযী কৃষকদেরকে

---

৭৬ J.E.Gastrell : Jessore, Fureedpure and Backergonge, পৃ. ৩৬ এবং James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫।

৭৭ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫।

৭৮ W.W.Hunter : Indian Musalmans, পৃ. ১০০-১০৯।

৭৯ J.E.Gastrell : Jassore, Fureedpur and Backergonge, পৃ. ৩৬, তিনি অবশ্য বছর উল্লেখ করেননি কিন্তু সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, দুদু মিয়াকে কলিকাতায় নিরাপদে আটক রাখা হয় 'মহা বিদ্রোহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত' সুতরাং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দটি সহজেই বোধগম্য হয়।

৮০ J.E.Gastrell : Jessore, Fureedpore and Buckargong, পৃ. ৩৬।

৮১ ঐ।

নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য। ইউরোপীয় লেখকগণ অবশ্য তাকে দস্যুতা, আইন অমান্যকারী এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসাবে অভিযুক্ত করেছে।

(১) বেঙ্গল পুলিশের কমিশনার মি.ডাম্পিয়ার অভিযোগ করেন যে, ফরায়েযীদের 'প্রকৃত উদ্দেশ্য' ছিল বিদেশী শাসকদের বহিষ্কার করে 'মুসলিম শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা'। তিনি দুদু মিয়াকে একজন বিপদজনক ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং যাবজ্জীবন নির্বাসন দেয়ার সুপারিশ করেন। এ ছাড়া ফরায়েযী সম্প্রদায়ের উপর নজর রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।[৮২]

(২) ক্যালকাটা রিভিউর একজন লেখক পূর্ববর্তী সময়ে তিতুমীরের গোলযোগের সঙ্গে দুদু মিয়ার একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই লেখায় দুদু মিয়াকে একজন অপরাধী এবং শান্তি বিনষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত করে।[৮৩]

(৩) মওলানা কেরামত আলী ও দুদু মিয়াকে এইচ বেভারিজ বাকেরগঞ্জ জেলার যে কোন জজ বা মেজিস্ট্রেটের চেয়ে 'অনেক বেশী প্রভাবশালী' বেসরকারি ব্যক্তি বলে মনে করেন। তিনি অবশ্য দুদু মিয়ার চরিত্রকে 'পাপাচারে দুষিত' বলে মনে করেন এবং তিনি তাঁর প্রভাবকে জনকল্যাণমূলক বলতে রাজী নন।[৮৪]

(৪) জেমস্ ওয়াইজ বলেন যে, দুদুমিয়া 'তাঁর আইন বিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজের চরিত্রকে ক্রমাগত অধঃপতিত করেছেন। 'তাঁর পক্ষে দুদু মিয়ার ১৮৩৮, ১৮৪১, ১৮৪৪, এবং ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের বিচারের উদাহরণ উল্লেখ করেন। এই বিচারগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

কিন্তু সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিত এবং বিভিন্ন বাধা, যেগুলোর বিরুদ্ধে দুদু মিয়া আন্দোলন করেছেন সেগুলো যদি আমরা পরীক্ষা করি তাহলে উক্ত অভিযোগগুলো অসার এবং অনভিপ্রেত মনে হবে। প্রথমত দুদু মিয়া যে বিদ্রোহী ছিলেন তা কখনও প্রমাণিত হয়নি। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় ড.মল্লিক বলেন, [৮৫]

'আমরা এখানে দুদু মিয়া কর্তৃক ব্রিটিশ শক্তির পরিবর্তে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার কোন মনোভাব দেখতে পাই না। শুধু মাত্র কটি গুজবের উপর ভিত্তি করে ফরিদপুরের জয়েন্ট মেজিস্ট্রেট ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে জুন একটি পত্রে উল্লেখ করেন যে, ফরায়েযীগণ ওয়াহাবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, হিন্দু জমিদার ইউরোপীয়ান নীলকর এবং তাদের অধীনস্তরা কৃষক সমাজকে অসহনীয় নির্যাতন এবং করভাবে জর্জরিত করেছিল।[৮৬]

আমরা অন্যস্থানে লক্ষ্য করেছি যে, ফরিদপুরের জমিদারবর্গ তাদের প্রজাদের উপর কম করেও ২০ টি অবৈধ কর ধার্য করেছিল। এই সকল কর ছিল নিয়মিত

---

৮২ Trail of Dudu Miyan, পরিশিষ্ট পৃ. xxvII-xxxiv.
৮৩ খণ্ড-৭, পৃ. ১৯৯।
৮৪ H.Beveridge. District of Bakergonge, খণ্ড-১৮৭৬, পৃ. ৮৭।
৮৫ Mallick : British Policy. পৃ. ৭৫।
৮৬ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়-২, সেকশন-খ।

খাজনার অতিরিক্ত।[৮৭] প্রজাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের নেতা হিসেবে দুদু মিয়া এই ধরনের অত্যাচার নীরবে মেনে নিতে না পারার কারণে জমিদার নীলকরদের সঙ্গে তিনি বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাবলী ছিল, এই সকল অত্যাচারী পদক্ষেপ থেকে ফরায়েযী কৃষকদের রক্ষা করার জন্যে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পাঁচচর ঘটনায় একজন ব্যক্তিও নিহত না হওয়ায় বিষয়টি ফরায়েযী আন্দোলনের একটি ইতিবাচক দিক।

তৃতীয়ত তিতুমীরের জীবনী লেখক বিহারীলাল সরকারের মতে ফরায়েযী আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসন গ্রাম বাংলায় তখনও কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর ফলে জমিদারগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ পায়।[৮৮] মাদারীপুর মহকুমার প্রশাসনিক প্রধান ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দেও মনে করেন যে, সরকার জমিদারগণের নির্যাতনের হাত থেকে ফরায়েযী কৃষকদের রক্ষা করতে পারেনি।[৮৯] ডি, লাটোরের বক্তব্য থেকে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অত্যাচারী জমিদার এবং নীলকরদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা দুদু মিয়ার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি অন্যভাবে বলেন ফরিদপুরের ছিল তেমনি একটি বিশৃংখলা অবস্থা যে জেলায় আমাকে পাঠানো হয়। এই স্থানান্তর আমার ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের কারণে। এ অবস্থায় দুদু মিয়া বাধ্য হয়েই কিছুটা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে ছিলেন, যা নির্যাতিত কৃষক শ্রেণীর কল্যাণের জন্য নেয়া হয়েছিল।

চতুর্থত এইচ বেভারিজ মনে করেন যে, ফরায়েযীগণ 'ওয়াহাবীদের মতো বিপদজনক রাজনৈতিক মত পোষণ করে না। তাদের মতাদর্শিক চিন্তা ধারা ছিল জমিদারগণের করারোপ সম্পর্কিত পদক্ষেপের বিরোধিতা করা।[৯০] অপর দিকে তিনি দেখান যে, হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েযীদেরকে রাজনৈতিকভাবে 'বিপদজনক' মনে করে, কিন্তু এই ধরনের 'সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল না'। তিনি অনুভব করেন যে, ফরায়েযীগণ সাধারণ মুসলিমদের চেয়ে অধিক ধর্মান্ধ ছিল, যা তাদের চরিত্রের অবমূল্যায়ন করে না।[৯১]

পঞ্চমত যদিও হান্টার ফরায়েযীদেরকে আপোষহীন বলে অভিযোগ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি এদেরকে শান্তি প্রিয় কৃষক এবং ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, 'বর্তমানে ফরায়েযীগণ ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রদর্শন করছে না। তাদেরকে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযোগে অভিযুক্ত করা অন্যায়। তাদের অধিকাংশই স্থানীয় কৃষিজীবী এবং অল্প সংখ্যক ছিল ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায়ীগণ চামড়া রফতানি কারক ছিল, এই সম্প্রদায়ের সকলেই নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে ছিল নিষ্ঠাবান।[৯২]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তিতুমীরের মতোই দুদু মিঞা হিন্দু জমিদার এবং নীলকরদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানেন এবং একটি বিপদজনক পরিস্থিতিতে জড়িয়ে

৮৭ দেখুন, গ্রন্থের পরিশিষ্ট'গ'।
৮৮ দ্রষ্টব্য, বিহারীলাল সরকার তিতুমীর, কলিকাতা ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪-১৭।
৮৯ দেখুন, পঞ্চম অধ্যায়, সেকশন-খ এবং ৮ম অধ্যায়।
৯০ দেখুন, Parliamentary papers, vol. xiv. 1861. Indigo commission Extract From the Minutes of Evidence, p. 265, জবানবন্দী নং ৩৯১৮।
৯১ H.Beveridge : District of Bakergonj, পূর্বোক্ত পৃ. ২৫৪-৫৫।
৯২ W.W.Hunter (ed) Imperial Gazetteer of India, পূর্বোক্ত খন্ড-৪, পৃ. ৩৩৯।

পড়েন। এই পরিস্থিতি শুধু তাঁর জীবনের প্রতিই নয় বরং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের প্রতি হুমকীস্বরূপ ছিল। দুদু মিয়া তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের দ্বারা এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন যা তিতুমীর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

দুদু মিয়ার মৃত্যু

দুদু মিয়া ঢাকা শহরের বংশাল রোডে বাস করতেন। এখানে তিনি প্রায়শ অসুস্থ থাকেন।[৯৩] অবশেষে তিনি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত ২৪শে সেপ্টেম্বর ১২৬৮ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াইজ এই তথ্য দিয়েছেন।[৯৪] তাকে ১৩৭ বংশাল রোডে অবস্থিত তাঁর বসত বাড়ির পেছনে দাফন করা হয়। তাঁর সমাধিটি এখনও সমতল অবস্থায় বিদ্যমান । সমাধিটিতে চারদিকে লম্বালম্বিভাবে ইট ও সিমেন্টের পলেস্তারা দিয়ে দেয়াল তৈরি করা আছে।[৯৫]

উপরে বর্ণিত প্রমাণাদি দ্বারা জেমস্ ওয়াইজ এবং হেদায়েত হোসেনের অভিমত 'দুদু মিয়া ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বর বাহাদুরপুরে মৃত্যুবরণ করেন' এবং এই স্থানেই তাকে দাফন করা হয় এবং 'কিছু দিনের মধ্যেই আড়িয়াল খাঁ নদী তাঁর কবর ও তাঁর বসতবাটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সঠিক নয় বলে প্রমাণ করে।[৯৬] ফরায়েযী আন্দোলনে দুদু মিয়ার অমর অবদান এবং গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্বসমূহ বিভিন্ন সমাজ সংস্কারে দেখা যায়। এই বিষয়সমূহ অন্য একটি অধ্যায়ে মূলায়ণ করা হয়েছে।[৯৭]

দুদু মিয়ার পারিবারিক জীবন

দুদু মিয়াকে একজন দীর্ঘ অবয়ব সুঠাম দেহী এবং কাল, লম্বা শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৯৮] তিনি তাঁর মাথায় লম্বা পাগড়ি পরিধান করতেন।[৯৯] বর্তমানে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী দুদু মিয়া ১৮ টি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বলা হয়েছে যে, তিনি এক সঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখেননি। তাঁর শেষ স্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ মেয়ে[১০০]। কালা মৃধা গ্রাম[১০১] (দুদু মিয়ার নিজ গ্রাম বাহাদুরপুর থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত) থেকে তিনি এই মেয়েকে বিয়ে করেন। ঢাকায় মৃত্যুপূর্ব দিনগুলোতে দুদু মিয়ার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী অবস্থান করে এবং মৃত্যুর পর ওখানে বাস করেছিলেন। একই চত্বরে দুদু মিয়ার পাশে তাকে মৃত্যুর পর দাফন করা হয়।[১০২]

---

৯৩ J.E.Gastrell : Jessore, Furreedpore and Bakergonj, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৬।
৯৪ দেখুন, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৬।
৯৫ দেখুন, গ্রন্থকারের প্রবন্ধ 'Mazar of Dudu Miah, JASP, ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃ. ৩৪৩ থেকে।
৯৬ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৬ এবং M.Hideyet Hossain, Faraidi Encyclopaedia of Islam, vol. II পৃ. ৫৮।
৯৭ গ্রন্থের ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৯৮ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৭-৮ এবং 'দুরর ই মোহাম্মদ' পুথি, পৃ. ১৩।
৯৯ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৬।
১০০ ঐ, পৃ. ২৫ ; এটার সঙ্গে দুদু মিয়ার পরিবারে প্রচলিত তথ্যের মিল রয়েছে।
১০১ ঐ।
১০২ ঐ ; এবং ঢাকার বংশাল রোডের অধিবাসীদের অভিমত অনুসারে।

পঞ্চম অধ্যায়

দুদু মিয়ার উত্তরসূরিগণ

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার মৃত্যুর ফলে ফরায়েযী আন্দোলন গভীর সংকটে নিপতিত হয়। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর ব্যক্তিত্ব এবং দুদু মিয়ার দৃঢ়তা এবং সাহস এই আন্দোলনে গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল। ফরিদপুর এবং সন্নিহিত জেলাগুলোর গ্রামীণ মুসলিম সমাজ তাদের সংস্কার আদর্শে উজ্জীবিত হয়। পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের একটি বড় অংশ তাদের নেতৃত্বে পতাকাতলে সমাবেত হয়। দুদু মিয়ার মৃত্যুতে এই নেতৃত্ব ঘাটতি দেখা দেয়।

দুদু মিয়া তিন পুত্র রেখে যান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াস উদ্দীন হায়দার[১] তাঁর উত্তর-সূরি হিসাবে নেতৃত্বে আসীন হয়। কিন্তু তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন প্রকৃত সূত্র নেই। তিনি সম্ভবত নেতৃত্ব পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২] তাঁর মৃত্যুর পর দুদু মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল গফুর প্রকাশ নয়া মিয়া নেতৃত্ব পান। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী তখন নয়া মিয়ার বয়স ছিল বার বছর।[৩]

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পরপরই ফরিদপুরের জমিদারগণ তাদের পুরনো বিরোধিতা নতুন করে শুরু করে। তাদের নির্যাতনের মাত্রা প্রতিদিনই বাড়তে থাকে। এক রাতে জমিদারদের অনুচরেরা বাহাদুরপুর আক্রমণ করে। দুদু মিয়ার পরিবারদের বসতি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়।[৪] এইভাবে জমিদারদের শত্রুতা দুদু মিয়ার পরিবার ও অনুসারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে।

অন্যদিকে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুর ফরায়েযী মতবাদের বিরোধী হিসাবে একটি গণআন্দোলনের সূচনা করেন, যাতে করে ফরায়েযী আন্দোলন সমূলে ধ্বংস করা যায়।[৫] তিনি হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে 'বাংলার খারিজী' হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[৬] তিনি পূর্ববাংলার সর্বত্র হাটবাজার ও শহরে এবং গ্রামের মসজিদসমূহে নিরলসভাবে ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান।[৭] এর ফলে ফরায়েযী আন্দোলনের ভিত্তি নড়ে উঠে। জেমস্ ওয়াইজের নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ ফরায়েযী

---

১ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৯।

২ প্রচলিত কাহিনী থেকে তারিখটি নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী পাদটিকা দেখুন।

৩ নয়া মিয়ার পরিবারে প্রচলিত গল্পকথা। তিনি ১৮৫২ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন (দেখুন আলোচনা)। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাকে নেতা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে একই বছরে গিয়াস উদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন।

৪ দুদু মিয়ার পরিবারে প্রচলিত তথ্য। হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং দুদু মিয়ার সকল স্মৃতি চিহ্ন এবং সকল গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি আগুনে ভস্মিভূত হয়।

৫ দেখুন, গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়।

৬ দ্রষ্টব্য, মওলানা কেরামত আলী : হুজ্জত ই কৃাতি, পৃ. ৯৪-৯৭.

৭ দেখুন, এই গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়।

আন্দোলনের পরিস্থিতি তুলে ধরে। তিনি বলেন, 'দুদু মিয়া তিন পুত্র রেখে যান। কিন্তু তাদের কেউই তাদের পিতার মতো যোগ্যতা বা উদ্যম দেখাতে ব্যর্থ হয়। সম্প্রদায়টির সদস্য সংখ্যা প্রতি বছরই কমতে থাকে এবং 'তাইউনী' অংশে যোগ দিতে থাকে। সুতরাং দুদু মিয়ার মৃত্যু ছিল ফরায়েযী আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি। নয়া মিয়া প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর ফরায়েযী আন্দোলন শক্তি কিছুটা ফিরে পায়।

দুদু মিয়া ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মুন্সী ফয়েজ উদ্দীন মোখতারকে তার সম্পত্তি সম্পর্কে সকল বিষয়ের এটর্নী নিয়োগ করেন।[৮] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়াকে গ্রেফতারের প্রাক্কালে তিনি তাঁর জামাতা বরিশালের বানি ইয়াসিন মিয়াকে তাঁর গৃহস্থালী বিষয়ে দেখাশুনা করার মোতওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। তাছাড়াও সৌভাগ্যবশত দুদু মিয়া তাঁর খলিফা হিসাবে মাওলানা আবদুল জব্বারের মতো শিক্ষিত ধর্মতত্ত্ববিদকে পেয়েছিলেন। খলিফা আবদুল জব্বার ফরায়েযীদের মুফতি হিসাবে কাজ করতেন। দুদু মিয়ার মাঝে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত পড়াশুনার যে ঘাটতি ছিল তা খলিফা জব্বার যথাযথভাবে নিজের মাধ্যমে পূরণ করেছেন।[৯] দুদু মিয়ার জীবদ্দশায় এই তিনজন ব্যক্তি তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে এবং ব্যক্তিগত দূত হিসেবে কাজ করেছেন যা মৃত্যুর পরও তাঁর পরিবারের প্রতি অব্যাহত ছিল। এছাড়া ফরায়েযী আন্দোলনের ভাঙ্গনরোধে এরা সহায়তা করেন। সুতরাং এদের মধ্যে দুদু মিয়ার যে আস্থা ছিল তা তাঁর মৃত্যুর পরও অব্যাহত ছিল। উপরন্তু দুদু মিয়া ফরায়েযী সমাজকে দিয়েছিলেন একটি কেন্দ্রীভূত সংগঠনের রূপ। বিভিন্ন মামলা এবং বিপর্যয় সত্ত্বেও ফরায়েযী আন্দোলন একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবদুল গফুর প্রকাশ নয়া মিয়া (১৮৫২-১৮৮৩)

আবদুল গফুর প্রকাশ নয়া মিয়া ১২৫৮ বঙ্গাব্দ/১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুরপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দুদু মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র। নয়া মিয়া সম্পর্কে নবীন চন্দ্র সেনের জীবনী হল আমাদের প্রধান সূত্র। নবীন চন্দ্র সেন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক এবং একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি মহকুমা প্রশাসক হিসাবে মাদারীপুরে (ফরায়েযী নেতাদের জন্ম স্থান) বদলি হন। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।[১০] তিনি ফরায়েযীদের এবং তাদের বিরোধীদের খুব কাছ থেকে জানতেন। সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে ফরায়েযীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়েছে, যা তিনি তাঁর জীবনী গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এই সম্পর্কে আমাদের দ্বিতীয় সূত্র হলো ফরায়েযী পুঁথি। এছাড়া ফরায়েযীদের পারিবারিক সূত্রগুলো যেখানে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সেখানে আংশিক ব্যবহৃত হয়েছে।

নয়া মিয়ার শৈশব কাল

ওয়াজির আলীর মতে নয়া মিয়ার শিক্ষা জীবন তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে শুরু হয়।[১১] এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন দুদু মিয়া গ্রেফতার হন তখন নয়া

---

৮ দ্রষ্টব্য, JASP, vol. vi, ১৯৬১ পৃ. ১২৪-১৩১

৯ দ্রষ্টব্য, মওলানা কেরামত আলীর সঙ্গে খলিফা জব্বারের বিতর্ক। গ্রন্থের ৭ম অধ্যায় দেখুন।

১০ দেখুন, নবীন চন্দ্র সেন : আমার জীবন, কলিকাতা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ খণ্ড-৩, পৃ. ১৫৪ এবং ২৭৪।

১১ ওয়াজির আলী, মুসলিম রত্নহার, পৃ. ১০।

মিয়ার বয়স ছিল পাঁচ বছর।[১২] সুতরাং তার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল সংক্ষিপ্ত। ওয়াজির আলী আরও বলেন যে, পরবর্তীতে নয়া মিয়ার শিক্ষার ভার একজন 'পেশোয়ারী' মওলবী'র হাতে ন্যস্ত হয়।[১৩] প্রচলিত সূত্র অনুযায়ী এই মওলবী বাহাদুরপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে। নয়া মিয়া তাঁর প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার জন্য এই মওলবীর কাছে বেশী ঋণী ছিলেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে নয়া মিয়া ফরায়েযীদের নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিতান্তই ছোট। ফরায়েযীগণ এই কারণে দুদু মিয়ার তিনজন বিশ্বস্ত সহকারী মুনশী ফয়েজ উদ্দীন মোখতার, বানি ইয়াসিন মিয়া এবং খলিফা আবদুল জব্বারকে নয়া মিয়ার অভিভাবক নিযুক্ত করে। এই তিনজন তাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা প্রদান করেন। নয়া মিয়া প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত নিজের হাতে দায়িত্ব পালন করেননি। ততদিন পর্যন্ত এই তিনজন আন্তরিকভাবে তাকে সহযোগিতা প্রদান করেন।[১৪]

নয়া মিয়ার নেতৃত্ব

নয়া মিয়া কোন তারিখে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তা জানা যায় না। কিন্তু ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুরে দুটি বিখ্যাত ঘটনা ঘটে। এইগুলো ছিল (১) জমিদার এবং ফরায়েযীদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সংঘর্ষ (২) ফরায়েযী এবং তাইউনীদের মধ্যে বিতর্ক বা বাহাস অনুষ্ঠান। এই দুটি ঘটনার সময়ই নয়া মিয়া ফরায়েযীদের প্রধান হিসাবে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন। নবীন চন্দ্র সেন বলেন এই সময়ের মধ্যেই ফরায়েযীদের মধ্যে নয়া মিয়ার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি লিখেন, 'নয়া মিয়া ছিলেন খ্যাতনামা দুদু মিয়ার পুত্র এবং ফরায়েযীদের নেতা পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে ফরিদপুরের মুসলিমগণ ছিল ফরায়েযী, যারা নয়া মিয়ার কথাকে ঐশ্বরিক মনে করত। তিনি আরও বলেন 'এই অঞ্চলে নয়া মিয়া ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে একটি নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫]

নবীন চন্দ্র সেন সুশাসনের স্বার্থে নয়া মিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য একটি সমাঝোতায় উপনীত হন।[১৬] ফরায়েযী নেতাদের সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার দৃষ্টান্ত এর মাধ্যমে শুরু হয়। এই সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পর নয়া মিয়া তা শেষ পর্যন্ত লজ্ঘন করেননি। এই সম্পর্কে নবীন চন্দ্র সেন বলেন 'আমি যে দুই বৎসর মাদারিপুরে ছিলাম, তিনি (নয়া মিয়া) প্রতিজ্ঞা লজ্ঘন করেন নি। আমার মাদারিপুর সুশাসনের ইহা একটি নিগূঢ়তত্ত্ব।[১৭]

পালাং জমিদারগণের সঙ্গে সংঘর্ষ

উল্লেখ্য যে, (ফরায়েযী নেতৃবৃন্দের জন্মস্থান) মাদারিপুর ছিল মুসলিম অধ্যুষিত মহকুমা। নবীন চন্দ্র সেনের মতে 'এই অঞ্চলের সকল রায়ত ছিল নয়া মিয়ার

---

১২ দ্রষ্টব্য, গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়।

১৩ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ১০। তার প্রকৃত নাম উল্লেখিত হয়নি। 'পেশোয়ারী মওলবী' হিসেবে তিনি এতবেশী পরিচিত ছিলেন যে তাঁর প্রকৃত নাম বর্তমান ফরায়েযীগণ কেউই স্মরণ করতে পারেননি।

১৪ নয়া মিয়ার পরিবারে এবং ফরায়েযীদের মধ্যেও বিষয়টি প্রচলিত।

১৫ নবীন চন্দ্র সেন : আমার জীবন, পূর্বোক্ত খণ্ড-৩, পৃ. ১৪৯।

১৬ ঐ, পৃ. ১৫৪।

১৭ ঐ, পৃ. ১৪২।

অনুসারী। পালাং এর চক্রবর্তীদের ছিল সবচেয়ে বড় জমিদারী। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নবীন চন্দ্র সেন মহকুমা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে পালাং জমিদার পরিবারে যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তা সরকারের গোচরে আসে। এই দ্বন্দ্বের পারিপার্শ্বির্ক প্রতিক্রিয়া ফরায়েযীদের মাঝেও পড়ে।

নবীন চন্দ্র সেন বলেন যে, পালাং জমিদারীর মালিকানা ছিল তিনজন ব্রাহ্মণ চক্রবর্তী। এরা ছিল সম্পর্কে সহোদর। 'সবচেয়ে বড়' ভাই ছিল শান্তিপ্রিয় ও ভাল স্বভাবের, মেজ ভাইয়ের ছিল মোটামুটি ভাল চরিত্র। কিন্তু ছোট ভাই ছিল অত্যাচারী। ছোট ভাই এতবেশী অত্যাচারী ছিল যে, যাঁকে বলা হতো 'কংসাবতার' অর্থাৎ তাকে কৃষ্ণের চাচা কুখ্যাত কংসের অবতার হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাদের একজন চাচাত ভাই, জমিদারীর অর্ধাংশ আইনত পাওয়ার কথা থাকলেও তিন ভাই তা দিতে গড়রাজী হয়। জমিদারীর অংশ অথবা বিনিময়ে কোনো সুবিধা দিতেও এরা প্রস্তুত নয়। চাচাতো ভাই যথেষ্ট চেষ্টা করেও যখন ভাইদের সঙ্গে রফা করতে ব্যর্থ হয় তখন সে তাঁর আইনগত স্বত্ব নয়ামিয়াকে ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[১৮]

যখন চাচাতো ভাইয়ের পরিকল্পনা প্রকাশ পায় তখন তিন ভাই গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়। নবীন চন্দ্র সেন লিখেন যে, এলাকায় ফরায়েযী কৃষক শ্রেণী ছিল নয়া মিয়ার নিয়ন্ত্রণে। তাই নয়া মিয়া ছিলেন 'এত বেশী শক্তিশালী' যে উক্ত প্রস্তাবে কংসাবতার ভয়ে কম্পমান হয়। তা সত্ত্বেও সমঝোতার পরিবর্তে জমিদার ভাইয়ের চাচাতো ভাইকে মালিকানা খর্ব করার জন্য আইন বিগর্হিত পথ অবলম্বন করে। এরা একটি জাল দলিলের মাধ্যমে সাবরেজিস্ট্রারকে প্রভাবিত করে এবং রাতারাতি চাচাতো ভাইয়ের অংশ নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করে। চাচাতো ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা মেজিস্ট্রেট মি.জাফরী মামলা তদন্ত করে জালিয়াতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন এবং তিনভাই সাব রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।[১৯]

এই সময়টিতেই নবীন চন্দ্র সেন মাদারীপুরের মহকুমা প্রশাসক নিযুক্ত হন। তাঁর নিযুক্তির পর মি.জাফরী তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে এই মামলা পরিচালনা করে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য নিদের্শ দেন। নবীনচন্দ্র সেন মামলার বিচার করেন এবং অভিযুক্তকে অপরাধি সাব্যস্ত করেন। নিয়মানুযায়ী তিন ভাইকে সেশন জজ কোর্টে সোপর্দ করেন। নবীন চন্দ্র সেনের মতে এই মামলাটি ছিল একটি স্পষ্ট বিষয় এবং তা জনগণের মধ্যেও তোলপাড় সৃষ্টি করে। সকলেই মনে করে যে, এই তিনজন এবার শাস্তি পেতে যাচ্ছে। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে এই তিনজন সেশন জজ কর্তৃক অব্যাহতি পায়। লোকজন সন্দেহ পোষণ করে যে, জজ এবং মেজিস্ট্রেটের মধ্যে রেষারেষি থাকায় মামলার রায় এমনটি হয়েছে।[২০] তিন ভাই মুক্তি পেয়ে বিজয়ীর বেশে বাড়ি ফিরে আসে। সবচেয়ে ছোট ভাই 'কংসাবতার' এলাকার কৃষকদের নির্যাতনের মাধ্যমে আতংক সৃষ্টি করে। কৃষকগণ ছিল প্রধানত ফরায়েযী। তারা সরকারের কাছে তাদের রক্ষা করার জন্য আবেদন করে। মহকুমা প্রশাসনের কাছে জমিদারগণের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক মামলা দায়ের করা হয়। প্রতিদিনই এই মামলার সংখ্যা বাড়তে থাকে। নবীন সেন নির্বাচিত কয়েকটি মামলার বিচার করেন।

১৮ ঐ, খণ্ড-৩, পৃ. ১৪২।
১৯ ঐ।
২০ ঐ, পৃ. ১৪৩।

বিচারে জমিদারগণ অপরাধি প্রমাণিত হলে, তিনি তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু জজ কোর্টে আপিল করার পর জমিদার অব্যাহতি পায়। সুপ্রশাসনের স্বার্থে নবীন সেন দৃঢ় ভূমিকা নেন এবং অবশিষ্ট মামলার বিচার শুরু করেন। কিন্তু প্রতিবারই জমিদারগণ দণ্ডাদেশ পায়, কিন্তু আপিলের ভিত্তিতে জজ কোর্ট থেকে এরা অব্যাহতি পেতে থাকে। বিচার প্রক্রিয়া প্রায় ছয়মাস চলতে থাকে। সকল মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলে।[২১]

এরপর ঘটনাবলী বিপদজনক মোড় নেয়। জমিদারগণ তাদের চাচাতো ভাই, বেসামরিক প্রশাসন এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে। এরা তাদের চাচাতো ভাইয়ের একটি ঘরে জাঁকজমক সহকারে বিজয় উৎসবের আয়োজন করে। এ ঘরটি তাদের চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে জবর দখল করে নেয়। জমিদারগণের অনুচরবৃন্দ এতবেশী স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে যে, এরা কৃষকদের দুগ্ধপোষ্য বাছুরগুলোকে পর্যন্ত বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য নিলামে উঠায়।[২২]

নবীন চন্দ্র বলেন কৃষক শ্রেণীর কাছে এরপর সরকারি প্রশাসনের আর কোন আস্থা রইল না। নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে এরা বিকল্প চিন্তার সিদ্ধান্ত নেয়। এই কারণে কৃষক শ্রেণী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। হাট বাজারে প্রচার করা হয় যে, যেহেতু মহকুমা প্রশাসক এবং জেলা মেজিস্ট্রেট তাদেরকে চক্রবর্তীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারছে না সেহেতু তারা নিজেরাই তাদের হত্যা করে ফাঁসিতে ঝুলবে। অন্যদিকে জমিদারদের গোমস্তা এবং পেয়াদাদের একটি দলকে পালাং থেকে অপহরণ করে নৌকায় নিয়ে যায় এবং পূর্ব সতর্কতামূলকভাবে রাত কাটায়। এই ঘটনায় পুলিশ ব্যাপক তল্লাশী চালায় কিন্তু কোনো নৌকা বা গোমস্তাদের খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। তল্লাশীর সময় পুলিশ স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে কোনো তথ্য পায়নি, এমনকি লোকেরা গোমস্তাদের কখনও দেখেনি বলেও জানায়। এই ঘটনাটিকে কেউ কেউ অলৌকিকভাবে ঘটেছে বলেও জানায় এবং বলে এটা ছিল এ ধরনের মন্তব্য 'আল্লাহর টিল' (শুদ্ধভাবে আল্লাহর চিল)। এটাকে নবীন সেন ফরায়েযীদের বিশেষ প্রচারণা বলে উল্লেখ করে। তখন হত্যাকেই ইঙ্গিত করে। পুলিশ নিঃসন্দেহ হয় যে, এদেরকে হত্যা করে মেঘনা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। পুলিশ এই বিষয়ে অসহায় হয়ে পড়ে, কারণ ফরায়েযীদের কাছ থেকে তারা কোন তথ্যই সংগ্রহ করতে পারেনি।[২৩]

এই ঘটনায় গুজব রটে যে, এরপর জমিদারদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে। এই গুজবে চক্রবর্তীরা ভয়ে এবং হতাশায় পরিবার নিয়ে ফরিদপুর শহরে চলে আসে। নিরাপত্তার জন্যে এরা সরকারি উকিল তারানাথের বাস গৃহে অবস্থান নেয়। এই ঘটনায় ফরায়েযীগণ সন্তোষ প্রকাশ করে। প্রশাসনও একই সঙ্গে সন্তুষ্ট হয়। ঐ ছাড়া এই ঘটনায় চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসা করার জন্য জমিদারগণের কাছে সুযোগ আসে।[২৪]

---

২১ ঐ।
২২ ঐ।
২৩ নবীন চন্দ্র সেন : আমার জীবন, খণ্ড-৩ : উল্লেখ্য যে 'আল্লাহর চিল' ফরায়েযীদের কাছে বহুল প্রচলিত। সম্ভবত 'চিল' শব্দটি মুদ্রণ প্রমাদের কারণে টিলের পরিবর্তে মুদ্রিত হয়।
২৪ ঐ, পৃ. ১৪৫ থেকে।

যদি নবীন চন্দ্র সেনের বিবরণ সঠিক হয় তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নয়া মিয়া ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের আগেই ফরায়েযীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নবীন সেনের বিবরণটি ছিল নিরপেক্ষ এবং সমসাময়িক। তাই এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে নয়া মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনের হারানো শক্তি এবং সম্মান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

জুমআ বিতর্ক

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা হাফিজ আহমদ মাদারীপুর সফরে আসেন। তিনি ফরায়েযী মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। এর ফলে লোকজনের মধ্যে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এই উত্তেজনা শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত করার হুমকী সৃষ্টি করলে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। এই অবস্থায় নবীন সেন হস্তক্ষেপ করেন এবং একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন। মাদারীপুরে একটি নির্দিষ্ট তারিখে উভয় পক্ষকে তাদের যুক্তি প্রদর্শন এবং যুক্তি খণ্ডনের সুযোগ দেয়া হয়। উভয়পক্ষ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং পুলিশের তত্ত্বাবধানে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। নবীন সেন এটাকে 'জুমআর যুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেন। এই বিতর্কে প্রায় ৫০০০ লোক উপস্থিত থাকে এবং তা সাত ঘণ্টাব্যাপী চলে। কিন্তু বিতর্ক অমীমাংশিতভাবেই শেষ হয়।[২৫]

বিতর্কের কার্যবিবরণী একটি বাংলা পুঁথি 'মাহজির নামা' তে প্রকাশিত হয়।[২৬] নবীন চন্দ্রের বিবরণে আমরা জানতে পারি যে, নয়া মিয়া ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ফরায়েযী মতবাদ সফলতার সঙ্গে তুলে ধরেন। নয়া মিয়ার পড়াশুনা সাধারণ মানের হলেও আমরা মনে করতে পারি যে, তিনি খলিফা আবদুল জব্বারের সাহচর্যে জ্ঞানের উন্নতি ঘটান। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে খলিফা আবদুল জব্বার ছিলেন নয়া মিয়ার একজন অভিভাবক, যিনি সে সময়ে ধর্মতত্ত্ববিদ[২৭] হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। ১২৮৯[২৮] বাংলাসন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নয়া মিয়া মক্কায় হজ্জ করতে যান। মক্কা থেকে ফিরে আসার ছয় মাস পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর। তাকে বাহাদুরপুরে সমাহিত করা হয়।

খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ (১৮৫৫-১৯০৬)

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নয়া মিয়ার মৃত্যুর পর দুদু মিয়ার তৃতীয় ও সবচেয়ে ছোট পুত্র সাইদ উদ্দীন আহম্মদ ফরায়েযীদের নেতা মনোনীত হন। তিনি বাহাদুরপুরে ১৮৫৫ খ্রি./১২৬১ বাংলাসনে[২৯] জন্ম গ্রহণ করেন। ফরিদপুরের মুন্সী বশীর উদ্দীনের[৩০] কাছে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে তাকে উচ্চ শিক্ষার্থে ঢাকায় পাঠানো হয়।

২৫ ঐ, পৃ. ১৫০ থেকে।
২৬ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ১১।
২৭ দেখুন, পরিশিষ্ট-জ এবং ৭ম অধ্যায়।
২৮ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ১১।
২৯ ঐ।
৩০ ঐ।

সেখানে তিনি খ্যাতনামা দার্শনিক মওলানা দীন মোহাম্মদের কাছে[৩১] ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান শেখার সুযোগ পান। যখন ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মোহসিলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি এই মাদ্রাসার ছাত্র হন।[৩২] তিনি এখানে মওলানা 'উবায়েদ উল্লাহ উবায়েদীর কাছে বেশ কিছুদিন শিক্ষা লাভ করেন।[৩৩] সাইদ উদ্দীন ঢাকায় বিয়ে করেন এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযীদের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে প্রায়ই ঢাকায় অবস্থান করতেন।

সাইদ উদ্দীনের নেতৃত্ব

ফরায়েযীগণ নেতা হিসেবে সাইদউদ্দীন দূরদর্শীতার সঙ্গে সরকারের প্রতি সহযোগিতা প্রদানের নীতি অব্যাহত রাখেন যা তাঁর বড় ভাই নয়া মিয়া অনুসরণ করেছিলেন। ১৩০৪ বাংলাসন, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে[৩৪] ভারত সরকার তাকে 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ফরায়েযীদের একটি অংশ সন্দেহের চোখে দেখত। এই অংশটি আন্দোলনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলেও ধীরে ধীরে আন্দোলন থেকে নিজেদের[৩৫] গুটিয়ে নেয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি নওয়াব সলিমুল্লাহকে সমর্থন করেন।[৩৬] সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি তাঁর উত্তরাধিকারী রশিদ উদ্দীনের (প্রকাশ বাদশাহ মিয়া) সময়েও অব্যাহত থাকে। এই নীতি বাংলাসন ১৩১৯/১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অটুট থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিসমূহ যখন তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈরিতা প্রদর্শন করে, তখন ফরায়েযী নেতা বৃটিশদের প্রতি সহযোগিতার নীতি ত্যাগ করেন।[৩৭] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফরায়েযীগণ সম্পূর্ণ হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে যখন বৃটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলো তুর্কী সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। ফরায়েযীগণ তুর্কী সুলতানকে মুসলিম জাহানের খলিফা বলে বিবেচনা করত।[৩৮] ১৩২৮ বাংলা সন, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ্ মিয়া খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই কারণে তাকে গ্রেফতার করে কারাদণ্ড দেয়া হয়।[৩৯]

সাইদ উদ্দীনের সময় থেকে ফরায়েযীদের সঙ্গে তাইউনীদের বিরোধ চরমে উঠে। এই দুই মতাদর্শের ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাছ) চলতে থাকে। বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল বাংলার গ্রামগুলোতে জুমাআ এবং ঈদের[৪০] নামাজ পড়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা। এই কারণে ফরায়েযী আন্দোলনের পূর্ণ গতির সময় ফরিদপুর এবং আশেপাশের অঞ্চলের মুসলিম সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত

৩১ সাইদ উদ্দীনের পরিবারে প্রচলিত; তাঁর সহপাঠি ফরিদপুরের মওলবী কফিল উদ্দীনের পরিবার কর্তৃক সমর্থিত। পরিশিষ্ট-ছ।
৩২ দেখুন, মুনশী রহমান আলী তৃয়েশ, তারিখ ই ঢাকা ১৯১০, পৃ. ২৪৫।
৩৩ সাইদ উদ্দীনের পরিবারে প্রচলিত বিবরণ।
৩৪ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ১৩।
৩৫ সাইদ উদ্দীনের পরিবারে প্রচলিত তথ্য।
৩৬ ঐ।
৩৭ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ১৮।
৩৮ ঐ, পৃ. ১৮-১৯।
৩৯ ঐ, পৃ. ১৯-২০।
৪০ নুরর ই মোহাম্মদ : পুঁথি- পৃ. ১২৩ থেকে।

হয়ে পড়ে। এক অংশ 'জুমআওয়ালা' এবং অপর অংশ 'বেজুমআ ওয়ালা' হিসাবে পরিচিত ছিল। ১৩০৯ বাংলা সন/১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ কুমিল্লা দাউদকান্দিতে জুমআ প্রশ্নে দুটি 'বাহাছ' অনুষ্ঠিত হয়।[৪১]

প্রথম বিতর্কে (বাহাছ) ফরায়েযীদের নেতৃত্ব দেন খলিফা আবদুল জব্বার এবং বিরোধীদের নেতৃত্ব দেন মওলবী ইউসুফ আলী।[৪২] ফরায়েযী পুঁথিগুলোতে দাবি করা হয় যে, ফরায়েযী খলিফা তাঁর জোরালো যুক্তির মাধ্যমে সফলভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং বিরাট সমাবেশকে বুঝাতে সক্ষম হন যে গ্রামগুলোতে জুমাআ নামাজ পড়া আইন সম্মত নয়।[৪৩]জুমআ নামাজ অনুষ্ঠানের পক্ষের শক্তির এই পরাজয়ে চরম উত্তেজনা দেখা দেয় এবং আরেকটি 'বাহাছ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই বাহাছে উদ্যোক্তাগণ সমসাময়িক খ্যাতনামা ধর্মতত্ত্ববিদগণকে নিমন্ত্রণ করে। মওলানা বারাসত আলী জৌনপুরীর আত্মীয় মওলবী মোহসিন জৌনপুর এই সময়ে পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন। তিনি ফরায়েযী বিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলান। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই সময় দাউদকান্দির কাছাকাছি মাথাভাঙ্গা গ্রাম সফর করছিলেন। নয়াকান্দিতে তাঁর মোকাবেলা করার জন্য ফরায়েযীদের আহবান করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের পূর্ব সময়ে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করেন।[৪৪] ফরায়েযীগণ নির্দিষ্ট দিনে খলিফা আবদুল জব্বার এবং মওলবী সানাউল্লাহর নেতৃত্বে দাউদ কান্দিতে পৌছেন।[৪৫] এরা দুজনেই ছিলেন যোগ্য ও বিতর্কে অভিজ্ঞ কৌশলী। পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে সমালোচনাকে নিজেদের পক্ষে আনতে সক্ষম হন এবং বিতর্কে জয়ী হন।[৪৬]

খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদ বাংলা সন ১৩১২/১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বিহারের মধুপুরে অবসর কাটানোর সময় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লাশ গ্রামের বাড়ি বাহাদুরপুরে আনা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।[৪৭] তিনি ছিলেন দয়ালু চিত্তের একজন ব্যক্তি এবং বন্ধু বৎসল। ধনী গরীব সকলের প্রতি তিনি ছিলেন অমায়িক। তিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান। কারণ তাঁর'চারপাশে ছিলেন একদল জ্ঞানী ধর্মতত্ত্ববিদ। এরা ছিলেন আবদুল জব্বার, মওলবী সানাউল্লাহ, মওলবী কফিল উদ্দিন আহমদ[৪৮] এবং মওলবী আবদুল হাই।[৪৯] তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে যান[৫০] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু খালিদ রশীদ উদ্দীন আহমদ প্রকাশ বাদশা মিয়া ফরায়েযীদের নেতা নির্বাচিত হন। এই গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত হওয়ার সময় বাদশাহ মিয়া ১৩ ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

---

৪১ ঐ, পৃ. ১২৬-১৩৩।
৪২ ঐ, পৃ. ১১৭।
৪৩ নাজিম আল দীন : পুঁথি, পৃ. ১১১-১১৯।
৪৪ ঐ, পৃ. ১১৭-১১৯
৪৫ মওলবী সানাউল্লাহ সম্পর্কে দেখুন, পরিশিষ্ট-ঝ
৪৬ দুরর মোহাম্মদ : পুঁথি, পৃ. ১৩৪-১৩৮। এবং নাজিম উদ্দীন : পুথি পৃ. ১০৭-১০।
৪৭ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ১৪।
৪৮ দেখুন, পরিশিষ্ট-ছ।
৪৯ দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট-জ।
৫০ দেখুন, গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফরায়েযীদের ধর্মীয় মতাদর্শ

ফরায়েযী আন্দোলনের শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময় ধরে আন্দোলনের চরিত্র প্রায় সর্বাংশে ছিল ধর্মীয়। দুদু মিয়া[১] অনুসৃত আর্থ-সামাজিক নীতি এই আন্দোলনে নুতন মাত্রা যুক্ত করে। এই কারণে পূর্ববাংলা এবং আসামের সাধারণ কৃষকশ্রেণী এই আন্দোলনের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়। যদিও এই আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করেছিল, তা সত্ত্বেও এর ধর্মীয় চরিত্র ফরায়েযী অনুসারীগণ উপেক্ষা করেনি।

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, ফরায়েযীগণ নিজেদেরকে 'হানাফী' মযহাবের[২] অন্তর্ভুক্ত মনে করে। ফরায়েযীদের এই আলাদা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ইতিহাসানুরাগীদের আকৃষ্ট করে। কারণ তাদের মতাদর্শ মূল্যায়নে প্রথমত বাংলায় মুসলিম শক্তি পরাজিত হওয়ায় এখানকার বিভিন্ন সমস্যা যেমন সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। দ্বিতীয়ত ফরায়েযী আন্দোলন মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে উনিশ শতকের সংস্কার মনস্ক মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ইসলামের আদি শিক্ষা সমাজে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন এবং বাংলার মুসলিমদেরকে কুসংস্কারমুক্ত করে বিশুদ্ধ সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল মুসলিমদেরকে তওবা করার জন্য আহবান করা, যার মাধ্যমে পূর্বের পাপ মোচন করে আত্মাকে বিশুদ্ধ করার পথ প্রদর্শন করা। এই নীতিকে বলা হয় 'তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পর তিনি মুসলিম সমাজকে নবী ও সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ পালনের আহবান জানান। সুতরাং 'তওবা' পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই 'ফরজ' মতবাদ এর প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট হয়।[৩] 'ফরজ' এর প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়ায় এই আন্দোলনকে বলা হয় 'ফরায়েযী'। তৃতীয়ত কোরআন অনুযায়ী তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি গুরুত্বরোপ করে বলা হয় যে, এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব কিছুই ত্যাগ করতে হবে। চতুর্থত জুমা এবং ঈদের নামাজের প্রশ্নে ফরায়েযীগণ বাংলার অন্যান্য মুসলিমদের থেকে আলাদা মত পোষণ করে। এবং পঞ্চমত কোরআন এবং হাদিসে নেই এমন সব ধরনের প্রচলিত আচার এবং উৎসবাদি ফরায়েযীগণ পরিত্যাগ করার আহবান জানায়। বর্ণিত পাঁচটি নীতি নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

---

১ দ্রষ্টব্য, গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়।

২ দেখুন, গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩ ব্যাখ্যার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।

(১) 'তওবা' হাজী শরীয়তুল্লাহর মতে 'তওবা' হল জীবনের বিগত পাপসমূহের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে পাপাচার করবে না এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করা।[৪] তওবা করার পদ্ধতি হল উস্তাদ (আধ্যাত্মিক প্রদর্শক) শাগরিদকে বা শিষ্যকে মুখোমুখি বসিয়ে নিম্নোক্ত শপথ করাবেন।[৫] 'আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে সমস্ত শেরেক, বেদাত, নাফরমানি অন্যায়, অত্যাচার করিয়াছি সমস্ত হইতে তওবা করিলাম এবং ওয়াদা করিতেছি যে আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করিব এবং হজরত রসুলুল্লাহ্ (দঃ) সুন্নত, তরীকা মোতাবেক চলিব। (লেখকের কাছে বাদশাহ মিয়া প্রদত্ত বক্তব্য)।

ফরায়েযী সম্প্রদায়ে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তিকে 'তওবার মুসলিম' বা মুমিন বলা হয়। সে অন্যান্য ফরায়েযীদের মতোই সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। 'তওবা' মতবাদটি ফরায়েযী সংস্কারের প্রধান ফটক বলা যায় যা উদ্ধৃত শপথে প্রতিফলিত হয়েছে।

'তওবা করার পদ্ধতিকে ফরায়েযীগণ 'ইস্তিগফার'[৬] বা সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা বলে। এটাকে 'ইকরারী বাইয়াতও' বলা হয়। যাঁর অর্থ উস্তাদ এবং শাগরেদ পরস্পরকে স্পর্শ না করে শপথ নেয়া। ঐতিহ্য অনুযায়ী পীরদের শপথের চেয়ে ফরায়েযীদের শপথ এই ক্ষেত্রে পৃথক। পীরগণ সাধারণত শাগরেদের হাতে নিজের হাত রেখে 'বাইয়াত পরিচালনা করে থাকে। এই ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে পীরের আশীর্বাদ মুরিদের কাছে পৌছানো হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত। ফরায়েযীগণ এই ধরনের 'বাইয়াতকে বেদাত হিসেবে পরিত্যাগ করে এবং এই প্রক্রিয়াকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করে। এটাকে 'দাস্তি বাইয়া' বলে আখ্যায়িত করে। কোরআন অথবা সুন্নাহতে নেই বলে ফরায়েযীগণ তা মনে করে। অন্যদিকে ফরায়েযীগণ 'ইকরারি বাইয়াত' নবীজীর কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলে দাবি করে। তবে প্রকৃত পক্ষে নবীজী হাতে হাত রেখেই রাইয়াত করেছেন এবং পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, রাসূলের হাতের উপর আল্লাহর হাত বিদ্যমান। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ বাংলা ভাষায় 'তওবা' পরিচালনা করতেন। বাংলা ভাষায় শপথ পরিচালনা করার উদ্দেশ্য ছিল 'তওবাকে সহজবোধ্য করা এবং অশিক্ষিত মুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করা। সাধারণ মুসলিমগণ আরবি, ফার্সী বা উর্দু জানত না। এমন কি হান্টার বলেন 'প্রতি দশজনের একজন মাত্র ইসলামের সাধারণ বিষয় : কলিমা পুনর্ব্যক্ত করতে পারত।[৭]

(২) ফরায়েদ-ফরায়েয, ইসলামের অবশ্য পালণীয় কর্তব্যসমূহকে পালন করা, ফরায়েযী সংস্কারসমূহের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য, যা এই আন্দোলনের নামে পরিস্ফুট। 'ফরায়েযী' শব্দটি দিয়ে হাজি শরীয়তুল্লাহ আল্লাহ এবং নবীজীর নির্দেশিত কর্তব্যসমূহকে বুঝাতে চেয়েছেন, যা তওবার মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু তিনি ইসলামের ৫ টি মৌলিক বিষয় পালনের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হলো

৪ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২২।
৫ তৎকালীন ফরায়েযী নেতা বাদশা মিয়া প্রদত্ত।
৬ আরবী ক্রিয়াপদ 'গাফার' থেকে 'ইসতিগফার' শব্দটি এসেছে যাঁর অর্থ ক্ষমা করা।
৭ W.W.Hunter : Englands work in India, মাদ্রাজ, ১৮৮৮, পৃ. ৪৭ থেকে।

৮—

(ক) কালিমা (খ) নামাজ বা সালাত (দিনে পাঁচ ওয়াক্ত) (গ) রোজা বা সাওম (ঘ) জাকাত এবং (ঙ) হজ্ব।[৮] ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী প্রথম তিনটি বিষয় ধনী গরীব নির্বিশেষে পালণীয় এবং শেষোক্ত দুটি বিষয় শুধু বিত্তশালীদের দ্বারা পালনীয়।[৯]

ফরায়েযী পুঁথিগুলোতে আমরা ইসলাম সম্পর্কে ফরায়েযীদের ধারণা প্রকাশিত হতে দেখি। নিম্নে আংশিক বর্ণিত হল ঃ[১০]

"সে পানি পাইল যাবে দরাক্ত ইমান তবে
তাজা হৈল হুকুমে আল্লাহ।
তৈয়ব কলেমা যেই ইমানের মূল সেই
দিনে দিনে হৈল ওস্তত্তার +
রোজা যে বাগানের কলি নামাজ তাহাতে অলি
জাকাত বুলবুল খোশ লাহান ॥
হজ্ব সে গাছের ডাল শুন যত নেক হাল
মালদার যেই মোছলমান +
এই পাঁচ হৈতে যত দোশালা তেশালা কত
দীন এছলামির খুবি হৈল।

দুরর ই মোহাম্মদ এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কারণ হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন মক্কা থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি বাংলায় 'ঈমানের পানি'র অভাবে মৃতপ্রায় ইসলামকে দেখেন।[১১] কৌতূহলের বিষয় হলো যে, হান্টারও এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "একশত বছর পূর্বে বাংলায় মোহাম্মদীয় ধর্ম মৃতপ্রায় ছিল।[১২] বাংলায় ইসলামের এই করুণ অবস্থা হঠাৎ করেই যেন মূল্যবান বিষয় হয়ে উঠে। এর কারণ ছিল বাংলায় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুসলমানদের ব্যর্থতা। কুসংস্কার এবং দুর্নীতিতে মুসলিম সমাজ ডুবে যায়। বাংলায় ইসলামের পুনর্জাগরণে হাজীর চমকপ্রদ সাফল্যে যে অলৌকিকতা ছিল না সে ব্যাপারে দুরর ই মোহাম্মদ সচেতন ছিলেন। কারণ একজন খাঁটি ফরায়েযী হিসাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ বিশ্ব জগতের কল্যাণ চেয়েছিলেন। আল্লাহর প্রদত্ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে তিনি তা করেছিলেন। সুতরাং লেখকের মতে হাজী শরীয়তুল্লাহর সাফল্য এসেছে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান এবং সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে।

ফরায়েযীগণ নিজেদেরকে 'হানাফী' হিসাবে দাবি করে থাকে। মতাদর্শিক এবং আইনী উভয় ক্ষেত্রেই ফরায়েযীগণ 'হানাফী' মযহাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।[১৩] ধর্মীয় কর্তব্য পালনে এরা কড়াকড়ি মনোভাব পোষণ করত। উদাহরণস্বরূপ জেমস্ টেইলরের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। টেইলর ছিলেন, হাজী শরীয়তুল্লাহ'র সমসাময়িক। তিনি

৮ দ্রষ্টব্য, ওয়াজির আলীর, মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৩২ থেকে এবং দুরর ই মোহাম্মদ : পুঁথি, পৃ. ১১ থেকে।

৯ ঐ।

১০ দুরর ই মোহম্মদ : পুঁথি, পৃ. ১১-১২।

১১ ঐ, পৃ. ১০-১২।

১২ W.W.Hunter : Englands work in India, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৭।

১৩ দ্রষ্টব্য, JASP, খণ্ড-৩, ১৯৫৯, পৃ. ১৯৮ থেকে।

বলেন "ফরায়েযীগণ অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে অধিক কড়াকড়ি প্রকৃতির নৈতিকতার অধিকারী ছিল।[১৪] ইসলামের পাঁচটি মূলনীতি পালনে উস্তাদ এবং খলিফাগণ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যে সকল অঞ্চলে ফরায়েযীগণ বাস করতেন সে সবস্থানে উস্তাদ ও খলিফাগণ যেকোন ধরনের গাফিলতির জন্য তাদের অনুসারীদের সতর্ক করে দিতেন।

(৩) তওহীদ বা আল্লাহর একত্ব ইসলামী পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা হিসাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ কোরআন ভিত্তিক তওহীদ বা আল্লাহর একত্বের ধারণাকে গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। এই ধারণাটি তওবার পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ'র একত্ব বিষয়ক মতবাদটি ফরায়েযী সমাজে কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং তওহীদ এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব বিষয়কে বিলোপ করা হয়। আল্লাহ'র একত্ব সম্পর্কে ফরায়েযী মতবাদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এই মতবাদ শুধু 'ফরায়েযী'দেরকে আলাদা সম্প্রদায় হিসেবেই চিহ্নিত করেনি বরং সনাতন সমাজের সঙ্গে এর সরাসরি সংঘাত সৃষ্টি করে, যা মতবাদের ব্যাখ্যা এবং অনুসরণের মধ্যে প্রতিভাত হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর স্ব-ধর্মের লোকদের মধ্যে তওহীদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করানোর জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তওবার বিভিন্ন ফর্মুলার মধ্যে তা স্পষ্ট হয়। তওহীদ সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ এই ব্যাখ্যায় শুধু আল্লাহ'র একত্ব সম্পর্কে ধারণা ছিল। তিনি 'ঈমান' অথবা ধর্ম বিশ্বাসকে দুটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেন যথা (ক) আল্লাহ'র একত্বে বিশ্বাস করা এবং তার উপর দৃঢ় ভাবে আমল করা (খ) অন্য কিছুর সঙ্গে আল্লাহর অংশীদারিত্ব সংযোগে বিরত থাকা।[১৫] সুতরাং তাঁর মতে তওহীদ শুধু একটি মতবাদ নয় বরং তার উপর বাস্তবে আমল করতে হবে। যে কোনো বিশ্বাস এবং কাজের সঙ্গে যদি নাস্তিকতা, শিরক অথবা বেদাতের সামান্যতমও সংশ্রব থাকে তাহলে তা হবে তওহীদ বিরোধী। এ ছাড়া হিন্দুদের আচার উৎসবে চাঁদা দেয়া, পীরদের প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি, ফাতিহা অনুষ্ঠান এবং এমন ধরনের অন্যান্য কর্মকাণ্ডকেও তিনি তওহীদ বিরোধী মনে করেন।[১৬] তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কেরামত আলী বলেন যে, 'খারিজী'এবং 'ফরায়েযীগণ' 'আমল' কে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করে থাকে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে প্রচারিত একটি প্রচারপত্রে তিনি বলেন।[১৭]

"বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশেষ করে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বরিশাল শহর ও ঐগুলোর আশপাশের এলাকার লোকদের অজ্ঞতার কারণে এরা" খারিজীদের ফাঁদে (বাংলা অঞ্চলের খারিজী অর্থাৎ ফরায়েযীগণ) পতিত হয়েছে। এই অজ্ঞতার কারণে এরা 'দীন' 'মযহাব আকায়িদ' ঈমান এবং আমলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সুযোগটি ফরায়েযীগণ ব্যবহার করেছে।

সুতরাং 'তওহীদ' সম্পর্কে ফরায়েযী মতবাদ মুসলিম সমাজের অনৈসলামিক কার্যকলাপ শুদ্ধি করণের বিষয়ে শুদ্ধিবাদী মতবাদ হিসেবে কাজ করেছে। সমসাময়িক এবং পরবর্তী লেখাসমূহের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

---

১৪ James Taylor : Topography, পৃ. ২৪৮।
১৫ নাজিম উদ্দীন : পুঁথি, পৃ. ৩.
১৬ ঐ, পৃ. ২-৪.
১৭ মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জাত ই ক্বাতি, পৃ. ৮৫, ৮৭, ৯৫ এবং ৯৭

(ক) জেমস্ টেইলর বলেন ঃ (ফরায়েযীগণ)[১৮] কোরানের কড়াকড়ি নিষেধ অনুযায়ী সকল উৎসবাদি যা কোরআন কর্তৃক অনুমোদিত নয় তা বাতিল বলে ঘোষণা করে।

(খ) ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার লিখেছেন ঃ (হাজী শরীয়তুল্লাহ্)[১৯] ঈমান অনুযায়ী 'কুফর' এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন অথবা সকল অনুষ্ঠানাদি ও আচার যা বেদাত এবং আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারিত্বের বা শিরকের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিয়েছিলেন।

(গ) এইচ বেভারিজ বলেন যে, ফরায়েযী আন্দোলন "প্রিমিটিভ চার্চ আন্দোলনের মত, মোহাম্মদের মৌলিক মতবাদে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল" এবং "কুসংস্কারপূর্ণ আচার, যেগুলো কালের বিবর্তনে হিন্দু বা অন্যান্য বিধর্মীদের কাছ থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল, তা পরিত্যাগের আহবান করেছিল" এই আন্দোলন।[২০]

'তওহীদ' সম্পর্কিত মতবাদের মধ্যে আমরা আরব দেশে ওয়াহাবী এবং ফরায়েযীদের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য দেখতে পাই।[২১] প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা তাদেরকে পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের শরীক করেছিল।

(৪) জুমআ এবং ঈদের নামাজ ঃ বাংলার অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে ফরায়েযীদের পার্থক্য ঈদ এবং জুমআর নামাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফরায়েযীগণ এই দুই ধরনের নামাজ বৃটিশ আমলে স্থগিত ঘোষণা করে। এই নামাজগুলো ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলোতে পুনরায় শুরু করা হয়।[২২] ফরায়েযীগণ মনে করে যে হানাফী আইন অনুসারে 'মিসর আল জামি'-তেই (অর্থাৎ যেখানে প্রশাসক এবং কাজী উপস্থিত আছে ও যাঁরা মুসলিম সুলতান দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত) শুধু এই নামাজসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়া বৈধ। সুতরাং 'মিসর আল জামি' হল একটি নির্দিষ্ট শহর যা আইন দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং ফরায়েযীগণ মনে করে যে, ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় এই ধরনের কোন শহর নেই।

সাপ্তাহিক জুমআর নামাজ বা ঈদের নামাজের বৈধতা সম্পর্কে বিতর্ক ফরায়েযীদের আবিষ্কার নয়। এই ধরনের বিতর্ক দিল্লী সালতানাত প্রতিষ্ঠার সময়ে দেখা যায়। ১৩৪৪ খ্রিস্টাব্দে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয় সাপ্তাহিক জুমআ এবং ঈদ সম্পর্কে। এই সময়ে মোহাম্মদ বিন তুঘলক সুলতান ছিলেন এবং তিনি কায়রো থেকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি গ্রহণ করেননি বলে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণ এই বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, একই বছরে সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে এই বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অনেক বিতর্কের পর সুলতানের শিক্ষক "বুতলঘ খান" তাকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, কোন রাজতন্ত্রই খলিফার স্বীকৃতি ছাড়া বৈধ নয়। এরপর সুলতান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, সংগঠিত ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবন

---

১৮ James Taylor : Topography, পৃ. ২৪৯।
১৯ W.W.Hunter (ed) : Imperial Gezetteer of India, খণ্ড-৬, পৃ. ৩৯৯.
২০ H.Beveridge : District of Bakergang পৃ. ২৫৪।
২১ বর্তমান গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে বিধৃত।
২২ দেখুন, পরিশিষ্ট "ক"।

খলিফার অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। এই কারণে তিনি ঈদ এবং জুমআর নামাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। সুলতান যখন খলিফা থেকে একটি ফরমান বলে স্বীকৃতি পান তখন এই নামাজসমূহ[২৩] পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। মুসলিম আইনজ্ঞদের মধ্যেও জুমআ এবং ঈদ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিতর্ক সৃষ্টি হয় মূলত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। এগুলো হল (ক) আমির অর্থাৎ খলিফা এবং পরবর্তী সময়ে সুলতান বা তাঁর প্রতিনিধি (খ) স্থানের গ্রহণযোগ্যতা বা স্থানটি মিসর আল জামি কি না। 'আমির'এর উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা দেখেছি। মিসর আল জামি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

পূর্বকালে আইন বিশারদগণ সাধারণভাবে এই সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন যে, জুমআ বা ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানের[২৪] পূর্বশর্ত হলো 'মিসর আল জামির' অস্তিত্ব। কিন্তু মিসর আল জামির ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। ইমাম শাফী মনে করেন যে, "যেখানে ৪০ বা তাঁরও বেশী ব্যক্তি বাস করে সেখানে জুমআ বা ঈদের নামাজ পড়া অত্যাবশ্যকীয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সঙ্গে ইমাম শাফী সম্পূর্ণ একমত। ইমাম মালিক চল্লিশজনের কম বাস করে এমন স্থানেও এ সকল নামাজ আদায় করা অত্যাবশ্যক মনে করেছেন। হানাফী আইন বিশারদ উপরোক্তমতকে গ্রহণ করেন নি । তবে মিসর আল জামি বিষয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ 'মিসর আল জামি' সম্পর্কে বলেন, যেখানে আমির (প্রশাসক) এবং কাজী (বিচারক) বাস করেন এবং যাঁরা ইসলামের দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইন বলবৎ করে থাকেন।[২৫] ধারাটির অংশ "যিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বলবৎ করেন" বিষয়ে অন্য একটি বিশ্বস্তসূত্র থেকে জানা যায় যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ 'মিসর আল জামি ছাড়া যে, সকল অঞ্চলে কর্তৃত্ব করে না সেখানে শরিয়া অথবা এর কোন অংশ বলবৎ করতে পারে না।[২৬] এই মতটি ইমাম আবু হানিফার মত বলেও বলা হয়ে থাকে। যদিও তার কাছ থেকে ভিন্ন একটি মত বর্ণনা করা হয়েছে যা তাঁর মত বলে সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। শেষোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা 'মিসর আল জামি বলেছেন যে সকল অঞ্চলের লোকেরা সবচেয়ে বড় মসজিদের অভাবে সুবিন্যস্তভাবে জমায়েত হতে পারে না। অন্য কথায় তিনি একটি বড় সংখ্যার লোকদের জমায়েত প্রসঙ্গে বলেছেন। তৃতীয় একটি সূত্র মতে ইমাম আবু হানিফা 'মিসর আল জামি' সে সকল অঞ্চলকেই বলেছেন যেগুলোতে রয়েছে রাস্তাঘাট, গলি, বাজার এবং যাঁর সঙ্গে অধিক সংখ্যক গ্রাম যুক্ত। তাছাড়া যেখানে ওয়ালি বা গভর্নর বাস করেন।

---

২৩ দ্রষ্টব্য, I. H. Qureshi : Sultanate of Delhi, পৃ. ৩৩-৩৫ এবং "Fascsimile of the Memoir of Muhammad bin Tughlaq in Agha Mahdi Husain's. The Rise and Fall of Muhammad bin Tughlaq, London, 1938. Persian Text at the end.2, Fols and English Translation, পৃ. ১৭৪।

২৪ উদাহরণ হিসাবে শেখ বোরহান উদ্দীন মারঘিনানী এই বিষয়ে তাঁর 'হিদায়ায়' আলোচনার সূত্রপাত করেন। এইভাবে : জুমা শুধু মিসরে বৈ বা মিসর এর উপকণ্ঠে বৈধ কিন্তু ক্বুরা বা গ্রামে নয়; (দ্রষ্টব্য, হিদায়া, লাহোর তারিখবিহীন, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৮)।

২৫ ঐ, এবং আল্লামা আইনী আল-হানাফী : উম্দাত আল ক্বারী লি : শারহ আহিহ্ আল বুখারী, খণ্ড-৩, পৃ. ২৬৪।

২৬ শেখ বুরহান উদ্দীন মারঘিনানী : হিদায়া, পূর্বোক্ত, খণ্ড-১, পাদটীকা (হাসিয়া)-৬ এবং ৭নং মওলানা আবদুল হাইকৃত

যিনি ন্যায় বিচারের দ্বারা অত্যাচারী থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা করেন। এছাড়া গভর্নরের কাছে যে কোন বিপর্যয়ের সময় নির্ভরশীল গ্রামের লোকেরা যেন আসতে পারে।[২৭]

উপরন্তু পূর্বকালের হানাফী আইনবিশারবৃন্দ ঈদ এবং জুমআর নামাজ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ছয়টি শর্ত আরোপ করেছেন। এগুলো হল (ক) স্থানটি মিসর আল জামি হতে হবে (খ) মুসলিম শাসক অথবা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি (গ) নামাজের জন্য নির্ধারিত সময় (ঘ) জামায়াত অথবা জামায়েৎ (ঙ) নামাজের স্থানে সকলের প্রবেশাধিকার[২৮]। প্রথম দুটি শর্ত মুসলিম শাসিত দেশ ছাড়া যেহেতু পূরণ করা সম্ভব নয় সেহেতু আইন বিশারদগণ 'দারআল হারব'এ বসবাসরত মুসলিমদের জন্য উক্ত নামাজসমূহ আবশ্যকীয় মনে করেননি।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা লাভের পর ভারত পূর্বের মতো 'দার আল ইসলাম' হিসেবে বিবেচিত হবে না 'দারআল হারব' হিসাবে চিহ্নিত হবে ? এই বিষয়ে আইনবিদগণের মতামত চাওয়া হয়। এই সমস্যাটি জুমআ এবং ঈদের নামাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কারণ ভারত যদি 'দার আল হারব' হয়ে থাকে তাহলে এর অধিবাসীদের জন্য জুমআ বা ঈদের নামাজ পড়া আবশ্যকীয় হবে না। সুতরাং দেশের মর্যাদা চিহ্নিত করতে গিয়ে জুমআ ও ঈদের নামাজের বিষয়টিও আলোচ্য হয়ে উঠে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে হান্টারের বর্ণনা এই বিষয়ে বেশ আলোকপাত করে। তিনি লিখেন যে, যখন ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসন ধীরে ধীরে মুসলমানদের হাত থেকে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হাতে চলে যায়, তখন অনেক ধর্মপরায়ণ মুসলিম উত্তেজিত হয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা সে সময়ে সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দিল্লীর শাহ্ আবদুল আজিজের সঙ্গে আলোচনা করেন। শাহ্ আবদুল আজিজ ফতোয়া প্রদান করে বলেন যে, যখন বিধর্মীরা একটি মুসলিম দেশ দখল করে, তখন মুসলিমদের পক্ষে সেখানে অথবা আশেপাশে বাস করা সম্ভব নয় অথবা যদি বিধর্মীদের উৎখাত করা বা তা মনে পোষণ করা সম্ভব না হয় অথবা যদি বিধর্মীদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাতে মুসলিমদের পক্ষে অনুমতি ছাড়া রাজস্ব আদায় করা সম্ভব না হয় বা পূর্বের মতো নিজেদেরকে নিরাপদ মনে না করে, তাহলে ঐ দেশ অবশ্যই 'দার আল হারব' বা শত্রুদেশ হিসাবে পরিগণিত হবে।[২৯] অষ্টাদশ শতকের শেষ দুই দশকের সময় বাংলায় নিঃসন্দেহে এই অবস্থা বিরাজ করছিল।

উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে যখন ব্রিটিশ শক্তি পুরোপুরি সুসংহত হয়, তখন মুসলিম আইনবিদদের সিদ্ধান্ত হান্টারের মতে অনুমানের চেয়ে বাস্তবরূপে দেখা দেয়।[৩০] পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ মওলবী আবদুল হাই তাঁর ফতোয়ায় বলেন যে, দিল্লী থেকে কলিকাতা পর্যন্ত খ্রিস্টান সাম্রাজ্য এবং হিন্দুস্তান সংলগ্ন অন্যান্য প্রদেশসমূহ

---

২৭ ঐ, পৃ. ১৪৮। দেখুন, মওলানা আবদুল হাইকৃত পাদটীকা-৬–৭ এবং আল্লামা আইন আল হানাফী 'উমদাত আল ক্বারী লি সাহিহ্ আল বুখারি পূর্বোক্ত, খণ্ড-৩ পৃ. ২৬৪ থেকে।

২৮ দ্রষ্টব্য, শেখ বুরহান উদ্দীন, হিদায়া, পূর্বোক্তি, পৃ. ২৪৮-২৫১।

২৯ W.W.Hunter : Indian Musalman's, পৃ. ১৪২-৪৩।

৩০ ঐ।

(অর্থাৎ ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহ) 'দার আল হারব'। কুফর এবং শিরক সর্বত্র বিরাজমান এবং কোথাও ইসলামের আইনসমূহের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। এবং যখনই কোনো দেশে এই ধরনের পরিস্থিতি থাকে তখন দেশটি দার আল হারব।[৩১]

হান্টার বলেন, উক্ত মতামত বাস্তবে ফল দেয়। ওয়াহহাবীগণ যাঁদের ধর্মীয় আবেগ তাদের জ্ঞানের চেয়ে বেশী ছিল, তাঁরা দেশটিকে শত্রু দেশ হিসাবে বিবেচনা করে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তিনি আরও লিখেন যে, মুসলিমদের শিক্ষিত অংশ 'দুঃখজনকভাবে' বিষয়টি গ্রহণ করে এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন সংক্ষিপ্ত করে শুক্রবারের নামায থেকে নিজেদের বিরত রাখে। এমন কি কিছু মসজিদ এই বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করে।[৩২] বাস্তব ঘটনা হলো যে, হান্টার ফরায়েযীদের উল্লেখ করে কিছু বলেননি, তা সত্ত্বেও তাঁর উল্লেখিত কিছু উদাহরণ উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে পাওয়া যায়।[৩৩]

"সুতরাং কলিকাতার সবচেয়ে খ্যাতিমান দুইজন মুসলমান, তাদের নিজেদের জীবনে অর্থাৎ মাদ্রাসা আলীয়ার প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ ওয়াজিহ্ এবং প্রাক্তন কাজী উল কুজ্জাত ফজলুর রহমান শুক্রবারের নামাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। তাঁরা ভারতকে শত্রুদেশ হিসাবে বিবেচনা করে তাদের ধর্মীয় জীবনকে সংক্ষিপ্ত করেন। কিন্তু তাঁরা অনুগত নাগরিক হিসাবে এবং ব্রিটিশ সরকারের সম্মানিত চাকুরে হিসেবে বসবাস করেন। সুতরাং প্রথমত জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানের অনুমতি সম্পর্কে মুসলিম শাসনের অনুপস্থিতি ও দ্বিতীয়ত দার আল হারব বিবেচিত হওয়ায় শিক্ষিতদের একটি অংশ জুমআ থেকে বিরত থেকেছে। যাহোক, ফরায়েযীগণ অবশ্য দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, অর্থাৎ দেশ 'দার আল হারব' না 'দার আল ইসলাম'। কিন্তু ফরায়েযীগণ স্থান সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছে অর্থাৎ স্থানটি মিসর আল জামি কি না । এখানে মুসলিম শাসক বা তাঁর প্রতিনিধি রয়েছে কি না। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত ফরায়েযী খলিফা আবদুল জব্বার এবং মওলানা কেরামত আলীর বিতর্কে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। যখন মওলানা ভারতের রাজনৈতিক স্থান সম্পর্কে বিতর্ক করার আহবান করেন তখন খলিফা এই বিষয়ে বড় ধরনের আপত্তি করেন। এর ফলে বিষয়টি আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দেন।[৩৪]

ফরায়েযীদের একটি ফতোয়া (এটি বর্তমান লেখক কর্তৃক সংগৃহীত) জুমআ নামাজের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে।[৩৫] "আল্লাহর নামে যিনি ক্ষমাশীল এবং মহান। বাংলার গ্রামে নবীজীর সুন্নত এবং ফিকাহ্ অনুসারে জুমআর নামাজ সঙ্গতিপূর্ণ কি না ? অনুগ্রহপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

তাদের উত্তরে ফরায়েযী উলেমাগণ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অবস্থান সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি কিন্তু উলেমাগণ পূর্বের হানাফী মতানুসারে জুমআ নামাজ

৩১ ঐ।
৩২ ঐ।
৩৩ ঐ।
৩৪ দেখুন, মওলানা কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃাতি পৃ. ১০৪ থেকে।
৩৫ ফরায়েযী ফতোয়া (দেখুন ১ম অধ্যায়)

গ্রামসমূহে অনুমোদনযোগ্য নয় বলে মত দেন। ছহী বুখারির খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকারি আল্লামা আইনী থেকে উলামাগণ উদ্ধৃতি গ্রহণ করে ফরায়েযী ফতোয়া প্রদান করেন।[৩৬]

"বিজ্ঞ আইনবিদগণ জুমআ নামাজের স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ইমাম মালিক বলেন, যে স্থানে একটি মসজিদ বা বাজার আছে সে স্থানের লোকদের উপর জুমআর নামাজ বাধ্যতামূলক। ইমাম শাফী এবং ইমাম আহমদ বলেন, প্রতিটি লোকালয় যেখানে রয়েছে চল্লিশজন মুক্ত মানুষের বসতি, যাদের রয়েছে সাবালকত্ব, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাঁরা শীত ও গ্রীষ্মে স্থান থেকে স্থানে যায় না (শুধুমাত্র সাময়িক প্রয়োজন ব্যতীত) যাদের বসতগৃহ পাথর, বাঁশ কাদা অথবা অন্যান্য যে কোন সামগ্রী দিয়ে তৈরি এবং বাসগৃহসমূহ একসঙ্গে কাছাকাছি অবস্থিত তাদের উপর জুমআ বাধ্যতামূলক। কিন্তু যদি বাসগৃহসমূহ বিক্ষিপ্ত (অন্যান্য লোকালয়ে) থাকে তাহলে আইনগতভাবে তাদের উপর জুমআ অনুমোদনযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানিফা মত প্রকাশ করেন যে, মিসর আল জামি অথবা এর সন্নিহিত অঞ্চলে (মাসালা আল মিসর) জুমআর নামাজ আইন সম্মত নয় এবং জুমআ গ্রামসমূহে আইনানুগ নয়।

একই ফতোয়াতে ফরায়েযীগণ বক্তব্য প্রদান করে বলেন যে, হাদিসের এবং নবীর সাহাবাগণের মতের আলোকে এবং হানাফী মযহাবের মতামত, অন্যান্য মযহাবের মতামতের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। এর পর ফরায়েযীগণ তাদের মতের সমর্থনে নবীজীর হাদিস এবং সাহাবাগণের মতামত থেকে তাদের সমর্থনে একটি দীর্ঘ আলোচনা করে এবং নিম্নোক্ত উপসংহারে উপনীত হয় ঃ

(ক) 'মিসর আল জামি' তেই শুধু জুমআ বৈধ 'যেখানে আমির কাজি বা হাকিম বাস করেন' সুতরাং এরা যেখানে বাস করে না সে স্থানকে 'মিসর আল জামি' বলা যাবে না। সুতরাং উক্ত স্থানে জুমআ বৈধ নয়।

(খ) সঠিকভাবে বলতে গেলে বাংলার অধিকাংশ গ্রামেই তখন মসজিদ ছিল না। এমনকি কিছু এবাদত খানা থাকলেও এগুলোকে ওয়াকফ সম্পত্তি নেই বলে মসজিদ আখ্যায়িত করা যায় না। তাহলে এ গ্রামগুলোকে কিভাবে 'মিসর আল জামি' বলা যায় এবং কেমন করে এগুলোতে জুমআ আদায় করা যায় ?

আমরা ভুল বুঝাবুঝি ও কুসংস্কার থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থী।[৩৭] সুতরাং 'মিসর আল জামি'কে কেন্দ্র করেই মূলত ফরায়েযীদের যুক্তি ছিল'। ফরায়েযীদের মতে একটি স্থানে অবশ্যই আমির বা কাজি অথবা হাকিমকে বাস করতে হবে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ শাসনে বাংলার কোন শহর বা গ্রাম ফরায়েযীদের ফতোয়ায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না (অর্থাৎ বৈধ কোন মুসলিম শাসকের মাধ্যমে কোন প্রশাসক ছিল না।) ফরায়েযীগণ ব্রিটিশ শাসনামলে জুমআ আদায়ের কোন যৌক্তিকতা দেখেনি।

সনাতন সমাজে অবশ্য জুমআ আদায় করা চলছিল। যদিও দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। হান্টার এদের সম্পর্কে লিখেছেন অনেক মুসলিম ভারতে

---

৩৬ তুলনীয়, 'আল্লামা ' আইনী আল হানাফী : উমদাত আল-ক্বারী লি শারহ সহিহ্ আল বুখারী, পূর্বোক্ত, খণ্ড-৩ পৃ. ২৬৪।

৩৭ দ্রষ্টব্য, ফরায়েযী ফতোয়া (দেখুন বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়)।

রাজনৈতিক পরাজয় মেনে নিয়ে শুক্রবারের জুমআ নামাজ ত্যাগ করেনি।[৩৮] মওলানা কেরামত আলী ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রচার করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন বহাল থাকা সত্ত্বেও এটা 'দার আল ইসলাম'। কারণ এখানে জনগণের নিরাপত্তা বেসামরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।[৩৯] এমন কি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দেও তিনি ভারতকে দার আল ইসলাম হিসাবে বিবেচনা করেন যা পূর্ব থেকেই ছিল। এই যুক্তির ভিত্তিতে তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্য জুমআ ফরজ হিসাবে মনে করেন।[৪০] উপরন্তু মওলানা কেরামত আলী যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, জুমআর নামাজ হল ইসলামের বৃহৎ সৌধগুলোর একটি যা যে কোন পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। একই সাথে তদানীন্তন হারানো ভারতীয় রাজ্যকে গ্রহণ না করার কোন উপায় ছিল না। জুমআ আদায়ের বিষয়ে অনুমতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে সন্দেহ ছিল তা দূর করাও সহজ ছিল না। তিনি এই কারণে স্বাভাবিক জুমআ নামাজের সঙ্গে চার রাকাত জোহরের নামাজ যুক্ত করার কথা বলেন।[৪১] যাতে করে জুমআ নামাজ আদায়ে যদি কোন ঘাটতি থাকে তাহলে তা পূরণ করা যাবে।

প্রকৃত পক্ষে, শেষের প্রস্তাবটি যা জুমআর সঙ্গে জোহরের নামাজ যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে তা মওলবী কেরামত আলীর প্রস্তাব নয়। এটি শাহ্ আবদুল আজীজ এর পরামর্শ ছিল। বিধর্মী শাসনামলে জুমআর নামাজ আদায়ে বাঁধা থাকার কারণে জোহরের[৪২] নামাজ আদায়ে একই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে কি না, এই বিষয়ে শাহ্ আবদুল আজীজের (১৭৪৬-১৮২৩) মতামত জানতে চাওয়া হয়। শাহ্ আজীজ উত্তর দেন যে, "পূর্বের হানাফী স্কুল সুলতান এবং তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জুমআ আদায়ের শর্ত আরোপ করেছিল। চেঙ্গীস খানের সময়ে হানাফী আইনবিদগণ অবশ্য মত দেন যে যদি বিধর্মী শাসক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং কোনো শহরে মুসলিম গভর্নর নিয়োগ করে থাকে তাহলে মুসলিম গভর্নর সুলতানের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করে জুমআ এবং ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবে। নুতন পরিস্থিতিতে তারা পূর্বের শর্ত প্রয়োজনানুযায়ী সহজ করেন। এটা 'ফতোয়া ই আলমগিরী'তে বলা হয়েছে, মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন যে, বিধর্মীদের শাসনামলে জুমআ আদায় অনুমোদনযোগ্য এবং পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে মুসলমানগণ একজন কাজী নিয়োগ করতে পারে কিন্তু তাঁদের অবশ্যই মুসলিম শাসনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। সতর্কতা হিসেবে মুসলিমগণ জুমআ নামাজের অতিরিক্ত হিসেবে চার রাকায়াত জোহরের নামাজ আদায় করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে।[৪৩]

ফরায়েযীগণ জুমআ এবং জোহরের নামাজ একত্রে আদায় করার বিষয়টি গ্রহণ করতে পারেনি। এই ধরনের নিয়মের বিরুদ্ধে ফরায়েযীগণ মত প্রকাশ করেছে যা

---

৩৮ W.W.Hunter, Indian Musalmans, পৃ. ১৪৩.

৩৯ দ্রষ্টব্য, মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জাত ই ক্বাতি, পৃ. ১০৪ থেকে

৪০ দ্রষ্টব্য, Abstract of proceedings of the Mohamedan literary Society of calcutta of a meeting held at the Residence of Maulvi Abdul Lutif Khan Bahadur in 23 Nov. 1870, Lecture of Mulavi Karamet Ali, পৃ. ৫ থেকে এবং W.W. Hunter : Indian Musalmans, পৃ. ১৩৯-৪০।

৪১ দেখুন, মওলবী কেরামত আলী মিফতাহ্ আল জামাত, ৩য় সংস্করণ হিজরী ১২৫১, পৃ.১৫৯থেকে.

৪২ দ্রষ্টব্য, শাহ্ আবদুল আজিজ 'ফতোয়া ই আজিজি, খণ্ড-১, পৃ. ৩২ এবং খণ্ড-২, পৃ. ৪.

৪৩ ঐ, খণ্ড-১, পৃ. ৩২ এবং খণ্ড-২, পৃ. ৪.

দুরর ই মোহাম্মদ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন[৪৪] "মযহাবে এর (জোহর বা আখেরি জোহর জুমআর সঙ্গে আদায় করা) কোন ভিত্তি নেই। এটি পরবর্তী সময়ের কিছু ধর্মতত্ত্ববিদের আবিষ্কার মাত্র। নিজস্ব বাসগৃহে জুমআ আদায়ের অনুমোদনের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে ধর্মতত্ত্ববিদগণ উক্ত মত প্রদান করেন।

গ্রামাঞ্চলে জুমআ আদায়ের সাধারণ যে ব্যবস্থা রয়েছে এ বিষয়েও ফরায়েযীগণ ভিন্নমত পোষণ করে। আরব দেশের ক্বারিয়ার (যা মিসর বা শহর নয়) সঙ্গে বাংলা অঞ্চলের গ্রামসমূহে তুলনা করে ফরায়েযীগণ জুমআ এবং ঈদকে গ্রামাঞ্চলে আইন সম্মত নয় শুধু বলেনি বরং তা মাকরুহ তাহরিমা মনে করে।[৪৫] উপরোক্ত ফরায়েযী ফতোয়া সম্পর্কে আহল ই হাদিসের সমালোচনার জবাবে ফরায়েযীদের মন্তব্য।[৪৬] কিন্তু 'আহল ই হাদিস' নামের নুতন সম্প্রদায় যাঁদের কোন নির্দিষ্ট ইমাম নেই তাঁরা কোন বাছ বিচার না করে সকল স্থানে জুমআ আদায় করছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট করে ধারণা নেয়া যায় যে, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণের প্রদর্শিত সংস্কার মতবাদের ফরায়েযী বা অনুসারী ছিল না। অন্য দিকে তরিকা ই মোহাম্মদীয়া, আহল ই হাদিস এবং তাইউনী একভাবে বা অন্যভাবে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর সংস্কার কর্মসূচীর অনুবর্তী ছিল। জুমআ সম্পর্কিত ফরায়েযী মতাদর্শ এই আন্দোলনের অন্যতম মূল বিষয় ছিল। মিসরের সালাফিয়া আন্দোলন[৪৭] (গিব মনে করেন) বা আরবের ওয়াহাবী ঐতিহ্যের সঙ্গে ফরায়েযী সংস্কার কর্মসূচীর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। সুতরাং ফরায়েযী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা স্থানীয়ভাবেই উৎসারিত যা সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই ঘটনাবলীসমূহ থেকেই ফরায়েযী মতাদর্শ বিকশিত হয়।

আমরা দেখেছি যে, জুমআ বা ঈদের নামাজ সম্পর্কে ফরায়েযীদের প্রধান আপত্তি ছিল আমির এবং কাজীর অনুপস্থিতির বিষয়ে, যা উক্ত নামাজ আদায়ের বিষয়ে শর্ত ছিল। ব্রিটিশ পূর্ব মুসলিম প্রশাসনে কাজীকে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও আরও বিবিধ দায়িত্ব পালন করতে হতো। শরিয়া বা ইসলামী আইনের রক্ষাকর্তা হিসেবে মুসলিম সমাজকে সাহায্য এবং তত্ত্বাবধান করা ছিল কাজীর গুরুদায়িত্ব। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও পরে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রশাসনিক পরিবর্তনের ফলে কাজীদের ক্ষমতা এবং সুবিধাদি একতরফাভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, যা মুসলিম সমাজে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

জেমস্ ওয়াইজ লিখেছেন যে, ব্রিটিশ আধিপত্যের পূর্বে বাংলায় কাজী পদটিকে বলা হতো মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় পদ। নওয়াব কর্তৃক কাজী নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও দিল্লীর কাজী আল কুজ্জাতের অধস্তন ছিল মাত্র। কাজী আইন প্রশাসন এবং মুসলিম ছেলে মেয়েদের শিক্ষা বিষয়টি তত্ত্বাবধান করতেন। এছাড়া কাজী মুসলিমদের কাছে ধর্মের রক্ষণশীলতা বজায় এবং সকল ধর্মীয় বিতর্কের সমাধান করতেন।

---

৪৪ দ্রষ্টব্য, দুরর ই মোহাম্মদ : পুঁথি, পৃ. ৪১.
৪৫ ঐ, পৃ. ৮১.
৪৬ ফরায়েযী সম্পর্কে দেখুন, গ্রন্থের ১ম অধ্যায়.
৪৭ H.A.R.Gibb : Mohammedanism, 1955, পৃ. ১৩৮.

সারাদেশে সমভাবে ছড়িয়ে থাকা নায়েব বা সহকারীদের দ্বারা মুসলিমদের আধ্যাত্মিক জীবন পর্যবেক্ষণ করা হতো এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে দমন করা হতো। 'কাজীর ক্ষমতা ছিল বেশী' এর ফলে শাসন এবং জনসাধারণকে সমভাবে কাজীকে সমীহ করতে হতো। ওয়াইজ বলেন যে, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে দেওয়ানি চলে যাওয়ার পর এই ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। কাজীদের অস্তিত্ব থাকলেও ক্ষমতা ছিল না। এই কারণে অপরাধীদের কাছে কাজী কোন ভয়ের বিষয় থাকেন না। এরা 'ক্ষমতা ছাড়াই' বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তায় পরিণত হয়। যদিও তাদের কোন ধর্মীয় কর্তৃত্ব বা সালিশ করার কোন ক্ষমতা ছিল না।[৪৮] মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় কাজী এবং তাঁর সহকারীদের গুরুত্ব সম্পর্কে হান্টার উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অভিযোগের বিষয়ে হান্টার বলেন 'আইন কর্মকর্তার চাকুরির পদ বিলুপ্ত করায় হাজার হাজার পরিবারে দারিদ্রতা ও অনটন নেমে এসেছে মর্মে এরা আমাদের অভিযুক্ত করে। স্মরণাতীতকাল থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানে ধর্মের বিধান, প্রশাসনিক, প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামি আইনের রক্ষক ছিল। তাঁদের বিশ্বাস ও কর্তব্য পালনে বাধাদান করা হয়েছে মর্মে এরা আমাদেরকে অভিযুক্ত করে।[৪৯]

উপরোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ধারণা করা যায় যে, জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানে ফরায়েযী মতাদর্শ শুধু নামমাত্র আদর্শ ছিল না। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রশাসনিক পরিবর্তন ছিল মুসলিম সমাজের প্রতি স্বার্থহানিকর যা মুসলমানদের অনুভূতির বিরুদ্ধে যায়। ফরায়েযীগণের মতাদর্শ এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ছিল। ফরায়েযীগণের মতাদর্শে আমির, কাজী এবং হাকিম সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা এই মতের প্রতি সমর্থন বলা যায়।

প্রকৃত পক্ষে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন মারাঠা শক্তি মোগল ভারতকে বিপর্যস্ত করেছিল, তখন থেকেই মুসলমানদের মনে ভারতের মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু হান্টার বলেন "মারাঠা শক্তি যখন রাজস্বের এক চতুর্থাংশ 'চৌথ' হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের সন্তুষ্ট করেছিল এবং প্রশাসনে আর হস্তক্ষেপ করছিল না, তখন ভারতকে দারউল ইসলাম হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। সেই সময়ের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টির কথা বলেনি। ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হান্টার স্বীকার করেন "বর্তমানে ভারতকে বিশ্বাসীদের ভূখণ্ড হিসাবে বিবেচনা করার মতো একটি কারণও দেখানো হয়নি।[৫০]

এই বিষয়টি খলিফা আবদুল জব্বারের মন্তব্যে প্রতিভাত হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত মওলানা কেরামত আলীর বিরুদ্ধে বিতর্ক করার সময় একজন ধর্মতত্ত্ববিদ পরামর্শ দেন যে, "মক্কার কোনো ফতোয়াকে ভিত্তি করে মুসলিম এলাকায় ইমাম নিয়োগ দান করে যদি নামাজ আদায় করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। সেই ক্ষেত্রে শহরের কোতোয়ালকে উদ্দেশ্য করে খলিফা উত্তর দেন, 'যদি আমরা ইমাম নিয়োগ করি তাহলে আপনি আমাদের হাতে হাতকড়া পড়াবেন।[৫১]

---

৪৮ James wise : Eastern Bengal. পৃ.২১.
৪৯ W.W.Hunter : Indian Musalmans. পৃ.১৪৮.
৫০ ঐ, পৃ.১৩৭.
৫১ মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃতি, পৃ. ১০৪ থেকে।

. সুতরাং উক্ত মন্তব্যের দ্বারা ভারতের মর্যাদা সম্পর্কিত বিতর্কে ফরায়েযীদের অংশ গ্রহণের অনীহার কারণ ধারণা করা যায়। সম্ভবত ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংঘাত হতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ফরায়েযীগণ বিতর্কে অংশ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সাপ্তাহিক নামাজ এবং ঈদের নামাজ পড়া স্থগিত করার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশকে দারুল হারব হিসাবে ফরায়েযীগণ বিবেচনা করেছিল।

(৫) জনপ্রিয় উৎসব এবং আঁচারানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফরায়েযীদের অভিমত ফরায়েযীদের তওবা মতাদর্শে আমরা দেখেছি যে, এর সঙ্গে শিরক, বেদাত এবং সব ধরনের অনৈসলামিক আচার যুক্ত ছিল। ফরায়েযীদের এই শুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি 'তওহীদ' এ দেখা যায়। সৃষ্টিকর্তার একত্বের পরিপন্থী যে কোন আচার এবং বিশ্বাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা 'তওহীদ' এর অংশ। স্বাভাবিক কারণেই হাজী শরীয়তুল্লাহ বহুসংখ্যক কুসংস্কার, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদি বিলুপ্ত করেন। কোন কুফর, শিরকই তাঁর সংস্কার থেকে বাদ পড়েনি। সমসাময়িক এবং পরবর্তী উৎস থেকে বিভিন্ন কুসংস্কারের তালিকা এবং বর্ণনা পাওয়া যায় যা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ফরায়েযীদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত করেন।

জেমস্ টেইলর লিখেছেন যে, ফরায়েযীগণ, পটি, চাট্টি এবং চিল্লা ত্যাগ করে যা একটি শিশুর জন্মদিন এবং চল্লিশদিনের সময় উদযাপিত হতো। ফরায়েযীগণ শুধু আকীকা অনুষ্ঠান পালন করত যা ইসলামী বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পুরুষ সন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করে অনুষ্ঠান করা হতো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মীয় এবং বন্ধুদের আপ্যায়ন করা হতো এবং শিশুর নাম রাখা হতো। তিনি আরও লিখেন যে, ফরায়েযীগণ শিশুর মাথার চুল কামানো বিবাহ এবং মৃত্যুর সময়ের অনুষ্ঠানকে অনাড়ম্বর করে। সকল অনৈসলামিক রীতিনীতি যেমন বিবাহের সময়ের মিছিল (শাবগাশত) এবং দাফনের সময়ের বিভিন্ন 'ফাতিহা' অনুষ্ঠান ত্যাগ করা হয়।[৫২] হাজী শরিয়তুল্লাহর সংস্কারাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে দুরর ই মোহাম্মদ লিখেছেন-[৫৩]

মোশ্রেকগণের কাম ছিল কালে কালে॥ খোয়াজের বেরা ভাসাইত জলে+গাজী ও কালুর দর্গা করিত তৈয়ার ॥

পুজিত তাহাকে যত মোশরেক গাঙার +
বিবি ফাতেমার দর্গা পূজিত যতনে ॥
বারমাস বার পূজা দিত জনে জনে +
নাচ বাদ্য রছম ফাতেহা মশরেকের ॥
আর যত বেদাত আছিল তাহাদের।
দশ হরা রথ যাত্রা চড়ক দেখিত ॥
পীরের নামেতে পূজা জনে জনে দিত +

৫২ দ্রষ্টব্য, James Taylor : Topography. পৃ. ২৪৯-৫০। এখানে উল্লেখ্য যে, ছত্রি হলো শুদ্ধভাবে 'ছটি' এবং 'চিল্লা' হলো 'অশুচিঘর'। দেখুন, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ৫০-৫২। 'ফাতিহা' হলো পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি স্মরণ করার অনুষ্ঠান। (এই গ্রন্থের ২য় অধ্যায়, সেকশন-খ)
৫৩ দুরর ই মোহাম্মদ পুঁথি, পৃ. ২৭.

দশেরা, রথযাত্রা এবং চড়ক পূজা ও দরবেশদেরকে পূজা করা ছিল মুসলিম সমাজের প্রচলিত আচার।[৫৪]

দুরর ই মোহাম্মদ আরও লিখেন[৫৫]

মহরমে এমাম হাছেন হোছেনের
হায় হায় জারি ছিল মশরেকগণের +
পাঁচ পীরের নামেতে মোকাম উঠাইয়া ॥
উপবাস করিত সে সকলে মিলিয়া +
প্রথম হায়েজ যদি হইত কাহার ॥
কলাগাছ গাড়িত বাড়ির চারিধার ॥
সে সব বেদাত এবে হইল মেছমার ॥
উঠিল এসলামি সূর্য্য গগন মাঝার +
হাজী শরিতুল্লা হেথা তশরিফ আনিয়া ॥
দীন জারি করিলেন বাঙ্গালা জুড়িয়া +

যদিও ফরায়েযীগণ সমাজে ব্যাপক সংস্কার প্রায় বিনা বাঁধায় করেছিল (যা উক্ত বর্ণনায় রয়েছে) তা সত্ত্বেও ফরায়েযীদের পীরবাদ, বর্ণপ্রথা এবং দাই নিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কার করতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের একটি অংশ থেকে বেশ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়।

(ক) **পীরবাদ ঃ** আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, হাজী শরিয়তুল্লাহ সুফিবাদের কাদেরিয়া মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষক তাহির সোম্বল এই বিষয়ে তাকে দীক্ষিত করেন। তিনি সুফিবাদকে ধর্মীয় জ্ঞানের উচ্চতর অংশ মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যে, কোনো ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পথে অনুশীলন করতে পারে তখনই, যখন সে শরীয়ত ও তরীকাত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তা না হলে একজন ব্যক্তি বিপথগামী হতে পারে। তাই হাজী শরিয়তুল্লাহ খাস্ (নির্বাচিত) এবং আম (সাধারণ) এর মধ্যে পার্থক্য দেখেছেন। শুধু প্রথমোক্ত ব্যক্তিরাই সুফিবাদে দীক্ষিত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।[৫৬] অন্যদিকে শেষোক্তদের কোরআন থেকে নিয়মিত তেলাওয়াত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। ইসলামের তওহীদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আচারসমূহের সঙ্গে পীরতন্ত্রকেও হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর সংস্কারের আওতায় আনেন। আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যবর্তী হিসেবে পীরদের বিবেচনা করা হতো।[৫৭] হাজী পীর-মুরিদ সম্পর্ককে উস্তাদ (শিক্ষক) এবং শাগরেদ (ছাত্র) হিসেবে আখ্যায়িত করার কথা বলেন। 'উস্তাদ এবং সাগরেদ'এই দুটি শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ

---

৫৪ বর্ণনার জন্য দেখুন, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ৯.

৫৫ দুরর ই মোহাম্মদ : পুঁথি, পৃ. ২৭.

৫৬ দেখুন, খলিফা আবদুল জব্বার উপস্থাপিত যুক্তি, মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জাত আল ক্বাতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪ থেকে।

৫৭ ঐ দ্বারা পূর্ববাংলায় পীরতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য, James wise, Eastern Bengal, পৃ. ১০-২০, এবং মওলবী কেরামত আলী, 'মাকামি আল মাবদাদি' (দাখিরা ই কারামত, খণ্ড-২, পৃ. ১৭৭-২০০) এবং মাকাশিফাত ই রাহমাত (দেখুন, ঐ, খণ্ড-১ পৃ. ১৩ থেকে।

সমর্পণ বুঝায় না, যা 'পীর' এবং'মুরিদ' শব্দ দ্বারা বুঝা যায়।[৫৮] হাজী শরীয়তুল্লাহ আরও অভিযোগ করেন যে, 'পীর' শব্দটি অপঅর্থে ব্যবহৃত হয়ে একটি দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে পীর শব্দটি কুসংস্কার ও অন্যান্য আচারে কলুষিত হয়ে পড়ে। এই সকল বৈশিষ্ট প্রকৃত এবং প্রবাদসম পীরদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে[৫৯] তাই তিনি 'পীর' শব্দটি বাদ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ পীরদের মৃত্যু বার্ষিকীতে উরস অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন, যা ফাতিহা হিসেবে বেদাত বলে তিনি মনে করেন। পীর মুরিদ সম্পর্ক হওয়ার সময় পীরের হাতে হাত রাখাকেও তিনি অনুমোদন করেননি। এই বিষয়টি নিয়ে খলিফা আবদুল জব্বার ও মওলানা কেরামত আলীর মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

(খ) **বর্ণপ্রথা সম্পর্কিত কুসংস্কার :** বাকেরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলার জনগরিষ্ঠ হিন্দু জনসংখ্যা ছিল চাণ্ডাল এবং নমশুদ্র। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণবাদের প্রচলন এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।[৬০]এই ধরনের বৈষম্যমূলক সামাজিক বৈশিষ্ট্য ফরিদপুর জেলার মুসলিম সমাজেও দেখা দেয়। সৈয়দ, শেখ, পাঠান এবং মোল্লা পদবিধারী ব্যক্তিরা ফরিদপুর জেলার মুসলিম সমাজে বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিল, যা হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায়। এদের মধ্যে গিরধা এবং গোপালগঞ্জের সৈয়দ বংশ গোষ্টির খন্দকারগণ, গোবরা বেলগাছি, খানপুর, কার্তিকপুর ও হবিগঞ্জের চৌধুরীগণ এবং বাঘডাঙ্গা ও গোপালপুরের কাজী পরিবার তাদের বংশের ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত ছিল।[৬১] অন্যদিকে জোলাহ্ (তাঁতি), বেলদার (খনক) নিকারী (মাছ সংগ্রাহক) কুলু (তেলী) কাহার বা চাকর (পাল্কীবাহক এবং পাখা চালক) এবং ধাই বা দাই, মুসলিম সমাজে নির্দিষ্ট বর্ণে চিহ্নিত হতো, যাদের সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানেরা বৈষম্যমূলক আচরণ করত।[৬২] উদাহরণস্বরূপ ওম্যালি লিখেছেন 'মুসলিম সমাজে একটি শ্রেণী ছিল যাদেরকে বলা হতো চাকলাই মুসলমান'। কারণ এদের পূর্ব পুরুষেরা-নাকি জেলেদের কাছে খোলা বাজারে মাছ বিক্রি করেছিল।[৬৩] বেভারিজ বলেছেন যে, বাকেরগঞ্জ জেলার মুসলমানগণ তাঁদের সমাজের বর্ণপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করতে ভালবাসতো এবং তাদের মধ্যে বেশ কিছু বিভক্তি ছিল। তিনি এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দেখিয়ে বলেন, 'চাকর' যাঁরা ছিল পাল্কীবাহক এবং পাখা চালক, এদেরকে অন্যান্য মুসলমানেরা হেয় চোখে দেখত। এরা বরিশালের কাছে বহু সংখ্যক বাস করত।[৬৪] ঢাকা শহরের বিবরণ দিতে গিয়ে শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক জেমস্ টেইলর বলেন, 'মুসলিম সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বেশ কয়েকটি বিভক্তি ছিল। তাদের জীবিকা এবং চাকুরির পদ অনুসারে যা ছিল বর্ণপ্রথার বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। বিয়ে

৫৮ James wise, Eastern Bengal, পৃ. ২২।
৫৯ ঐ, পৃ.১০-২০।
৬০ দ্রষ্টব্য, L.S.S.O.Malley : Bengal District Gazetteers : Fureedpore, ৪৬-৪৭।
৬১ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থের লেখক তাঁর সফরের সময় স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।
৬২ দেখুন, পরিশিষ্ট ক।
৬৩ L.S.S.O.Malley : Bengal District Gezetters, Jessore, পৃ. ৪৮ থেকে।
৬৪ H.Beveridge District of Bakergong, পৃ. ২৫৫ থেকে এদেরকে 'কাহার'বলা হতো।

এবং খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে এই বিভক্তি হিন্দুদের মতোই সুস্পষ্ট ছিল।[৬৫] জেমস্ ওয়াইজ বলেন যে, বাংলার মুসলিম সমাজ হিন্দুদের বর্ণপ্রথার অনেকাংশই অনুসরণ করে থাকে। পিতার পেশা পুত্র অনুসরণ করা সত্ত্বেও বৈষম্যের কোন হেরফের হতো না।[৬৬] এই সকল প্রমাণাদি দ্বারা ধারণা করা যায় যে, মুসলমান সমাজে কুসংস্কারমূলক বৈষম্য বহাল ছিল।

ফরায়েযী সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমান সমাজের বৈষম্যসমূহ গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন এবং এই ধরনের বৈষম্য গুরুতর পাপ হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, এই ধরনের বৈষম্য পবিত্র কোরআনের শিক্ষার বিরোধী। তিনি সকল মুসলমানের মধ্যে সাম্যনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। ফরায়েযী বা তওবার মুসলিমগণ যাঁরা আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছে, তারা পূর্বের পাপাচারের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং তারা অবশিষ্ট জীবন আল্লাহ'র রাস্তায় নিয়োজিত করবে[৬৭] তাদের নিজেদের মধ্যে বা বাইরে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যথাযথ নয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কাছে পূর্ণ সমর্থনের পর ফরায়েযীগণ সামাজিক বা মানবিক সুবিধাদি পাওয়ার বিষয়ে দাবি করতে পারে। রিওয়াজী বা যাঁরা সনাতন কুসংস্কার ও রীতি নীতি অনুসরণ করত এই ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে ফরায়েযীদের দাবি অগ্রগণ্য ছিল। সাম্যনীতির এই ঘোষণা বাস্তবে সুফল বয়ে আনে। এই নীতির ফলে অশিক্ষিত কৃষকশ্রেণী তাঁতি, কুলু, এবং ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর ও বাকেরগঞ্জের অন্যান্য মুসলমানগণ এই ধরনের ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঘটনাবশত হাজী শরীয়তুল্লাহকে তাঁর বিরোধীরা 'জোলার পীর'[৬৮] এবং ফরায়েযীদেরকে 'জোলার পোলা'[৬৯] রূপে আখ্যায়িত করে। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আমরা জানি যে, হাজী শরিয়তুল্লাহ ছিলেন তালুকদারের[৭০] সন্তান। তিনি জোলার সন্তান ছিলেন না যা জেমস ওয়াইজ দাবি করেন।[৭১] প্রচলিত কাহিনী অনুসারে হাজী শরীয়তুল্লাহ জোলাহ এবং কুলুদের পারিবারিক পদবি পরিবর্তন করে 'কারিগর' রাখেন। যাঁরা পবিত্র কোরআন পড়তে জানত এবং ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে যাদের ধারণা ছিল, তাদেরকে তিনি 'মোল্লা' নামে আখ্যায়িত করেন। পরবর্তীকালে ফরায়েযীদেরকে কোনো পদবি ব্যবহার না করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। বাস্তবে দেখা যায় যে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে ফরিদপুরের ৫৮৮,৫২২ মুসলমানের মধ্যে ৫৭৪,৭৪০ জন নিজেদেরকে পদবিহীনরূপে তালিকাভুক্ত করে। ১৪২ জন তাঁতি 'কারিগর' হিসাবে এবং ৬,০৩৬ জন জোলাহ্ হিসেবে নিজেদেরকে তালিকাভুক্ত করে।[৭২] সুতরাং উক্ত তথ্যাদি প্রচলিত কাহিনীকে সমর্থন করছে।

---

৬৫ James Taylor, Topogrephy, পৃ. ২৪৪.
৬৬ James wise, Eastern Bengal, পৃ. ৩৪.
৬৭ ঐ, পৃ. ২২।
৬৮ ফরিদপুরে প্রচলিত কাহিনী থেকে।
৬৯ দেখুন, এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়।
৭০ দেখুন, গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় এবং J.E.Gastrel : Jessore Fureedpore and Beckergonge, পৃ. ৩৬ : নং ১৫১ তিনি স্বীকার করেন যে, হাজী সাহেবের একটি পৈতৃক ছোট ভূখণ্ড ছিল।
৭১ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২২.
৭২ দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট 'ক'।

(গ) বর্ণ হিসেবে দাই এর প্রচলন ঃ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদম শুমারিতে ফরিদপুরের 'দাই'দেরকে মুসলিম সমাজের নির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। জেমস্ ওয়াইজ বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় 'দাইদে'র সংখ্যা ছিল খুব কম। এই বর্ণের অন্তর্গতরা ছিল মহিলা।[৭৩] যাহোক জীবিকা হিসেবে 'দাই' কে নিম্নমানের বিবেচনা করা হতো, বিশেষ করে এদের জীবিকা ছিল 'নবজাত, শিশুর নাড়িকর্তন এর সঙ্গে সংযুক্ত। জেমস ওয়াইজ বলেন যে, দাইদেরকে সাধারণভাবে 'নার কাটা' বলা হতো।[৭৪] কোনো অভিজাত হিন্দু বা মুসলিম নাড়ি কর্তন করত না যদিও প্রসবের সময় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মসম্পাদন করত।

ফরায়েযীগণ মনে করে যে, এই ধরনের কুসংস্কারপূর্ণ আচার হিন্দু প্রতিবেশী থেকে এসেছে।[৭৫] সুতরাং এই ধরনের আচার 'বেদাত' এই কুসংস্কার সন্তান প্রসবিনীর জন্য ছিল অত্যন্ত দুর্দশামূলক। 'দাই' মহিলাদের স্বল্পতার জন্য বিশেষ করে ফরিদপুর জেলায় প্রায়ই নাড়ি কর্তনের জন্য একজন 'মা'কে হয়ত সারাদিন বা তারও বেশী সময় ধরে অপেক্ষা করতে হতো। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ নাড়ি কর্তনের জন্য এককভাবে দাইকে ব্যবহার করার প্রচলিত আচারের বিরোধিতা করেন। তিনি নাড়ি কর্তনের জন্য পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা বা গ্রামের একজন বরিষ্ঠ মহিলা অথবা প্রয়োজনে সন্তানের পিতা নাড়ি কর্তন করতে পারবেন বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর এই মতের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজ প্রতিবাদ করে যা পরবর্তী সময়ে মওলানা কেরামত আলী ও খলিফা আবদুল জব্বারের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কে দেখা যায়। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়টি দেখতে পাবো।

(ঘ) ফরায়েযীদের পোষাক পরিচ্ছদ ঃ ফরায়েযীদের পোষাক পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য ইংরেজ লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে সংক্ষেপে তা দেখা যেতে পারে। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ তাঁর অনুসারীদেরকে ধূতির বদলে পাজামা বা লুঙ্গী পরিধান করতে বলেন। ধুতি ছিল হিন্দুদের জাতীয় পোষাক যা সে সময়ের বাংলার মুসলমানগণ পরিধান করত। তিনি উল্লেখ করেন যে, পাজামা বা লুঙ্গি নামাজ আদায়ের জন্য সুবিধাজনক। যদি কেউ প্রয়োজনে ধুতি পরিধান করে তাহলে তা দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে না টেনে সাধারণভাবে পড়তে হবে। এইভাবে পরিধান করলে[৭৬] নামাজ আদায়ে সুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন। ধুতি পরিধানের এই ধরনটি ইংরেজদের[৭৭] দৃষ্টিই শুধু আকর্ষণ করেনি বরং তাদের মনে সন্দেহও সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ হান্টার মনে করেন, বাহ্যিকভাবে একজন ফরায়েযী ধুতি পরিধানের সময় দুই পায়ের মাঝ দিয়ে না টেনে

৭৩ দেখুন, ঐ, ফরিদপুর জেলার ৫,৮৮,৫২২ জন মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৯৫ জন ছিল 'দাই'। আরও দেখুন, James Taylor : Topography, পৃ. ২৬৩।

৭৪ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ৫০

৭৫ ঐ, পৃ. ২২

৭৬ উক্তভাবে ধুতি পরিধান করায় ফরায়েযীদেরকে 'কাছা খোলা' বলা হতো। দেখুন, গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়।

৭৭ H.Beveridge : Bakergong পৃ. ২৫৫, W.W.Hunter (ed). Imperial Gazetteer of India, vol. iv, পৃ. ৩৯৯ এবং L.S.S.O.Malley : Bengal, Bihar and orissa, পৃ. ২১০।

দুই পায়ের চারদিকে ধুতি পরিধান করে থাকে, খ্রিস্টানদের ট্রাউজার পরিধানের সাদৃশ্য ত্যাগ করার জন্য।[৭৮] এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলমানদের পোষাক পাজামাই বরং হান্টার কথিত 'খ্রিস্টানদের ট্রাউজার' এর সঙ্গে এর বেশী মিল রয়েছে। ধুতি পরিধানের সঙ্গে ট্রাউজারের সাদৃশ্যই বরং নেই। প্রকৃতপক্ষে, হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ইসলামী নৈতিকতা অনুযায়ী অনুসারীদের উরু যাতে আবৃত থাকে, তাই তিনি করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং উপসংহারে বলা যায় যে, পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলমানদের মতো ফরায়েযীগণ হানাফী মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল যা বর্তমান অবধি রয়েছে। তাই তাঁরা হানাফী স্কুলের মতাদর্শগত এবং আইনগত ব্যবস্থা অনুসরণ করে। সুতরাং প্রকৃত ধারণায় ফরায়েযীগণ তাদের প্রতিবেশীদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের ছিল না। ফরায়েযীদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁরা বাংলার অবশিষ্ট মুসলিমদের থেকে ভিন্নতর ছিল। শুদ্ধিবাদের প্রতি জোর দেয়ার কারণে তা হয়েছিল। ফরায়েযী আন্দোলনের যুগটি ছিল দুর্নীতি ও স্খলনের একটি সময় যা ফরায়েযীদেরকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে চিহ্নিত করে।

৭৮ W.W.Hunter (ed) Imperial Gezetteer of India পৃ. ৩৯৯।

৯—

সপ্তম অধ্যায়

ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতি তাইউনী বিরোধিতা

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যায় যে, উনিশ শতকের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনসমূহ অর্থাৎ ফরায়েযী,তাইউনী,পাটনা স্কুল এবং আহল ই হাদিস পাশাপাশি সংগ্রাম করেছে 'সাবেকী'দের বিরুদ্ধে, যারা স্থানীয় আচার পালনে অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং এই আন্দোলন -সমূহের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত বেঁধে যেত। উপরন্তু যদিও এই আন্দোলনসমূহ 'সাবেকী' দের সকল কুসংস্কারপূর্ণ আচার ও অনুষ্ঠানাদি বাতিলের পক্ষে ছিল, তা সত্ত্বেও তাইউনী মধ্যপন্থী ছিল এবং সম্পুর্ণ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ফরায়েযী,পাটনা স্কুল এবং আহল ই হাদিস স্থানীয় আচার সম্পূর্ণ ত্যাগের পক্ষে থাকলেও তাইউনী আন্দোলন এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। মওলানা কেরামত আলী সমাজের কুসংস্কার এবং আচারের বিরুদ্ধে যেমন জোরালো প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি পাটনা স্কুল, ফরায়েযী এবং আহল ই হাদিসের বৈপ্লবিক আহ্বানেরও বিরোধিতা করেন।[১] উল্লেখ্য যে, মওলানা কেরামত আলী সংশোধিত আকারে ফাতিহা এবং কিয়ামের অনুমোদন দিয়েছেন, যা অন্য তিনটি আন্দোলন বাতিল করার পক্ষে ছিল। মওলানা কেরামত আলী এই বিষয়ে বেশকিছু গ্রন্থ ও পুস্তিকা লিখেন।[২] স্বাভাবিক কারণেই সাবেকী বা সনাতনপন্থীগণ মওলানা কেরামত আলীকে তাদের মুখপাত্র হিসেবে মনে করে। ফরায়েযী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাইউনী আন্দোলনের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে ফরায়েযী আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার ধরন অনুধাবন করা যাবে।

যদিও মওলানা কেরামত আলীর সঙ্গে ১৮৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে হাজী শরীয়তুল্লাহ'র সাক্ষাৎ হয়েছিল তা সত্ত্বেও ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ফরায়েযীদের সঙ্গে তাইউনীদের সরাসরি সংঘাত হয়নি। মওলানা কেরামত আলীর নিজের বিবরণ অনুসারে তিনি হাজী শরীয়তুল্লাহকে কলিকাতার গোলপট্টি মসজিদে হিজরী ১২৫২ তে (১৮৩৬-৩৭ খ্রি.) প্রথম দেখেন। এই দুইজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয় এবং খুব শীঘ্রই উভয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। মওলানা কেরামত আলী প্রস্তাব করেন যে, কিছু বিতর্কিত বিষয় জনসমক্ষে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মওলানার মতে হাজী শরীয়তুল্লাহ এই প্রস্তাবে রাজী না হয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে যান।[৩] মওলানার সাক্ষাত থেকে ধারণা করা যায় যে, দুইজনের মধ্যে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তা ছিল সাধারণ বিষয়ে, ফরায়েযী মতাদর্শ সম্পর্কিত নয়। তা সত্ত্বেও ধারণা করা যায় যে, এই দুইজন নেতার মাঝে এইভাবে বিরোধিতা শুরু হয়।

---

১ মওলানা কেরামত আলীর কুসংস্কার বিরোধী সমালোচনার জন্য দেখুন, হাক্ক আল ইয়াকিন, মাকাম আল মাকতাদিন এবং মাকাশিফাত ই রহমত দাখিরাই কারামত, খণ্ড-১ কলিকাতা, হিজরী ১৩৪৪ এবং সংস্কারবাদীদের সমালোচনার জন্য দেখুন বর্তমান গ্রন্থের ২য় অধ্যায়।

২ মওলানা কেরামত আলী কুওআত আল ঈমান এবং হাক্ক আল ইয়াকিন এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

৩ মওলানা কেরামত আলী : হুজ্জত ই ক্বাতি, পৃ. ৮৫-৮৬।

মওলানা কেরামত আলী জৌনপুর থেকে ১২৪০ হিজরী (১৮৩৫ খ্রি.) সালে কলিকাতায় আসেন এবং ১৮ বছর ধরে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জের[৪] ফরায়েযী প্রভাবিত এলাকায় সফর করেছেন। 'মুসলিম রত্নহারে' ওয়াজির আলী বলেছেন যে, হাজীর সঙ্গে মওলানার সংঘাত বাঁধে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে (১৮৩৯ খ্রি.) যে বছরটি ছিল হাজী শরিয়তুল্লাহ'র মৃত্যুর বছর।[৫]

সুতরাং মওলানার সঙ্গে হাজীর দ্বিতীয় সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে তা ঘটেনি। হাজীর সঙ্গে 'গোলপট্টি' মসজিদে প্রথমবার দেখা হলেও মওলানার সঙ্গে বরিশালের কাজী শফিউদ্দীনের বাড়িতে দুদু মিয়ার সাক্ষাৎ ঘটেছিল কোনো এক বৃহস্পতিবার।[৬] এই সাক্ষাতের কোন তারিখ পাওয়া যায়নি। জনপ্রিয় কাহিনী অনুসারে দুদু মিয়া ঢাকায় তাঁর শেষ অবস্থান (১৮৬০-৬২) শেষে বরিশাল গমন করেন, মওলানা কেরামত আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। বরিশাল ছিল তাঁর সদর দফতর। বাংলা থেকে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর দ্বিতীয়বার যখন মওলানা বাংলায় আসেন তখন সম্ভবত এই সময়টি ছিল। তিনি বলেন যে, এই মানুষটি হিন্দুস্তান থেকে একদিকে কলিকাতা, চট্টগ্রাম, সন্দীপ সফর করেন এবং অন্যদিকে ঢাকা থেকে সিলেট সফর করেন। তিনি পূর্ব ভারতের প্রায় সকল শহর এবং গ্রাম সফর করে ইসলামের মৌলিক আদর্শ তুলে ধরেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমার জীবনের ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়।[৭]

সুতরাং ফরায়েযী নেতা দুদু মিয়ার সঙ্গে মওলানার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের আগে নয়। ফরায়েযী উৎসসমূহ থেকে এই সাক্ষাতের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মওলানা দাবী করেন যে,'সাধারণভাবে সম্মত হওয়ার পর' দুদু মিয়া পরের দিনে জুমআর নামাজে অংশ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু তিনি রাতে নীরবে পালিয়ে যান।[৮] অন্যস্থানে মওলানা কেরামত আলী বলেন যে, বাংলার খারিজী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং দুদু মিয়াকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন এবং তাদেরকে মানসম্পন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে তাদের মতাদর্শকে আইনসম্মত প্রমাণ করার কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা তা করতে ব্যর্থ হন।[৯] সাক্ষাতের স্থানটি নিঃসন্দেহে বরিশালই ছিল।

এরপর থেকে মওলানা কেরামত আলীর সঙ্গে ফরায়েযী নেতাদের বেশ কয়েকবার বিতর্ক হয়। তিনি এমন একটি ধারণা দেন যে, তিনি ফরায়েযী ধর্মতত্ত্ববিদ, বিশেষ করে খলিফা মওলানা আবদুল জব্বারকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পশ্চাৎধাবন করেন। অবশেষে ১২৭২ বাংলা সন (১৮৬৭ খ্রি.) একটি বিতর্ক (বাহাস) অনুষ্ঠিত হয়।[১০] তিনি দাবী করেন যে ১২৭১ বাংলা সন (১৮৬৬ খ্রি.) প্রথম বিতর্ক ঝালকাঠিতে এবং দ্বিতীয় বিতর্ক একই জেলার বায়েজিদপুরে অনুষ্ঠিত হয়। খলিফা অবশ্য বলেন যে, এখানে কোন নিরপেক্ষ উলামা নেই যিনি সভাপতিত্ব করবেন। কারণ এখানকার সকল উলামাই

---

৪ মওলানা আবদুল বাতিন : সিরাত ই মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, ইলাহাবাদ, হিজরী ১৩৬৮, পৃ. ৫৩।

৫ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৯ দেখুন, পরিশিষ্ট-খ।

৬ মওলানা কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃাতি, পৃ. ৮৬.

৭ মওলানা কেরামত আলী : মুরাদ মুমেনীন, মওলানা আবদুল বাতিন কর্তৃক উদ্ধৃত : সিরাত ই মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৫.

৮ মওলানা কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃাতি, পৃ. ৮৬.

৯ ঐ, পৃ. ৮৬ এবং মওলানা আবদুল বাতিন : সিরাত প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬.

১০ মওলানা কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃাতি, পৃ. ১০৪।

ব্রিটিশদের অনুগত। যাহোক শেষ পর্যন্ত দুই দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ৬টি বিতর্কিত বিষয়ে দুই দল ফতোয়া রাখবে। এগুলো ছিল (১) বিশ্বাস এবং কাজের মধ্যে সম্পর্ক, (২) সুফিবাদে দীক্ষিত হবার প্রক্রিয়া, (৩) দাই নিয়োগ সম্পর্কিত, (৪) ঘাস ফড়িং আহার করা সম্পর্কিত, (৫) জুমআ এবং ঈদের নামাজ সম্পর্কিত (৬) 'মিসর আল জামি' সম্পর্কিত সংজ্ঞা। এই সম্পর্কিত ফতোয়াসমূহ একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বারা মক্কা শরীফের আইনবিদগণের নিকট পাঠানো হবে। পরের বছর বরিশালে উভয়পক্ষ জনসমক্ষে বিতর্ক আহবান করবে বলে স্থির হয়। বরিশালের কাজী শফি উদ্দীনকে মাধ্যম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। দুই পক্ষের ফতোয়াসমূহ তাঁর কাছে জমা দেয়া হয় সময়মত মক্কায় প্রেরণ করার জন্য।[১১] সুতরাং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তাইউনী এবং ফরায়েযীদের মধ্যে প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় প্রধান বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই দলের মধ্যে আরও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলেও উক্ত দুটি বিতর্ক সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বিতর্ক দুটিতে উভয়দলের মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত আমাদের কাছে প্রথম বিতর্কের পূর্ণ বিবরণী রয়েছে এবং দ্বিতীয় বিতর্কের অধিকাংশ বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। এই বিবরণীসমূহের বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে মওলবী কেরামত আলী প্রচারিত একটি ইশতেহার বিবেচনার দাবী রাখে। প্রথম বিতর্কের পূর্বে ইশতেহারটি পূর্ব বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। মওলবী তাঁর একটি পুস্তিকায় ইশতেহারটি যোগ করেছেন।[১২] ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে মওলানা কেরামত আলীর আপত্তিসমূহ সংক্ষেপে ইশতেহারে তুলে ধরা হয়েছে।

(১) মওলানা কেরামত আলী বলেন যে,ফরায়েযীগণ আমলকে ঈমানের অংশ হিসেবে মনে করে। ফরায়েযীগণের মতে, যে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করে কিন্তু দৈনিক নামাজ আদায় করে না সে কাফির। সুতরাং এর মৃত্যুতে জানাজা আদায় করা আইনসম্মত নয়। এই ধরনের মতে খারিজীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। মওলানা কেরামত আলী ফরায়েযীদের খারিজী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের 'বাংলার খারিজী' নাম দেন।[১৩]

(২) মওলানা কেরামত আলী ফরায়েযীদেরকে মসজিদের মিম্বর ভাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত করেন। ফরায়েযীগণ তাদের মতাদর্শ অর্থাৎ জুমআ'র নামাজ স্থগিত করার জন্য জবরদস্তিমূলকভাবে অনেক মসজিদের মিম্বর ভেঙ্গে ফেলে। তিনি জুমআ এবং ঈদের নামাজকে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন (শায়ের আল ইসলাম) যা যে কোনো পরিস্থিতিতে বর্জন করলে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তারা তাদের অস্বাভাবিক মতাদর্শ দ্বারা অন্যান্যদের বিপথগামী করছে।[১৪]

(৩) মওলানা কেরামত আলী সুফি প্রথা হিসাবে পীর এবং মুরিদের পরস্পর হাত রাখাকে সঠিক মনে করেছেন, যা ফরায়েযী মতাদর্শ অনুমোদন করে না।[১৫]

---

১১ মওলবি কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃাতি, পৃ. ৮৩ থেকে।

১২ দ্রষ্টব্য, দাখিরাত ই কেরামত, খণ্ড-১, কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরী, পৃ. ১০৮।

১৩ মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃাতি, কলিকাতা, হিজরী, ১৩৪৪, পৃ. ৮৭-৮৮ এবং ইশতিহার, দাখিরা ই কেরামত, খণ্ড-১, কলিকাতা, হিজরী, ১৩৪৪, পৃ. ১০৮৭ এখানে উল্লেখ্য যে, খারিজীরা সুন্নীদের বিরোধী অন্যতম প্রধান সম্প্রদায়। দ্রষ্টব্য, Encyclopaedia of Islam, খণ্ড-২, পৃ. ৯০৪-৯০৮, প্রবন্ধ 'kharijites এবং খণ্ড-৪, পৃ. ৫৫৫-৫৭ প্রবন্ধ সুন্নী (Sunna)।

১৪ দ্রষ্টব্য, মওলবী কেরামত আলী, দাখিরাত ই কারামত এ সন্নিবেশিত ইশতিহার। পৃ. ১০৮।

১৫ ঐ।

(৪) ফরায়েযীগণ মাতা পিতা কর্তৃক নবজাত শিশুর নাড়ি কর্তনকে ওয়াজিব মনে করে, যা মওলানা কেরামত আলী ইসলামী আইনের অপব্যাখ্যা মনে করেন।[১৬]

(৫) তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ফরায়েযীগণ ভুল ব্যাখ্যা করে পঙ্গপালের বদলে ঘাস ফড়িং খেয়ে থাকে।[১৭]

(৬) তিনি অভিযোগ করেন যে, ফরায়েযী নেতাগণ তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও অনুসারীদের কাছ থেকে সদকা ও ফিতরা নিয়ে থাকে।[১৮]

(৭) মওলানা কেরামত আলী অভিযোগ করেন যে, ফরায়েযী নেতারা সবধরনের অপরাধের জন্য অনুসারীদেরকে অন্যায়ভাবে জুতাপেটা করে থাকে।[১৯]

বরিশালের বিতর্ক : ১২৭২ বাংলা সন (১৮৬৭ খ্রি.) ১৯ শে আষাঢ় সোমবার হাজার হাজার ফরায়েযী এবং তাইউনী সমর্থকগণ বরিশালের শাহ্ সাহের মসজিদে জমায়েত হয়। এই স্থানটিকে মওলানা কেরামত আলী এবং খলিফা আবদুল জব্বারের বিতর্কের স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়। এই দুইজন অন্যান্য উলামাসহ বিতর্ক অনুষ্ঠানের স্থানে উপস্থিত হন। শহরের কোতোয়াল মওলবী মোহাম্মদ ফাজিলসহ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এখানে উপস্থিত থাকেন। বরিশালের চারজন খ্যাতিমান ধর্মতত্ত্ববিদকে বিচারক এবং শালিসকারী হিসেবে মনোনীত করা হয়। এরা ছিলেন (১) খান বাহাদুর আবদুল করিম, (২) খান বাহাদুর মফিজ উদ্দীন মোহাম্মদ, (৩) কাজী সিরাজ উদ্দীন মোহাম্মদ, (৪) সৈয়দ তাজাম্মুল আলী। এরা উক্ত ছয়টি বিষয়ে ছয়টি প্রশ্ন তৈরি করেন এবং উভয় পক্ষকে একের পর এক প্রশ্ন করেন।[২০]

প্রথমত যে প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয় সেটি ছিল, কোনো ব্যক্তি যদি রমজান মাসের রোজা না রাখে বা দৈনিক নামাজ আদায় না করে শুধু কালেমা পাঠ করে সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর জানাজা আদায় করতে হবে কি না ? এই বিষয়ে উভয় দল হানাফী এবং সুন্নী মতকে সমর্থন করে বলে যে, এরূপ ব্যক্তি একজন 'ফাসিক' কিন্তু 'কাফির' নয় যা খারিজীরা মনে করে। সুতরাং উভয় দল এ ধরনের ব্যক্তির মৃত্যুর পর জানাজার নামাজ আদায়ের পক্ষপাতি।[২১] এতে ধারণা করা যায় যে, ফরায়েযীগণ আমলকে ঈমানের অংশ মনে করে না। মওলানা কেরামত আলী এই অভিযোগে ফরায়েযীদের অভিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদেরকে খারিজী আখ্যায়িত করেন যা ছিল ভিত্তিহীন।

(২) দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করা হয় যে, সুফি মতাদর্শে দীক্ষিত করার সময় পীরের হাত মুরিদের হাতে রাখার বিষয়ে মত কী ?[২২] মওলানা কেরামত আলী দুই ধরনের বায়াতের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন (ক) বায়াত ই তাবারুক বা পীরের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য অঙ্গীকার এবং (খ) বায়াত ই ইদারাত বা সুফিবাদের অন্তর্নিহিত রহস্য জানার জন্য অঙ্গীকার। তিনি মনে করেন যে প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া সকলের আওয়াম (সাধারণ) এবং

---

১৬ মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জত ই কৃাতি, পৃ. ১০৫-১০৬.
১৭ মওলানা কেরামত আলী, দাখিরা ই কেরামত এ সন্নিবেশিত ইশতিহার, পৃ. ১০৮।
১৮ ঐ।
১৯ ঐ।
২০ ঐ।
২১ ঐ।
২২ মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জত ই কৃাতি, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৪ থেকে।

খাস (নির্বাচিত) এর জন্য উন্মুক্ত কিন্তু শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র খাস এর জন্য। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ার সময় পীর আইন সম্মতভাবেই মুরিদের হাতে হাত রাখতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার জন্য একজন মুরিদ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আসতে হবে।[২৩]

খলিফা আবদুল জব্বার সাধারণ মুসলমানদেরকে সুফি মতে দীক্ষিত করার বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি মনে করেন, যে সকল সুফি সফলতার সঙ্গে সুফিবাদের ধাপসমূহ অতিক্রম করে 'কুতব আল আকতাব' এ পরিণত হয়েছেন শুধু সে সকল সুফিরাই মুরিদকে তালিম দিতে পারে। অন্যদিকে সুফিবাদে দীক্ষিত হওয়ার জন্য একজন তালিবকে অবশ্যই ইসলামী আইন ও শরীয়া ও তরীকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাঁর অভিমতে দেখা যায় যে, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি সুফিবাদের রহস্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া বৃথা এবং একজন অপরিণত সুফি দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করাও অপ্রয়োজনীয়, কারণ তাঁর চোখসমূহ পর্দা থেকে মুক্ত নয়।[২৪] আমরা পূর্বে দেখেছি যে, দীক্ষা গ্রহণের সময় পীর ও মুরিদের হাতে হাত রাখার বিষয়টি ফরায়েযীগণ বিরোধিতা করেছে। এরা এটাকে 'দাস্তি বায়াত'বলেছে এবং এটি পাপাচার বলে বাতিল করেছে। সুতরাং ফরায়েযীগণ মৌখিক বা 'ইকরারি বায়াত'অনুশীলন করেছে।[২৫] এই যুক্তিটি বিতর্কের সময় খলিফা বাদ দিয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। তা না হলে মওলানা কেরামত আলী এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিতেন না। (৩) তৃতীয়ত প্রশ্ন করা হয় 'আপনি কী মনে করেন যে নবজাতক শিশুর নাড়িকর্তন শিশুর মা - বাবার নিজ হাতে করা ওয়াজিব ? অথবা আপনারা ভিন্ন কোন মত অনুসরণ করেন ? এই বিষয়ে উভয় দল একমত যে নাড়িকর্তন করা দাই বা কাবিলার পেশার অংশ। মা - বাবার নিজ হাতে নাড়িকর্তন করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু 'কাবিলা' শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করে। মওলানা কেরামত আলী এটার ব্যাখ্যা করেন 'দাই' (যাঁরা 'দাই' বর্ণ caste এর অন্তর্ভুক্ত) খলিফা আবদুল জব্বার 'দাই'কে বলেন 'দুধ পিলাই'। জনৈক মওলবী ইব্রাহিম বলেন 'কাবিলা' আরবি ভাষায় শাব্দিক অর্থ হল 'দাই-জিনাই' (অর্থাৎ 'দাই' পেশা)। শেষোক্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে খলিফা জব্বার একমত হন।[২৬]

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'দাই-জিনাই' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে খলিফা জব্বারের একমত হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। 'দাই-জিনাই' শব্দটি আরবি শব্দ 'কাবিলা'র সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। শেষোক্ত শব্দটি প্রকৃতই 'দাই' পেশার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা সমাজের যে কেউ অনুসরণ করতে পারে। 'দাই' সংস্কৃত ভাষার 'ধাত্রী' থেকে এসেছে। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় এর দুটি অর্থ রয়েছে (ক) ধাত্রী এবং (খ) ধাত্রী মাতা।[২৭] এখানে 'দাই' মুসলিম নিম্নবর্ণের বংশাণুক্রমিক পেশাকে বুঝানো হয়েছে যা 'নীড় কাটা' শব্দে প্রতিফলিত হয়েছে।[২৮] কিন্তু ধাত্রী মাতা বা দুধ পিলাই এমন একজন মহিলা যিনি সমাজে কিছু হলেও শ্রদ্ধার পাত্রী। ফরায়েযীগণ বংশাণুক্রমিকভাবে নিয়োজিত 'দাই'

---

২৩ ঐ।
২৪ ওলবী কেরামত আলী : হুজ্জত ই কাতি, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৪ থেকে.
২৫ দেখুন, বর্তমান গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়।
২৬ ঐ।
২৭ দ্রষ্টব্য, James wise. Eastern Bengal, পৃ. ৫০
২৮ দেখুন গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল যদিও এই পেশার বিরোধী ছিল না। সুতরাং স্বেচ্ছা প্রণোদিত পেশা হিসাবে 'কাবিলা'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে খলিফা আবদুল জব্বার এবং মওলবী ইব্রাহিম ঐক্যমত পোষণ করেন।

(৪) চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, 'আপনি কি 'টিড্ডির'(পঙ্গপাল) সঙ্গে ভুঙ্গী'র (ঘাস-ফড়িং?) মিল খুঁজেছেন ? এবং আপনি কি উক্ত কোন একটি বা উভয়কে হালাল বিবেচনা করেন?[২৯]

মওলানা কেরামত আলী জবাব প্রদান করেন যে পঙ্গপাল এবং ঘাস ফড়িং দুই ধরনের প্রাণী। পঙ্গপাল আইন সম্মতভাবেই ভোজ্য এবং ঘাস ফড়িং নিষিদ্ধ। মওলানা কেরামত আলী আরও বলেন যে, খলিফা আবদুল জব্বার দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি এবং উভয়কে আইনত ভোজ্য বলেছেন। একই সূত্রে বলা হয় যে, খলিফা জব্বার প্রশ্ন করেন 'আমরা কি আরব দেশের মুরগীকে বাংলার মুরগী থেকে আলাদা বিবেচনা করি?[৩০] প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল জেমস্ ওয়াইজের মন্তব্যের স্মরণ। ওয়াইজ লিখেন যে, দুদু মিয়া পক্ষ পঙ্গপাল এবং ঘাস ফড়িংকে একই প্রজাতির মনে করেন এবং শেষোক্তটিকে প্রথমটির মতোই হালাল বলেছেন। এই দুটির আকার এবং দেহ গঠনের পার্থক্য বিচিত্র জলবায়ুর কারণে হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ বাংলার যমুনা পাড়ের বড় আকৃতির ছাগল এবং গ্রামীণ অঞ্চলের ছোট আকৃতির ছাগলের কথা বলেন।[৩১] মওলানা কেরামত আলী আরও লিখেন, খলিফা জব্বার বলেন, যে কোন ধরনের ঘাস ফড়িং যা স্বীকৃত আইন গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী পঙ্গপালের আকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা হালাল। যদি সঙ্গতি না থাকে তাহলে হারাম। এরপর শহরের কোতোয়াল তাদের সামনে ঘাস ফড়িং উপস্থাপন করেন এবং এ সম্পর্কে তাদের মতামত চান। মওলানা কেরামত আলী ও খলিফা জব্বার উভয়েই এটাকে হারাম মনে করেন।[৩২]

পঞ্চমত মওলানা কেরামত আলী পরামর্শ দেন যে, প্রশ্নাবলীতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে প্রশ্ন যুক্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই দেশ কি দার আল ইসলাম অথবা দার আল হারব। খলিফা আবদুল জব্বার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই ধরনের আলোচনায় রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে বিধায় তা আলোচনার বহির্ভূত রাখার জন্য তিনি বলেন। সুতরাং খলিফার আপত্তির কারণে উক্ত প্রশ্ন বাদ দেয়া হয় এবং প্রশ্ন রাখা হয়-বর্তমান বৃটিশ প্রশাসন এবং ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলা এবং হিন্দুস্তানে জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মত কী ?[৩৩]

মওলানা কেরামত আলী জবাব দেন যে,বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেন ঈদের নামাজ হলো ওয়াজিব এবং জুমআর নামাজ হলো 'ফরজ ই ইতিকাদি' (যেখানে বিশ্বাস এবং আমল অবশ্য পালনীয়)। খলিফা আবদুল জব্বার এই মতের বিরোধিতা করে বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈদ ও জুমআর নামাজ বাংলায় এবং হিন্দুস্তানে আইন সম্মতভাবে অনুমোদনযোগ্য নয়। বরং এই পরিস্থিতিতে কিছু স্বীকৃত আইন গ্রন্থ

---

২৯ মওলবী কেরামত আলী, হুজ্জত ই ক্বাতি, পৃ. ১০৪ থেকে।
৩০ ঐ।
৩১ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩।
৩২ ওলানা কেরামত আলী, হুজ্জাত ই কৃতি, ১০৪ থেকে।
৩৩ ঐ।

অনুযায়ী উক্ত নামাজসমূহ অনুষ্ঠান করা মকরূহ ই তাহ্‌রিমা (প্রায় নিষিদ্ধ)। মওলানা কেরামত আলী মক্কার ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে তা প্রমাণ করার জন্য খলিফা জব্বারকে চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু খলিফা জবাব দেন যে, মক্কার আইনবিদকে জুমআ সম্পর্কে মত প্রদানের জন্য বলা হয়নি বরং 'মিসর আল জামি' সম্পর্কে মত চাওয়া হয়েছে যাঁর সঙ্গে ঈদের নামাজ এবং জুমআর বিষয়টি সম্পর্ক যুক্ত।[৩৪] আলোচনার এই পর্যায়ে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মওলানা কেরামত আলী উভয় দলের সম্মতি অনুসারে মক্কার আইনবিদের কাছে ছয়টি প্রশ্নের বিষয়ে ফতোয়া প্রার্থনা করেন। যেখানে ঈদ ও জুমআর বিষয়টিও ছিল। অন্যদিকে খলিফা পাঁচটি প্রশ্নের বিষয়ে ফতোয়া প্রার্থনা করেন। 'মিসর আল জামি' প্রশ্নের মীমাংসার উপর খলিফা এই প্রশ্নের উত্তর ছেড়ে দেন। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি যে, ফরায়েযীগণ শুধু 'মিসর আল জামি'তে ঈদ ও জুমআ অনুষ্ঠানের বিশ্বাসী ছিল। এরপর জনৈক হাজী আবদুল জলিল মক্কার একটি ফতোয়া উপস্থাপন করেন। (সম্ভবত মওলানা কেরামত আলী প্রেরিত বিষয় যা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়) ফতোয়াতে বলা হয় যে, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি কোনো এলাকায় মুসলমানেরা নামাজ পরিচালনার জন্য ইমাম নিয়োগ করে তাহলে সেখানে জুমআর নামাজ অনুষ্ঠান বৈধ। এই অবস্থায় খলিফা আবদুল জব্বার শহরের কোতোয়ালকে সম্বোধন করে বলেন, 'যদি আমরা একজন ইমাম নিয়োগ করি তাহলে হয়ত আপনি আমাদের হাতে 'হাতকড়া' পরাবেন। কোতোয়াল নীরব থাকেন এবং এই বিষয়ে আলোচনা শেষ হয়।[৩৫]

এখানে উল্লেখ্য যে,জুমআ এবং ঈদের নামাজের প্রশ্নে তাইউনী এবং ফরায়েযীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্তরা দেশের অবস্থানকে বিবেচনা করে মত প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ ভারত কী দার আল ইসলাম না দার-আল হারব। শেষোক্তরা বা ফরায়েযীগণ এলাকার অবস্থান বিবেচনা করে মত প্রকাশ করে। অর্থাৎ এলাকাটি 'মিসর আল জামি' কি না। সুতরাং মওলানা কেরামত আলী যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, ব্রিটিশ শাসনে ভারত দার আল আমান (নিরাপদ রাজ্য) তাই পূর্বের মতো ভারতের দার আল ইসলাম হিসাবে বিবেচনা করে এখানে ঈদ ও জুমআর নামাজ অনুষ্ঠান করা আইন সম্মত।[৩৬]

অন্যদিকে ফরায়েযীগণ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, জুমআ এবং ঈদের নামাজ শুধু 'মিসর আল জামি' তে অনুষ্ঠিত হতে পারবে সেখানে আমির এবং কাজি উপস্থিত থাকেন। কিন্তু সে সময়ের ব্রিটিশ শাসিত বাংলার এমন কোন স্থান পাওয়া যায়নি। তাই ফরায়েযীগণ সেখানে ঈদ ও জুমআর নামাজ অনুষ্ঠান আইনসম্মতভাবে অনুমোদন যোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করে।

(৬) ষষ্ঠ এবং শেষ প্রশ্ন ছিল-'মিসর আল জামি' কোন প্রকারে আপনি সংজ্ঞায়িত করবেন? (যা জুমআ নামাজের অনুষ্ঠানের একটি পূর্ব শর্ত) আপনি কি যে কোনো একটি অথবা হিদায়ার উভয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করবেন? [৩৭]

---

৩৪ ঐ।

৩৫ ঐ।

৩৬ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭ মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জাত ই ক্বাতি, পৃ. ১০৪ থেকে। ইমাম আল- হাম্মাম শেখ বোরহান আল-দীন আল মারঘিনানী তাঁর বিখ্যাত দুটি ব্যাখ্যা দেন যা এই আলোচনার নির্দিষ্ট সূত্র ছিল। ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ : (ক) যেখানে আমির এবং কাজী বাস করেন এবং বেসামরিক ও ফৌজদারি

মওলানা কেরামত আলী জবাব দেন যে হিদায়ার বর্ণিত উভয় ব্যাখ্যাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য। খলিফা আবদুল জব্বার বলেন যে দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটির প্রতি তিনি অগ্রাধিকার দেন। প্রথম ব্যাখ্যাটিতে আমির এবং কাজীর উপস্থিতির কথা বলা আছে এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে জবাব দেন।[৩৮] মিসর আল জামি সম্পর্কিত উক্ত দুটি ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে। অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই দুটি ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী। প্রথম ব্যাখ্যাটিতে 'মিসর আল জামি'র বিষয়ে পূর্বশর্ত হিসাবে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসনের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি এলাকার জনসাধারণের সাধারণ গণনার উপর নির্ভরশীল। মওলানা কেরামত আলী কিভাবে এই দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা করেছেন সে বিষয়ে তিনি কোন ইঙ্গিত দেননি। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, ফরায়েযীগণ দ্বিতীয়টির পরিবর্তে প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছে। প্রথমত ফরায়েযীগণ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, প্রথম ব্যাখ্যাটিও ইমাম আবু হানিফা প্রদত্ত এবং দ্বিতীয়ত আবু হানিফার আরো একটি ব্যাখ্যায়, যা 'হিদায়া'তে বোরহানুদ্দীন বর্ণনা করেছেন, তাতে সুবিচারের জন্য আমির এর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এই যুক্তিতে ফরায়েযীগণ প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছে।[৩৯]

মওলানা কেরামত আলী অবশ্য উল্লেখ করেন যে, মক্কায় আইনজ্ঞ তাঁর ফতোয়াতে উভয় ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য বলেছেন। খলিফা জব্বার জবাব দেন যে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত অনেক স্বীকৃত আইন গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়েছে। এই জবাবে মওলানা কেরামত আলী রাগান্বিত হয়ে খলিফা জব্বারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বলেন,'তিনি (মক্কার আইনজ্ঞ) কি একটি ভুল মত প্রদান করেছেন ? 'খলিফা জব্বার তাকে হয়ত শান্ত করার জন্য বলেন' মক্কার আইনজ্ঞের বয়স আমার চেয়ে বেশী। সম্ভবত তিনি কিছু গ্রহণযোগ্য আইন গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে মত দিয়েছেন। আমি তাতে একমত।[৪০]সুতরাং মুখরক্ষামূলক এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও বিতর্কটি সংশয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়।

ঈদ ও জুমআর নামাজ অনুষ্ঠান এবং 'মিসর আল জামি'র সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করায় এই বিষয়ে এখানে পুনরায় বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। এখানে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো এই বিষয়ে ফরায়েযী এবং তাইউনীদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃতপক্ষে জুমআ অনুষ্ঠানের বিতর্ক থেকেই এই দুটি দলের প্রকৃত বিরোধিতা শুরু হয়। এই বিষয়ে মওলানা কেরামত আলী বলেন 'জুমআ নামাজ অনুষ্ঠানের বিতর্ক থেকেই সম্পূর্ণ বিতর্কের ভিত্তি রচিত হয়।[৪১] এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্ত দুটি দলের মধ্যে এই উষ্ণ বিতর্ক কখনও থামেনি। উক্ত মত ত্যাগ করে ফরায়েযীগণ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলোতে জুমআ নামাজ অনুষ্ঠানের

আইন বলবৎ করেন সে স্থানটি মিসর আল জামি বলা হয়। এটি ইমাম আবু ইউসুফের ব্যাখ্যা। (খ) ইমাম আবু হানিফার মতে, এটা হল এমন একটি স্থান যেখানে এলাকার সবচেয়ে বড় মসজিদে জুমআ নামাজের সময় সকল বাসিন্দাদের সংকুলান হয় না। '(দ্রষ্টব্য, হিদায়া, পৃ. ১৪৮) জুমা এবং মিসর আল জামি সম্পর্কিত বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, গ্রন্থের ৬ষ্ট অধ্যায়।

৩৮ মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃাতি, পৃ. ১০৪ থেকে।

৩৯ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৪০ মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জাত ই কৃাতি পৃ. ১০৪ থেকে।

৪১ ঐ।

অনুমোদন দেয়। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট এবং জজগণ জেলা সদর ও মহকুমা সদর দফতরে মহকুমা অফিসার ও মুসলিম আইনসম্মতভাবেই আমির ও কাজির স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় ফরায়েযীগণ উক্ত মত পোষণ করে। তবে গ্রাম বা ক্বোরাতে 'মিসর আল জামি'র বৈশিষ্ট্য বিরাজ না করায় জুমআ অনুষ্ঠান আইন সম্মত নয় বলে ফরায়েযীগণ মনে করে।

পরবর্তী সময়ের প্রমাণাদিতে প্রতীয়মান হয় যে, মওলানা কেরামত আলী বরিশালে অনুষ্ঠিত বিতর্কের কোনো বিষয়েই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পরবর্তী ভাষণসমূহে মওলানা কেরামত আলী 'ইশতিহার'-এ উল্লেখিত ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগ পুনরায় ব্যক্ত করেন। এটা লক্ষণীয় যে,মওলানা তাঁর 'ক্বাত্তল আল সাবিত' (এটি ১৮৭৮ খ্রি. ১২৮৯ হিজরী) এ ফরায়েযীদেরকে আক্রমণ করার ধরন পরিবর্তন করেন। তিনি ফরায়েযী নেতা দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীদেরকে প্রকৃতপক্ষে 'ওয়াহাবী' হিসাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু পূর্বে তিনি তাদেরকে 'বাংলার খারিজী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

অন্যদিকে বরিশালে অনুষ্ঠিত বিতর্কে ফরায়েযী আন্দোলনের একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়। প্রথমত এই প্রথমবার ফরায়েযীগণ মওলানা কেরামত আলীর বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে সফল হয়। কারণ মওলানা কেরামত আলী বছরের পর বছর ফরায়েযীদেরকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পশ্চাৎধাবন করেছিলেন। বাস্তব সত্য হল যে, মওলানা কেরামত আলীর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে খলিফা আবদুল জব্বারের দৃঢ় অবস্থানকে ফরায়েযীদের তাত্ত্বিক ভিত্তির অগ্রগতিও প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত খলিফা জব্বার কর্তৃক রচিত ফরায়েযী ধারণাসমূহ ফরায়েযীদের শিক্ষিত অংশ দ্রুত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। জুমআ এবং ঈদের নামাজ সম্পর্কিত ফরায়েযী ফতোয়া (আরবি ও উর্দুতে লিখিত) পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় এবং স্থানীয় খলিফাদের কাছে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া ফরায়েযীদের লিখিত বাংলা পুঁথিসমূহে ফরায়েযী মতাদর্শসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়।[৪২]

বরিশালে অনুষ্ঠিত বিতর্ক জুমআ নামাজ সম্পর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে নানামুখী বক্তব্যের সূচনা করে এবং এই বিষয়ে নতুন বিতর্কের সূচনা করে। এই বিতর্ক ফরায়েযী বনাম তাইউনী এবং ফরায়েযী ও স্থানীয় আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কটি মওলানা কেরামত আলীর পুত্র হাফিজ আহমদ এবং নয়া মিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। নবীনচন্দ্র সেন এই বিতর্ককে 'জুমআর যুদ্ধ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৪৩] অপর গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কটি ১৩০৯ বাংলা সন/১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দাউদকান্দিতে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ফরায়েযীগণ স্থানীয় আচারে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিতর্কে অংশ নেয়।[৪৪]

---

৪২ দেখুন, গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ের 'ফরায়েযী উপাত্ত সমূহ'

৪৩ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়।

৪৪ দ্রষ্টব্য, দুরর ই মোহাম্মদ : পুঁথি, পৃ. ১২৩ থেকে এবং নাজিম উদ্দীন : পুঁথি, পৃ. ৯৮ থেকে।

অষ্টম অধ্যায়

ফরায়েযীদের সামাজিক সংগঠন

ফরায়েযী নেতাদের জীবন বৃত্তান্ত পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা আন্দোলনের প্রকৃতি ক্রমবিবর্তনের ভেতরে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। হাজী শরীয়তুল্লাহ শুদ্ধ ধর্মীয় নীতিসমূহের উপর তাঁর সংস্কার পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তুত করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র দুদু মিয়া অনুসৃত সাংগঠনিক নীতিসমূহ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

স্মর্তব্য যে, ফরায়েযীগণ বাংলার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ন্যায় 'হানাফী' মতাদর্শের অনুসারী ছিল। তা সত্ত্বেও ফরায়েযীগণ তাদের আন্দোলনে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে, যা তাদেরকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করে। স্বাভাবিকভাবেই আলাদা মতাদর্শের মাধ্যমে ফরায়েযীগণ একটি শিবিরে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ভ্রাতৃত্ব-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে নয়া বাড়িতে যখন হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর মতাদর্শ প্রচার করছিলেন তখন থেকেই ফরায়েযী অনুসারীদের মাঝে একতাবোধের পরিচয় পেয়ে হিন্দু জমিদারগণ শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং হাজী শরীয়তুল্লাহকে তাঁর স্থান থেকে বহিষ্কার করে।[১]

ঢাকার রেকাবী বাজারে[২] বাসরত ফরায়েযীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসে জানা যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ এখানে স্থানীয় পঞ্চায়েত সংগঠিত করেন। কিন্তু তিনি ফরায়েযীদেরকে একসূত্রে সংগঠিত করার কোনো প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন কি না তা জানা যায় না। দুদু মিয়া প্রথম এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ফরায়েযীদেরকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে আবদ্ধ করেন। সাংগঠনিকবাদ সোপান বা রূপান্তরের মাধ্যমে ফরায়েযীদেরকে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত করা হয়। সুতরাং ফরায়েযীদেরকে সংগঠিত করে একটি সমাজে রূপদান করার কৃতিত্ব হলো দুদু মিয়ার, যা জেমস্ ওয়াইজ মনে করেন।[৩]

ফরায়েযী সমাজ সংগঠিত করার বিষয়ে দুদু মিয়ার দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ছিল (১) ইউরোপীয় নীলকর এবং হিন্দু জমিদার থেকে ফরায়েযী কৃষক সমাজকে রক্ষা করা, (২) সাধারণ মুসলমানের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। প্রথম উদ্দেশ্য রূপায়িত করার জন্য দুদু মিয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীকে তিনি লাঠিখেলা শেখানোর মাধ্যমে লাঠিয়াল হিসেবে গড়ে তোলেন, যাতে তারা লাঠিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য তিনি সনাতনী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ফরায়েযী নেতৃত্বের মাধ্যমে গড়ে তোলেন। ফরায়েযীদের প্রথমোক্ত

---

১ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২২

২ ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) রেকাবী বাজার অবস্থিত। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান লেখক স্থানটি পরিদর্শন করেন।

৩ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩

অংশটিকে বলা হতো রাজনৈতিক অংশ (সিয়াসী) এবং শেষোক্ত অংশটিকে বলা হতো 'দ্বিনী' বা ধর্মীয় অংশ। দুটি অংশকেই নিয়ন্ত্রণ করা হতো ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে। এইভাবে পূর্ব বাংলার সকল ফরায়েযীদেরকে দুদু মিয়ার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এবং তত্ত্বাবধানে আনা হয়।

'সিয়াসী' বা রাজনৈতিক অংশ ঃ হিন্দু জমিদার এবং ফরায়েযী কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে এই রাজনৈতিক শাখার সৃষ্টি হয়। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েযী কৃষকদের উপর ধার্যকৃত পৌত্তলিক করসমূহের বিরোধিতা করেছেন। পরবর্তী সময়ে হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়।[৪] সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে জমিদারগণ কম করে হলেও ২৩ ধরনের অবৈধ কর ধার্য করে, যা সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত করের অতিরিক্ত ছিল।[৫] এই অবৈধ কর আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ লাঠিয়ালদের সংগঠিত করার নিমিত্তে জালাল উদ্দিন মোল্লাকে নিয়োজিত করেন।[৬] জেমস্ ওয়াইজ বলেন যে, দুদু মিয়া জমিদারগণ কর্তৃক 'অবৈধ কর' আরোপের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। বিশেষ করে অবৈধ পৌত্তলিক করের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। ওয়াইজ মনে করেন যে, এই ধরনের করারোপ ছিল সহ্যসীমার বাইরের একটি নির্যাতন। এই ধরনের পদক্ষেপের বাইরে 'একজন মোহাম্মদীয় রায়তকে হিন্দু দেবী দুর্গাকে সাজানো'র অর্থ আদায় করা হতো। হিন্দু জমিদারের এমন সকল কর্মকাণ্ডে এই অর্থ ব্যয় করা হতো, যা পৌত্তলিকতার সঙ্গে জড়িত ছিল। এই সকল করারোপ জনগণের সঙ্গে এবং প্রাচীন আচারের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অজুহাতে অব্যাহত রাখা হয়।[৭] সুতরাং আর্থ-সামাজিক কারণে দুদু মিয়ার সঙ্গে জমিদারদের বিরোধিতার উন্মেষ ঘটে। ফরায়েযীগণকে একত্রে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে দুদু মিয়া এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখেন।

দুদু মিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর তিনি ফরিদপুর জেলার (মাদারীপুর মহকুমা সহ) বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকজন 'সিয়াসী খলিফা' (রাজনৈতিক প্রতিনিধি) নিয়োগ করেন। মাদারীপুরের জমিদারগণ ফরায়েযীদের প্রতি বিশেষভাবে বৈরীভাবাপন্ন ছিল। 'সিয়াসী খলিফাদের দায়িত্ব ছিল লাঠিযুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া খলিফাদের অপর দায়িত্ব ছিল এলাকার প্রতিটি নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব সম্পর্কে দুদু মিয়াকে অবহিত করা। পরবর্তী সময়ে যখন দ্বিনী বা ধর্মীয় অংশটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়, তখন রাজনৈতিক অংশটিকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যা নিম্নের আলোচনায় আমরা দেখব।

ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থা

ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থা ছিল সকল ফরায়েযীদেরকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং বৈধ খলিফা বা প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা। ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

---

৪ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়।

৫ দেখুন, পরিশিষ্ট-'গ'।

৬ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭ দ্রষ্টব্য, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৪।

উস্তাদ (সর্বোচ্চ পদ)
উপরস্থ খলিফা (পরবর্তী উচ্চতর প্রতিনিধি)
তত্ত্বাবধায়ক খলিফা (তত্ত্বাবধায়ক)

গ্রাম খলিফা, ওয়ার্ড খলিফা ঃ শহরের জন্য পূর্ববঙ্গের ফরায়েযী বসতিসমূহকে ছোট ছোট ফরায়েযী ইউনিটে ভাগ করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ২০০ থেকে ৫০০ ফরায়েযী পরিবার নিয়ে একটি ইউনিট গঠিত ছিল। প্রতিটি ইউনিটের খলিফা হিসেবে একজন বিশিষ্ট ফরায়েযীকে দায়িত্ব দেয়া হতো। দশ অথবা এর বেশি গ্রাম নিয়ে একটি সার্কেল গঠিত হতো যা গির্দ (Gird) হিসেবে পরিচিত ছিল। এটা একজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফার দায়িত্বে থাকত। ইউনিট খলিফাগণ তাঁর অধস্তন হিসাবে কাজ করত।[৮] তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে একজন 'পিয়াদা' ও একজন 'পিয়ন' রাখতে হতো। তত্ত্বাবধায়ক খলিফার আদেশকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব ছিল 'পেয়াদা'র উপর। 'পিয়ন' খবরা-খবর নিয়ে সার্কেল প্রধানের কাছে এবং বাহাদুরপুরে অবস্থানরত উস্তাদের কাছে আসা যাওয়া করতে হতো। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক খলিফা ছিলেন ইউনিট খলিফা এবং উস্তাদের মধ্যবর্তী মাধ্যমে যিনি উভয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন।

'উস্তাদ'- এর উপদেষ্টা হিসাবে উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয় যাদেরকে বলা হয় উপরস্থ বা সুপিরিয়র খলিফা। উদাহরণস্বরূপ নয়া মিয়া'র অভিভাবকগণের কথা বলা যায়।[৯] তাদের ছিল বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড। ঐগুলোর মধ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'উস্তাদ'কে উপদেশ দেয়া, ফরায়েযী সম্প্রদায়কে পরিচালনা করা, ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচার করা এবং ফরায়েযী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া। এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে বিশেষ কোন মহকুমা বা জেলার দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে উপদেষ্টাগণ ফরায়েযী সম্প্রদায়ের কাছে উস্তাদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানত কাজ করতেন।[১০]

ইউনিট খলিফাদের কার্যাবলী

ইউনিটে বসবাসকারী ফরায়েযীদের সঠিক কল্যাণের দায়িত্বে ছিল ইউনিট খলিফাগণ। ইউনিট খলিফার কার্যক্রম ছিল বহুবিধ। প্রথমত তিনি তাদেরকে কালেমা বা বিশ্বাসের প্রাথমিক সূত্র শিক্ষা দিতেন।[১১] দ্বিতীয়ত ফরজ বা ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ, যেমন দৈনিক

---

৮ (ক) দুদু মিয়ার খলিফা, জালাল উদ্দীন মোল্লা, খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীনের খলিফা কফিল উদ্দীনের পরিবারে প্রচলিত তথ্য; (খ) দুদু মিয়ার খলিফা ত্রিপুরা জেলার মুন্সী দরবেশ আলীর পরিবারে প্রচলিত বিশ্বাস থেকে; (গ) মনির উদ্দীন এবং (ঘ) দুদু মিয়ার খলিফা চাঁদপুরের পাহলোয়ান গাজীর পরিবারে প্রচলিত তথ্য; দ্রষ্টব্য দেখুন, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩। ওয়াইজ মনে করেন যে, পূর্ববঙ্গকে বিভিন্ন ইউনিটে বা সার্কেলে বিভক্ত করার জন্য দুদু মিয়া বৈষ্ণব ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু ওয়াইজ কি কারণে এমন মনে করেছেন তা বলেননি। অন্যদিকে আমরা জানি যে, কোন এলাকার দায়িত্ব খলিফাকে দেয়ার বিষয়টি সুফী ব্যবস্থায় বাংলার শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছিল।

৯ দ্রষ্টব্য গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়।

১০ ফরায়েযী সংগঠনের উপরোক্ত কাঠামো ফরায়েযী পরিবারে রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। উপরস্থ খলিফা নিয়োগের বিষয়টি অকার্যকর হয়ে পড়লে ও অবশিষ্ট কাঠামো এবং পেয়াদা ও পিয়নের কার্যকলাপ বর্তমান সময় পর্যন্ত চলছে।

১১ কলিমা আরবীতে লিখিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদনুর রসুলুল্লাহ্

নামাজ, রমজানের রোজা এবং জাকাত ও ফিতরা আদায় ইত্যাদি পালনে ইউনিট খলিফা নজরদারি করতেন। তৃতীয়ত যেস্থানে মসজিদ ছিল না সেস্থানে তাকে এবাদতখানা নির্মাণ করে জমাআতে নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে ইমাম নিয়োগ করতে হতো। চতুর্থত তিনি সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং ধর্মীয় নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে ন্যায় বিচার কায়েম করতেন। পঞ্চমত তিনি কোন ব্যক্তির বিবাহ বা মৃত্যুর সময় ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতেন এবং সেই সাথে মৃত্যুপথ যাত্রীকে তওবা করাতেন। মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে ইউনিট খলিফা ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জন্য মক্তব পরিচালনা করতেন।[১২] উক্ত কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য তিনি ইউনিটের এলাকাধীন জমি থেকে সম্মানী হিসেবে 'উষর' (জমির উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত খাজনা) গ্রহণ করতেন। এই সম্মানীর হার অবশ্য জাকাতের মতোই ছিল।[১৩]

ইউনিট খলিফাদের কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয়, যা বর্তমানেও চলছে। নিজেরা রাজনীতিতে জড়াতেন না। অবশ্য তাঁর ইউনিটের সকল রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর খোঁজ রাখতে হোত এবং তত্ত্বাবধায়ক খলিফার নিকট রিপোর্ট পেশ করতে হতো। বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার গৃহস্থালী বিতর্ক অথবা ঝগড়া বিবাদ, জমি অথবা অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কিত বিবাদের মীমাংসা করার জন্য ইউনিট খলিফাকে ক্ষমতা প্রদান করা হতো। তিনি এ সকল বিষয় বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহায্যে সমাধান করতেন।

তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কার্যাবলী

তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কার্যাবলী কোনভাবেই সহজসাধ্য বলা যায় না। তাঁর কাজে সার্কেল বা গির্দ (Gird) এর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব অর্পিত ছিল। প্রথমত তাঁকে ইউনিট খলিফাদের কার্যাবলী নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হতো। তাদের পদক্ষেপসমূহের নির্দেশনা এবং সীমা অতিক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে হতো। গির্দ এর কোন বাসিন্দা ইউনিট খলিফাদের বিরুদ্ধে কোন নির্যাতন বা ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ করতে পারত এবং তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কাছে বিচার চাইতে পারত। দ্বিতীয়ত তত্ত্বাবধায়ক খলিফা ছিলেন আপিল কোর্টের মতো। ইউনিট খলিফার সিদ্ধান্তে কেউ অসন্তুষ্ট হলে সে তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কাছে আশ্রয় বা আপিল করতে পারত। এই ধরনের আপিলকে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা তাঁর নিয়ন্ত্রণের সকল ইউনিট খলিফাদের উপস্থিতিতে পুনরায় বিচার করতেন। তৃতীয়ত তিনি গির্দে বসবাসরত সকল ফরায়েযীদের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এ ছাড়া তাকে বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত পরিদর্শন করে ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ প্রচার করতে হতো। তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে একটি 'আস্তানা' ধর্মীয় ক্লাব পরিচালনা করতে হতো, যাতে করে এখানে সম্প্রদায়ের নামাজ, জনসভা, ধর্মীয় সম্মেলন এবং সম্প্রদায়ের অন্যান্য কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হতে পারে। যখন উস্তাদ বা অন্যকোন সম্মানিত অতিথি গির্দ পরিদর্শনে আসতেন তখন 'আস্তানা'টি বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। উপরন্তু ফরায়েযীগণ সুফিবাদের কাদেরিয়া মতাদর্শ অনুসরণ করত। এই ক্ষেত্রে প্রতি বুধবার রাতে 'আস্তানায়' হালকা জিকির' অনুষ্ঠিত হতো। চতুর্থত তত্ত্বাবধায়ক খলিফার গির্দের

---

১২ পারিবারিক রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

১৩ বর্তমান চাঁদপুর জেলার গ্রামগুলোতে এই নিয়ম এখনও বহাল রয়েছে।

ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ছাড়াও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে খবরা খবর নিতে হতো। অবশ্য যদি তিনি শুধু ধর্মীয় কার্যক্রমে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইতেন তাহলে একজন 'সিয়াসী' খলিফা (রাজনৈতিক প্রতিনিধি) সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য নিয়োগ করা হতো। পিয়াদা এবং পিয়নের সহযোগিতায় তিনি 'উস্তাদ' এর কাছে এলাকার প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতেন। পঞ্চমত তিনি প্রতি বছরে 'গির্দ' এর প্রতিটি স্থান পরিদর্শন করতেন, যাতে করে প্রতিটি ফরায়েযী ধর্মীয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখতে পারে। শেষ বিষয় হিসেবে ফরিদপুরের তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে লাঠিয়ালদের একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করতে হতো এবং তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা রাখতে হতো। ফরিদপুর জেলায় এই বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হতো। কারণ এখানে ফরায়েযী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জমিদার ও গোমস্তাগণ শত্রুভাবাপন্ন ছিল।[১৪]

উপরস্থ খলিফা এবং উস্তাদ

ইউনিট খলিফা এবং তত্ত্বাবধায়ক খলিফার সকল যোগাযোগ কার্যবিবরণী বহিতে রক্ষিত হতো। যখন উস্তাদ অথবা উপরস্থ খলিফা গির্দ পরিদর্শনে আসতেন তখন কার্যবিবরণী তাদের কাছে উপস্থাপন করা হতো। যদি কার্যবিবরণী অনুমোদন করতেন তাহলে তিনি তাতে তাঁর সিল ও স্বাক্ষর দিতেন। যদি তিনি অনুমোদন না করতেন তাহলে তা আরও পরীক্ষা করার জন্য বাহাদুরপুর প্রেরণ করতেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউনিট খলিফাগণ উস্তাদের হস্তক্ষেপ আগ্রহভরে কামনা করত। সকল ধর্মীয় এবং পার্থিব বিষয়ে উস্তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে ধরা হতো। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই মানতে হতো। যদি কোনো তত্ত্বাবধায়ক খলিফার সিদ্ধান্তে কেউ অসন্তুষ্ট হতো, তা হলে সে উস্তাদের কাছে আপিল করতে পারত। এই ধরনের আপিল হলে উস্তাদ নির্দিষ্ট দিনে শুনানির জন্য বাহাদুরপুরে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক খলিফা এবং অন্য পক্ষকে ডেকে পাঠাতেন। জটিল মামলায় একজন উপরস্থ খলিফা ঘটনা স্থলে গিয়ে আপিল গ্রহণ করতেন এবং উস্তাদের দূত হিসাবে রায় প্রদান করতেন।[১৫] যদি কেউ সরকারি আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য সাহস প্রদর্শন করত, তাহলে আদালতের রায়কে ক্ষমতাধর খলিফাগণ প্রতিরোধ করত। বিশেষ করে এই রায় যদি ফরায়েযী কোনো ব্যক্তির স্বার্থ বিরোধী হতো।[১৬]

খিলাফত ব্যবস্থার আরও পরীক্ষা

ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থার পূর্বোক্ত রূপরেখা অংশত ফরায়েযী খলিফাদের পারিবারিক রেকর্ড এবং বর্তমান (১৯৫০-৬০খ্রি.) ফরায়েযী সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিবরণ সমসাময়িক লেখক, বিশেষ করে জেমস্ ওয়াইজ, নবীন চন্দ্র

---

১৪ পারিবারিক রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য। এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩ থেকে এবং নবীন চন্দ্র সেন, আমার জীবন পূর্বোক্ত, খণ্ড-৩, পৃ. ১৪৯ থেকে।

১৫ ঐ।

১৬ দ্রষ্টব্য, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫ এবং নবীন চন্দ্র সেন, আমার জীবন, খণ্ড-৩, পৃ. ১৪৯।

সেন, মওলবী কেরামত আলী এবং এইচ. বেভারিজের লেখা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু এই লেখকদের লেখাতে ফরায়েযী সমাজের আংশিক প্রতিফলন থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে ভুল নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। জেমস্ ওয়াইজ বলেন[১৭] 'বৈষ্ণবদের[১৮] উদাহরণ অনুযায়ী তিনি (দুদু মিয়া) পূর্ববঙ্গকে বিভিন্ন সার্কেলে বিভক্ত করেন এবং প্রতি সার্কেলের জন্য একজন খলিফা বা এজেন্ট নিয়োগ করেন। তাদের দায়িত্ব ছিল সম্প্রদায়কে একসূত্রে রাখা এবং ধর্মান্তর করা এবং সম্প্রদায়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা। খলিফাগণ দুদু মিয়াকে তাদের আয়ত্তাধীন এলাকার প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখত।

তিনি আরও বলেন যে, দুদু মিয়া বিবাদের মীমাংসা করতেন এবং সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে যে কোন হিন্দু মুসলিম বা খ্রিস্টানদের শাস্তি প্রদান করতেন। এই সকল ব্যক্তিরা তাদের ঋণ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মুন্সেফ কোর্টে যাওয়ার সাহস না দেখিয়ে, দুদু মিয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতো।[১৯] সাধারণ জনগণের মাঝে ফরায়েযী পঞ্চায়েতের প্রভাব সম্পর্কে ওয়াইজ বলেন, এই পঞ্চায়েতসমূহ (পূর্ববঙ্গের) জনগণের উপর এবং ফরায়েযী গ্রামসমূহের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো সকল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকত। এর কারণে হিংসাত্মক ঘটনা বা নির্যাতনের কোনো মামলা কালেভদ্রে আদালতে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পেত।[২০]

নবীন চন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে, আমরা নয়া মিয়ার সময়ের ফরায়েযী সমাজের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। নিম্নোক্ত বিবরণ তা প্রমাণ করে, পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ত বিশেষ করে ফরিদপুর জেলার রায়তেরা ছিল ফরায়েযী মুসলমান। এরা নয়া মিয়ার কথাকে ঐশ্বরিক বিবেচনা করত এবং এই ধরনের দাসত্ববোধক সমর্পণ অন্যকোন মানুষ জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এই অঞ্চলে (মাদারীপুর মহকুমা) নয়া মিয়া ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে একটি নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিটি গ্রামে তিনি একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং পেয়াদা নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে ফরায়েযীদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি ছাড়া গ্রামের কোনো বিরোধ দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে যেতে পারত না।[২১] তিনি আরও লিখেন প্রথমত তত্ত্বাবধায়ক খলিফা বিবাদের বিচার করতেন এরপর যদি তিনি অনুমতি দিতেন তাহলে বিষয়টি আইনী আদালত বা পুলিশের নিকট উত্থাপন করা যেত। যদি কেউ এর বিপরীত কাজ করত তাহলে তাকে বিপথগামী বা কাফের হিসেবে চিহ্নিত করা

---

১৭ ঐ, পৃ. ২৩।

১৮ বৈষ্ণব ব্যবস্থার সঙ্গে ফরায়েযী খিলাফত ব্যবস্থার সাদৃশ্য টানতে গিয়ে ওয়াইজ সম্ভবত দুইয়ের মাঝে আপাতমিলের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছেন। খলিফাদের বিভিন্ন পদ, এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান এগুলো দুদু মিয়ার সৃষ্টি নয়। প্রকৃত বিষয়হলো যে, এই ব্যবস্থা সুফীদের মধ্যে চালু ছিল, বা উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল যা বৈষ্ণব ব্যবস্থার কয়েক শতক পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। পাটনা স্কুলের অনুসারীগণ মালদাতেও এমন ব্যবস্থা চালু করেছিল যা ফরায়েযীদের ব্যবস্থার মতোই ছিল। দ্রষ্টব্য, W.W.Hunter: Indian Mussalman, London, 1871 A.D. পৃ. ৮১-৮২।

১৯ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৫।

২০ ঐ, পৃ. ৩৪।

২১. নবীন চন্দ্র সেন, আমর জীবন, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৩, পৃ. ১৪৯।

হতো।[২২] ফলে তত্ত্বাবধায়ক বিবাদে অংশ গ্রহণকারী যে দলকে সমর্থন করত সে দলই জয়ী হতো। এমনকি দলটি যদি ভুল অবস্থানে থাকত তাতেও জয় পেত। তত্ত্বাববধায়কের ইচ্ছানুযায়ী লোকেরা সাক্ষী প্রদান করত। তিনি যদি কারও বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেন তাহলে ঐ মামলা সত্য প্রমাণ করা কঠিন ছিল। মামলার পক্ষে কোনো প্রমাণাদি সংগ্রহ করা জজ এবং পুলিশের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। এমনকি কোনো জমির উপর কোনো ব্যক্তি আদালতের রায় আনতে পারলেও তা দখল করা অসম্ভব হয়ে পড়তো, যদি ফরায়েযী তত্ত্বাবধায়ক খলিফা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করত।

মওলানা কেরামত আলী ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনেন তাঁর অন্যতম যুক্তি হিসেবে বলেন, যেহেতু পূর্ববঙ্গে ফরায়েযীগণ দৃঢ়ভাবে তাদের শাসন কায়েম করেছে সেহেতু জুমআর নামাজ আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা সমীচীন নয়। তিনি বলেন এবং ফরায়েযীদের প্রতি জিজ্ঞেস করেন, "যেখানে তোমরা তোমাদের অনুসারীদের উপর বিচার" ব্যবস্থা কায়েম করেছ এবং তোমরা শাস্তি হিসেবে জুতাপেটা করা, জরিমানা করা বা একশত বেত্রাঘাত, একশত-দুইশত টাকা জরিমানা করতে পারছ এবং কোনো অভিযোগ ব্রিটিশ আদালতে দায়ের করতে দিচ্ছ না, সেখানে জুমআ নামাজ আদায়ের বিষয়ে আর কি অজুহাত থাকতে পারে। তোমাদের নির্বাচিত 'আমির' যেখানে শাসন করছে।[২৩]

বাখরগঞ্জ জেলার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিবরণের সাহায্যে এইচ. বেভারিজ বলেন, সরকারি কর্মকর্তা ব্যতীত দুইজন ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। আমি মোহাম্মদীয় ধর্মপ্রচারক কেরামত আলী এবং দুদু মিয়ার নাম এখানে উল্লেখ করছি।[২৪]

যদি উপরোক্ত প্রমাণাদি সত্য হয় তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, ফরায়েযী সমাজ সংগঠনে দুদু মিয়ার প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ফরায়েযীদেরকে শুধু নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেননি, উপরন্তু তিনি তাদের জন্য সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করেছিলেন। নীলকর, তাঁদের অনুচর ও অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের হাত থেকে তিনি ফরায়েযীদের রক্ষা করেছিলেন। ফরায়েযী সমাজ গঠনে তিনি সাম্য এবং ভাতৃত্ববোধের নীতি প্রয়োগ করেন, যাঁর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

সাম্য ও ভাতৃত্ববোধের নীতি

জেমস্ ওয়াইজ বলেন যে, দুদু মিয়া "মানুষের মাঝে সাম্যনীতি" প্রয়োগের গুরু প্রদান করেন। তিনি শিক্ষা দেন যে, ধনী এবং উচ্চবিত্তদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ দরিদ্র এবং নিম্নবিত্তদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।[২৫] দুদু মিয়া ঘোষণা করেন যে, সক

---

২২. নবীন চন্দ্র সেন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং ফরায়েযী আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হওয় বিষয়টি একই ধরনের মনে করেছেন। এটা সত্য যে, ফরায়েযীগণ তাদের বিরোধীদের সঙ্গে বসা করত না। তা সত্ত্বেও ফরায়েযীগণ কোন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত বা কাফির হিসে আখ্যায়িত করত না। ফরায়েযীগণ নিজেদেরকে হানাফী মতাদর্শের এবং আহল আল সুন্নাত ওয় জামায়াত এর অনুসারী মনে করত। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলিমগণ এই মতাদর্শের ছিল।

২৩. মওলবী কেরামত আলী : হুজ্জত ই ক্বাতি, পৃ. ১০৭।

২৪. H.Beveridge : District of Bakergong, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১।

২৫. James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৪।

মানুষ ভাই ভাই এবং বলেন যে, যখন একজন বিপদগ্রস্ত হয় তখন তাঁর প্রতিবেশীদের দায়িত্ব হলো 'তাকে সাহায্যে করা'।[২৬] সরকারি রিপোর্ট অনুসারে ফরায়েযীগণ ভাতৃত্ববোধকে যারপরনাই গুরুত্ব দিয়েছে।[২৭] ফরায়েযী ভাইদের সহায়তা প্রদানের জন্য কল্যাণ তহবিল সৃষ্টি করা হয়।[২৮]

কোরআনের বাণী 'পৃথিবী এবং স্বর্গের সকল কিছুই আল্লাহ'র[২৯] দান এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়জীব হিসেবে মানুষ জমি ব্যবহার করার সমান অধিকার সংরক্ষণ করে। সুতরাং জমি তাদেরই যাঁরা জমি চাষ করে। তাই দুদু মিয়া জমিদার কর্তৃক কৃষকদের শোষণ করাকে বড় ধরনের অবিচার মনে করেন।[৩০]

দুদু মিয়া অবশ্য জমির উপর সরকার আরোপিত করের বিরোধিতা করেননি। তিনি কৃষক শ্রেণীর উপর জমিদার কর্তৃক অবৈধ এবং পৌত্তলিক করারোপের অধিকারের বিরোধিতা করেন। তিনি জমিদার শ্রেণীকে সরকারের কর সংগ্রহকারী বিবেচনা করেছেন। তাই তাঁর মতে জমিদারগণ শুধু সরকার আরোপিত কর উসুল করার হকদার। তাই তাঁর মতে জমিদারগণ শুধু সরকার আরোপিত জমির খাজনা আদায়ের অধিকারী। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারা অনুযায়ী জমিদারগণকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। জমিদারগণ নাম-জমিতে কৃষকদেরকে বসতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে সরকারকে খাজনা প্রদান থেকে যে কোনো ধরনের কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়।[৩১]

জমিদারগণের আয়ত্ত্বাধীন এলাকার মধ্যে অধিকাংশ ফরায়েযীগণ বাস করত। তাই জমিদারগণ খাজনা অনাদায়ে প্রজা আইনে রায়তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারত। যখনই জমিদারগণ ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে খাজনা আদায়ের জন্য তাদের প্রজা আইন প্রয়োগ করতে চাইত, তখনই দুদু মিয়া সংগৃহীত সাধারণ কল্যাণ তহবিলের অর্থ দ্বারা রায়তদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন এবং আদালতে জমিদারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতেন।[৩২] অথবা নিরাপদ হিসাবে ওয়াইজের মতে জমিদারের সম্পদ এবং চাকর- বাকরদের নির্মূল করার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী প্রেরণ করতেন।[৩৩]

---

২৬. ঐ।
২৭. Selections From the Records of the Bengal Government, vol. 13, Trail of Ahmedullah, পৃ. ১৪১।
২৮. দ্রষ্টব্য, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৩।
২৯. কোরআন : ২,১২৯,৪,১৩১।
৩০. দুদু মিয়ার পরিবারে প্রচলিত তথ্য। দ্রষ্টব্য, James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৪।
৩১. James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৪।
৩২ দুদু মিয়ার পরিবারে প্রচলিত তথ্য। আরও দেখুন, James wise, Eastern Bengal, পৃ. ২৩-২৪।
৩৩ James wise : Eastern Bengal, পৃ. ২৪।

নবম অধ্যায়

ফরায়েযী আন্দোলনের ভৌগোলিক এলাকা

প্রয়োজনীয় উপাত্তের অভাবে ফরায়েযী প্রভাবান্বিত এলাকা নির্দিষ্ট করা কষ্টকর। তা সত্ত্বেও কিছু সমসাময়িক বিবরণ এই আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে বেশ আলোকপাত করেছে। যাহোক, এই সকল উপাত্ত যথেষ্ট না হলেও ফরায়েযী অনুসারীদের সংখ্যা বা এর পরিধি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জালালপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের 'রুবকারি'তে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রাথমিক উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এতে দেখা যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ্ এই সময়ে ঢাকা জেলার রামনগর গ্রামের কৃষকদের কাছে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করছেন। এই গ্রামটির বর্তমান নাম চারিগ্রাম এবং এটি নয়া বাড়ি'র সন্নিকটে অবস্থিত। স্থানীয় মুসলমান এবং হিন্দু জমিদারগণের সঙ্গে তাঁর বিরোধের ফলে তাকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার[২] করা হয়। এতে ধারণা করা যায় যে এই সময়ে তাঁর যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী ছিল না। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার একজন হিন্দু ভদ্রলোক স্থানীয় পত্রিকা 'দর্পণ' এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ'র ১২,০০০ তাঁতি এবং মুসলমান অনুসারী রয়েছে, এরা ফরিদপুর জেলার অধিবাসী। হাজী এই এলাকার সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হন। একই প্রতিবেদনে কিছু ঘটনায় প্রমাণ করে যে, হিন্দু জমিদারগণ তাদের বিরুদ্ধে শক্তিতে পেরে উঠছে না। আইনের আদালত বা দৈহিক শক্তি কোনটিতেই জমিদারগণ পেরে উঠছিল না। প্রতিবেদক আরও লিখেন যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর পূর্বসূরি তিতুমীর থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং ফরিদপুর আদালতের উকিল এবং কেরানীদের উপর তাঁর ব্যাপক প্রভাব ছিল।[৩] এই সময়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ'র কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল শিবচর থানার বাহাদুরপুর গ্রাম। এখানে পরবর্তী সময়ে দুদু মিয়া বসতি স্থাপন করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসামায়িক জেমস্ টেইলর বলেন যে, ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযী আন্দোলন ঢাকা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ জেলাগুলোতে 'অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল পুলিশের প্রধান দুদু মিয়াকে ৮০,০০০ লোকের নেতা হিসাবে রিপোর্টে উল্লেখ করেন'।[৪] ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে Calcutta Review'র সম্পাদক ফরায়েযীদেরকে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ফরায়েযীদের সংখ্যা ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জ জেলায় যথেষ্ট ছিল।[৫] দুদু মিয়ার সমসাময়িক জে.ই. গ্যাসট্রেল মনে

---

১ দ্রষ্টব্য, JASP, খণ্ড-৬, ১৯৬১, পৃ. ১২৩-২৪।

২ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

৩ দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সম্পাদিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, কলিকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, খণ্ড-৩, পৃ. ৩১১-১২

৪ দ্রষ্টব্য, James Taylor : Topography, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-৫০

৫ দেখুন, এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়।

করেন যে, ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল ফরায়েযী এবং ঢাকা বাকেরগঞ্জ এবং যশোর জেলার আরো জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ফরায়েযী। তিনি আরও লিখেন যে, ১৮৬২ সাল পর্যন্ত সময় ফরায়েযীদের সংখ্যা 'ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়'।[৬] পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পাওয়া যায় নবীন চন্দ্র সেনের আত্মজীবনী থেকে। তিনি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুরের মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। তাঁর মতে ফরায়েযী আন্দোলন ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ শহরে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল।[৭] তা' ছাড়া এই শহরগুলোর সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।[৮] উল্লেখ্য যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ'র জীবদ্দশাতেই ত্রিপুরা জেলায় ফরায়েযী আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল।[৯]

আদম শুমারী রিপোর্টে ফরায়েযীগণ নিজেদেরকে আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে তালিকাভুক্ত না করায় তাদের সংখ্যা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে হান্টার বলেন, 'ফরায়েযীদের সংস্কার ধর্মী মতাদর্শ ঢাকা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশই কৃষিতে নিয়োজিত থাকলেও অনেকেই[১০] ধান, পাট, চামড়া এবং তামাক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল।[১১] তিনি নোয়াখালী জেলার মুসলমানদেরকে সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করেন এবং তাদের অধিকাংশই ছিল ফরায়েযী।[১২] গেজেটিয়ারে নদীয়া জেলার মুসলমানদেরকে একইভাবে ওয়াহাবী বা ফরায়েযী হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[১৩] ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে আন্দোলন উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলায় বেশ প্রভাব বিস্তার করে।[১৪] ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয় যে, এই জেলায় ফরায়েযী আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে এবং পূর্ববঙ্গে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।[১৫] ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আসামের স্টাটিসটিক্যাল একাউন্টে হান্টার উল্লেখ করেছেন যে, সিলেট, গোয়ালপাড়া, লক্ষ্মীপুর শিবচর, দারাং এবং কামরূপ জেলার মুসলমানদের মধ্যে অনেক ফরায়েযী ছিল। ফরায়েযীগণ সম্প্রদায় হিসাবে স্বচ্ছল ছিল।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে যশোর, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জের জরিপের দায়িত্ব প্রাপ্ত জে.ই. গ্যাসট্রেল বলেন যে, ফরায়েযী আন্দোলনের রয়েছে নদী ভিত্তিক চরিত্র। তিনি দেখেন যে, মধুমতী, নবগঙ্গা, বারাকুর এবং হরিণ ঘাটা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ফরায়েযীদের সংখ্যা ছিল বেশী। প্রকৃত পক্ষে এই নদীগুলোর তীরবর্তী অঞ্চল ছিল তাদের দখলে।[১৬] এই গ্রন্থের লেখক কর্তৃক পরিচালিত

---

৬ J.E.Gastrell : Jessore, Fureedpore and Backergong, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
৭ গ্রন্থের ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৮ মওলবী কেরামত আলী 'ইশতিহার' দাখিরাত ই কারামত, খণ্ড-১, পৃ. ১০৮।
৯ দেখুন, পরিশিষ্ট ঙ।
১০ W.W.Hunter (Ed) Imperial Gazetteer of India, 1885। খণ্ড-৬, পৃ. ৩৯৯ থেকে
১১ ঐ, খণ্ড-১০, পৃ. ৩৪৪।
১২ ঐ, পৃ. ১৩৪।
১৩ ঐ, পৃ. ৫১৪।
১৪ দেখুন, East Bengal District Gezetteer, Chittagang, Calcutta, 1908, পৃ. ৫৬।
১৫ W.W.Hunter : Statistical Account of Assam, London, 1879, খণ্ড-১, পৃ. ৩৯, ১৮৮, ২৪৫ এবং খণ্ড-২, পৃ. ৪৭ এবং ২৮৩।
১৬ J.E.Gastrell : Jessore, Fureed pore and Buckergonj Calcutta, ১৮৬৯, পৃ ৩৬, নং ১৫০ এবং ১৫১।

মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ভুবনেশ্বর-আঁড়িয়াল খাঁ অববাহিকা ছিল ফরায়েযী মিশনারীদের গতিপথ। এরা এই পথে আসা-যাওয়া করে ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচার করত। ফরায়েযী বসতিসমূহে মাঠ পর্যায়ের বসতি স্থাপন করা হয়, যেখানে ফরায়েযী পরিবারসমূহ উক্ত তথ্য সরবরাহ করে।[১৭] পদ্মা নদীর শাখা ভুবনেশ্বর উত্তর এবং পূর্ব দিকের জেলাসমূহের সঙ্গে সহজেই যোগসূত্র স্থাপন করে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা এবং পাবনা জেলাসমূহ পদ্মা, যমুনা এবং মেঘনা নদীর মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপন করে। অন্যদিকে আঁড়িয়াল খাঁ নদী পদ্মায় পতিত হয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়ে সাগরে মিলিত হয়। বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীর সঙ্গে এদের মাধ্যমে প্রবেশ করা সহজ। উপরন্তু গ্যাসট্রেল বলেন যে, হরিনঘাটা এবং মধুমতীর মাধ্যমে ফরায়েযীগণ পশ্চিমাংশের সঙ্গে যশোর এবং খুলনা জেলার পূর্বাংশের যোগসূত্র স্থাপন করে।[১৮] স্বাভাবিক কারণেই ফরায়েযী আন্দোলন নদী বিধৌত এই জেলাগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। এই সূত্রে, এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বর্ষাকালে ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ঢাকা, ত্রিপুরা, পাবনা এবং নোয়াখালীর অধিকাংশ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। এই সময় ছোট নৌকায় সহজেই চলাচল করা সম্ভব হয়।[১৯] ফরায়েযী নেতাদের পারিবারিক তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিয়া এবং খান বাহাদুর সাইদ উদদীন সবসময় নৌকায় চলাচল করতেন। দেশের নদীমাতৃক চরিত্রের কারণে মওলানা কেরামত আলী এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণও এক স্থান থেকে অন্যস্থানে প্রচার কার্য চালানোর জন্য নৌকাকে অগ্রাধিকার দিতেন।

---

১৭ এখানে উল্লেখ্য যে, ভূবনেশ্বর আঁড়িয়াল খাঁ হলো একটি বিরতিহীন নদী বিধৌত অববাহিকা। কয়েকশতক পূর্বে এটা পদ্মা গঙ্গা নদীর চ্যানেল এবং যা এখনও ফরিদপুর জেলার প্রধান নদীপথ। ভূবনেশ্বর নদী পদ্মা নদীর শাখা হিসেবে ফরিদপুর শহরের কিছু পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে আঁকা বাঁকা দক্ষিণ পূর্বদিকে শিবচরের দিকে বয়ে গেছে। এখানেই হাজী শরীয়তুল্লাহ'র নিজ গ্রাম শামাইল এবং তাঁর উত্তরধিকারীদের গ্রাম বাহাদুরপুর অবস্থিত। শিবচরে এটি আঁড়িয়াল খাঁ নাম নিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়। একটি অংশ বাম দিকে অপরটি ডান দিকে বয়ে চলেছে। কিন্তু দুটি অংশই প্রায় বৃত্তাকারে প্রবাহিত হয়ে মাদারীপুর শহরের কাছাকাছি মিলিত হয়েছে। সেখান থেকে পদ্মার সমান্তরাল পথে বরিশাল শহরের কাছে পৌঁছে হাজী শরীয়তুল্লাহ্'র জীবদ্দশায় এটি তাঁর গ্রাম শামাইলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত এবং পদ্মা নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং ভুবনেশ্বর আঁড়িয়াল খাঁ নদীসমূহ এক দিকে ফরায়েযী নেতাদের গ্রামসমূহ যুক্ত করে অন্যদিকে বরিশাল শহরকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অংশের দিকে উন্মুক্ত করে।

১৮ এখানে বলা যায় যে, হরিণ ঘাটা এবং মধুমতী আবিরাম গতিতে একদিকে ফরিদপুর এবং অন্যদিকে খুলনা ও যশোরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পদ্মার সঙ্গে সাগরের যোগসূত্র রচনা করে।

১৯ উল্লেখ্য যে, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জ (ফরায়েযী নেতাদের নিজের জেলা) নদী বিধৌত জেলা। এই অঞ্চলে নৌকা হল প্রধান বাহন। নদী বাহিত অঞ্চল হওয়ায় বরিশাল রেলপথ স্থাপন পথ করা সম্ভব হয়নি। এবং ফরিদপুর সম্পর্কে জে, সি, জ্যাক বলেন, এমন স্থান খুব কমই রয়েছে যেখানে মাইল খানেক নদীর কোন বাঁধা ছাড়া অতিক্রম করা যায়। (দ্রষ্টব্য, J.C.Jack, Final Report on the survey and Setelment operctions in the Fareedpur District, 1904-1914, Calcutta 1916, পৃ. ৬) উপরন্তু ফরিদপুর জেলার জনসংখ্যার বসতি সম্পর্কে L.S.S.O Malley বলেন, এটা ধারণা করে সাধারণভাবে বলা যায় যে, মুসলমানেরা চর এবং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ট এবং হিন্দুরা অভ্যন্তরীণ জেলাগুলোর আশে পাশে সংখ্যাধিক হারে রয়েছে। (দ্রষ্টব্য, Bengal District Gezetter Fareedpur. Calcutta, 1925. পৃ. ৩৬) ফরায়েযী আন্দোলনের নদীভিত্তিক চরিত্রের এটা অন্যতম কারণ হতে পারে।

ফরায়েযী আন্দোলন প্রসারে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, সেটি হলো যে, সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন প্রসার লাভ করে। যেখানেই আন্দোলন কাজ করেছে সেখানেই তা ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমা, ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমা এবং ঢাকা জেলার রেকাবিবাজার গ্রামের কথা বলা যায়। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের বাইরে ফরায়েযী আন্দোলন প্রসারে তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আসাম, আগরতলা রাজ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কয়জন ফরায়েযীদের সন্ধান পাওয়া যায় তারা মূলত ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলা থেকে আগত মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত। পশ্চিমবঙ্গে এমন ধরনের হিজরত না ঘটায় ফরায়েযী আন্দোলন ওখানে একেবারেই প্রসার লাভ করেনি।

বাংলায় ব্রিটিশদের দ্বারা যে সকল প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা হয় তাতে নগর ও গ্রামীণ মুসলিম সমাজ কোনো না কোনো প্রকারে প্রভাবান্বিত হয়। যেমন নগর কেন্দ্রিক মুসলমানেরা সরকারি চাকুরি, ব্যবসা, বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশায় নিয়ন্ত্রণ হারায় অপর দিকে গ্রামীণ মুসলমানেরা ইউরোপীর নীলকর এবং হিন্দু জমিদারগণ দ্বারা নির্যাতিত হয়। সুতরাং রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে প্রথমোক্ত শ্রেণী এবং গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসায় শেষোক্ত শ্রেণী দুর্ভোগে পতিত হয়। ফরায়েযী মতাদর্শের সঙ্গে হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংঘাত বলে ঢাকা, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম শহরের মুসলমানদের উপর ফরায়েযীগণ তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের যেসব স্থানে এ ধরনের সমস্যা বিশেষ করে হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার ছিল, সেসব স্থানে ফরায়েযী আন্দোলন সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এই আন্দোলন গ্রামীণ বাংলার নিম্নবিত্তশ্রেণীর মধ্যে বেশী জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া যে সকল স্থানে হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার ছিল সেসব স্থানে এই আন্দোলন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ফরায়েযী আন্দোলনের বিকাশ একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় বিকশিত হয়। প্রথমত ফরায়েযী নেতারা স্থানীয় শহর বা গ্রামে কিছু প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে। হাজী শরীয়তুল্লাহ ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে, ঢাকা জেলার নয়াবাড়ি ও রেকাবিবাজারে এবং ফরিদপুরের কমলাপুরে এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। সাধারণত স্থানীয় ফরায়েযীগণ এইসব কেন্দ্রে একটি বিশ্রামাগার তৈরি ও সংরক্ষণ করত, যা আস্তানা হিসেবে পরিচিত ছিল। এই আস্তানায় ফরায়েযীনেতাগণ আরাম করতেন এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত ফরায়েযীগণ অবস্থান করত। ফরায়েযীনেতাগণ এই সকল স্থান কিছুদিন পরপর সফর করতেন এবং দূর দূরান্তের লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন। এই সকল আস্তানায় হাজী শরীয়তুল্লাহ্'র আগমনে বহুলোকের সমাগম হতো। কারণ তাঁর নাম ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফরায়েযী মতাদর্শে দীক্ষিত নতুন ব্যক্তিরা, সাধারণত খুব উৎসাহী হয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহর বাণী প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাইদের কাছে নিয়ে যেত। এরা 'প্রচার কেন্দ্রের' অনুকরণে তাদের নিজ গ্রামে 'আস্তানা' তৈরি করে প্রভাবশালী ফরায়েযীকে নেতা নির্বাচিত করত। পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে দুদু মিয়ার সময়ে এই ধরনের

নেতাদেরকে 'গাও খলিফা' হিসাবে নির্বাচিত করা হতো।[২০] ত্রিপুরা জেলায় এই ধরনের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ লাকসামের সন্নিকটে অবস্থিত সিঙ্গারদা গ্রামের জনৈক আজিমউদ্দীন খন্দকার চাঁদপুরে হাজী শরীয়তুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফরায়েযী মতাদর্শে দীক্ষিত হন। গ্রামে ফিরে এসে আজিমউদ্দীন ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচারে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই ফরায়েযীদের সংখ্যা এতোবৃদ্ধি পায় যে, ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় নেতা নিয়োগের জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই জন্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ আজীমউদ্দীনকে খলিফা নিয়োগ করেন।[২১] কিন্তু ত্রিপুরা সদর মহকুমায় ফরায়েযী অনুসারীদের সংখ্যা এতোবৃদ্ধি পায় যে, দুদু মিয়ার সময়কালে এখানে আরও পাঁচজন খলিফা এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফা নিয়োগ করতে হয়েছিল।[২২]

দুদু মিয়ার জীবদ্দশায় ফরায়েযী মতাদর্শের প্রচার গতিশীল হয়। হিন্দু জমিদারগণের বিরুদ্ধে চমকপ্রদ সাফল্য, ইংরেজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার এবং তাঁর অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। গ্রামে গ্রামে ব্যাপক সফর তাকে গ্রাম বাসীদের অতি নিকটে নিয়ে যায়। তাঁর দলে যোগ দেবার বিষয়ে কেউ দ্বিধা করেনি। এর ফলে ফরায়েযী আন্দোলনের ঢেউ পূর্ববাংলায় বয়ে যায়। তা সত্ত্বেও ফরায়েযীগণ সমর্থকদের তুলনায় কম অনুসারী পায়। দুদু মিয়ার মৃত্যুবরণ করার পর এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। মওলানা কেরামত আলীর প্রচারের ফলে ফরায়েযীদের সাফল্যে ভাটা পড়ে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফরায়েযী প্রচারকগণ সনাতন মুসলিম সমাজকে (ফরায়েযীগণ এদেরকে 'রিওয়াজী' বলত) বুঝাতে সক্ষম হয় যে, ইসলামের নামে সমাজ কুসংস্কার এবং বিভিন্ন অনাচারে ডুবে আছে। কিন্তু ফরায়েযীগণ তাদের শুদ্ধিবাদী ইসলাম প্রচারের সঙ্গে জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিল যা 'রেওয়াজী' মুসলিম সমাজ মেনে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। জনসাধারণের মনে এর আকর্ষণ এবং প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সম্ভবত মুসলিম সমাজে নতুন একটি বিরোধ তৈরি করে যা মওলানা কেরামত আলীর সংস্কার গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর ফলে মওলানার অধিকার সহজ সংস্কারসমূহ সাধারণভাবে জনগণ গ্রহণ করে। সুতরাং উনিশ শতকের শেষার্ধে অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কারপন্থী দলসমূহ তাইউনী, তরীকা ই মোহাম্মদীয়া এবং আহল ই হাদিস জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠান করাকে সমর্থন করায় পূর্ববঙ্গে ফরায়েযীদের সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জে ফরায়েযীদের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। এই জেলাগুলোতে ফরায়েযীদের শক্তিশালী প্রচার কেন্দ্র ছিল। এমনকি উক্ত নামাজের বিরুদ্ধে এই জেলাগুলোতেও মুসলিম সমাজ দুইভাবে বিভক্ত ছিল। ফরায়েযীগণ বে-জুমআওয়ালা[২৩] এবং অন্যরা জুমআওয়ালা

---

২০ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়।

২১ ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থকার মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানের সময় আজিম উদ্দীন খন্দকারের পরিবার থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত বিবরণটি হাজী শরীয়তুল্লাহ্'র পরিবারে সমভাবে প্রচলিত। দেখুন, পরিশিষ্ট-চ।

২২ দেখুন, গ্রন্থের, পরিশিষ্ট-চ।

২৩ পরিশিষ্ট-ঙ, দ্রষ্টব্য।

হিসেবে পরিচিত ছিল। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রচুর পারিবারিক নথি এবং তথ্যাদি উক্ত জেলাগুলো থেকে সংগৃহীত হয়। এই সকল তথ্যাদি দ্বারা ধারণা করা যায় যে, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার মৃত্যুর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রথমোক্ত দল থেকে শেষোক্ত দলে যোগ দেবার প্রবণতা দেখা যায়। তাই বর্তমান (১৯৬০ খ্রি.) সময়ে ফরায়েযীদের সংখ্যা বেশী দেখা যায় শুধুমাত্র ঢাকা জেলার নারায়নগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় এবং ত্রিপুরা কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর ও সদর মহকুমা অঞ্চলে।[২৪] সুতরাং দুদু মিয়ার সময়কালে ফরায়েযী আন্দোলনের হঠাৎ করে প্রসার লাভ করেছিল মূলত তাঁর নেতৃত্বের জন্য যা মুসলিম জনসাধারণের আকাঙ্খিত ছিল। সে সময়ে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রসার তা প্রমাণ করে।

---

২৪ দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট চ।

পরিশিষ্ট সমূহ

(ক) ফরিদপুর জেলার মুসলিম সমাজের বিভিন্ন বর্ণ

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর, ফরিদপুরের কালেক্টর ডব্লিউ.এ. ওয়েলস্ নিম্নোক্ত দলিলের পাণ্ডুলিপি স্বাক্ষর করেছেন। এর মাধ্যমে ফরিদপুর জেলায় বাসরত বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকদের গণনায় জানা যায়। ফরিদপুর কালেক্টরেটে দলিলটি সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে লেখক কর্তৃক ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে দলিলটির নকল গ্রহণ করা হয়।

এই দলিল অনুসারে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার মোট লোক সংখ্যা ছিল ১০,১২,৫২৪ জন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৫,৮৮,৫২২ জন, হিন্দু ৪,২৩,৫৯৯ জন খ্রিস্টান ৪০১ জন। অহমীয়া-১ জন ও মালাবার-১ জন হিন্দু জনসংখ্যাকে ১০৮ টি বর্ণ এবং উপবর্ণে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং মুসলমান জনসংখ্যাকে ১৮ টি বর্ণে তালিকাভুক্ত করা হয়। মুসলমান জনসংখ্যার অংশটি নিম্নে প্রদান করা হলো :

সূত্র নং, ৫২০, তারিখ-১৯.৯.৭২।
প্রেরক-ডব্লিউ.এ.ওয়েলস্ ।
কালেক্টর অব ফরিদপুর
প্রাপক-কমিশনার, ঢাকা

বিষয়-ফরিদপুর জেলার জনসংখ্যার বিভিন্ন বর্ণ (Caste)

মুসলমান (অনুচ্ছেদ-১)

ক্রমিক নং	বর্ণ (Caste)	সংখ্যা	মন্তব্য
১	বেলদার	৩১৩	খনক
২	দাই	১৯৫	মহিলা ধাত্রী
৩	ধাওয়া	২০	মৃদী (?)
৪	জোলা (জোলাহা)	৬০৩৬	তাঁতি
৫	কাহার	১৩	বাহক
৬	কারিগর	১৪২	তাঁতি
৭	খুলু	৩৭৯	তেলী

৮	কানজিয়া	০৪	সজ্জি বিক্রেতা
৯	মোগল	০২	এই জেলায় বসতি স্থাপনকারী উত্তর প্রদেশের মোগল।
১০	মশালচী	৫০	মশাল বাহক
১১	মোল্লাহ	৮৫	ধর্ম প্রচারক
১২	শনাক্ত বিহিন	৫,৭৪,৭৪০	
১৩	নাগারচী	৪০	টমটমের বাদক
১৪	নিকারী	২৬০	মাছ বিক্রেতা এবং মাছ প্রক্রিয়া জাতকারী
১৫	পাঞ্জারী	১০	মাছ বিক্রেতা
১৬	পাঠান	২২৯	
১৭	শেখ	৫৫৩৪	
১৮	সৈয়দ	৪৮০	
	মোট	৫৮৮,৫২২	জন।

পরিশিষ্ট-খ

ফরায়েযীদের সঙ্গে মাওলানা কেরামত আলীর বিরোধ মোকাবেলা

হাজী শরীয়তুল্লাহ'র জীবনের শেষ বছরে বা ১২৪৫ বঙ্গাব্দে (১৮৩৯ খ্রি.) মওলানা কেরামত আলীর সঙ্গে যে মতবিরোধ হয় তা ওয়াজির আলী তাঁর গ্রন্থ 'মুসলিম রত্নহার' এ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-[২৫]

'বারশ'পাঁচচল্লিশ সালে হিন্দুস্থানী।
মাওলানা ক্রামত আলী আসে বঙ্গে শুনি ॥
তিনি আসি জুমা ঈদ আদেশিয়া দিল।
ভবিষ্যতে দু একজন সে দিকে ঝুকিল ॥
এই মাত্র ক্রামত আলীর রায় হইল নাম।
পূর্বেতে দুদু মিঞার রায় আছিল তামাম ॥

---

২৫ ওয়াজির আলী : মুসলিম রত্নহার, পৃ. ৯।

পরিশিষ্ট-গ

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় ধার্যকৃত বিভিন্ন ধরনের কর ও খাজনার একটি রিপোর্ট। রিপোর্টটি ফরিদপুরের কালেক্টর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে।

প্রেরক
কালেক্টর ফরিদপুর
প্রাপক-বঙ্গীয় সরকারের সচিব

বিষয়-স্থানীয় কর ও খাজনা সম্পর্কিত রিপোর্ট।

মহোদয়,

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মে তারিখের সার্কুলার এর সূত্রে জানাচ্ছি যে, সরকারের আদেশে এই জেলায় কোনো স্থানীয় কর বা খাজনা ধার্য করা হয়নি।

আমি এতদসঙ্গে আপনার সদয় অবগতির জন্য দুটি তালিকা যুক্ত করছি।[২৬] এর একটি আইনসঙ্গতভাবে ধার্য করা-করসমূহের তালিকা এবং অপরটি আমার ধারণা ধার্যকৃত অবৈধভাবে করসমূহের তালিকা।

স্বাক্ষরিত
ডব্লিউ. এ.ওয়েলস্।

২। ফরিদপুর জেলায় ধার্যকৃত অবৈধ করের তালিকা –
করের নাম বর্ণনা

১	মারুচা	বিবাহ কর
২	আগমনী খর্চা	স্থানীয় কাচারীতে জমিদারের আগমন উপলক্ষে ধার্যকৃত।
৩	বিবাহ খরচা	জমিদারের পরিবারে অনুষ্ঠিত যে কোন বিবাহের উদ্দেশ্যে ধার্যকৃত।
৪	শ্রাদ্ধ খরচা	জমিদারের মা, বাবা, অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ কোন সদস্যের মৃত্যুর কারণে ধার্যকৃত।

২৬ বর্তমান লেখক ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর কালেক্টরেটের রেকর্ডরুম থেকে সংগ্রহ করেন। ফরিদপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে চিঠি, নং ১৬৯, ১৬ মে, ১৮৭২, ফাইল : ১৮৭২-৭৩, ফরিদপুর কালেক্টরেট রেকর্ডস।

৫	পৈতা খরচা	জমিদার তনয়ের পৈতা গ্রহণ উপলক্ষে।
৬	ভূরা খরচা	জমিদার তনয়ের বাহুতে ছিদ্র করা উপলক্ষে এটাকে গো-দানী খরচাও বলা হয়।
৭	তেরপাল	১৮৬৪ সালের ঝড়ের কারণে ধার্যকৃত
৮	মোকদ্দমা খরচা	আদালতে জমিদারের মামলার খরচ নির্বাহের জন্য।
৯	জরিমানা	রায়তদের মাঝে সংঘটিত বিরোধের জন্য ধার্যকৃত।
১০	দরখাস্তের জন্য রুসুম	জমিদারের কাছে দাখিল কৃত যে কোন দরখাস্তের জন্য ধার্যকৃত।
১১	বাইন সেলামী	গুড় বা চিটাগুড় তৈরীর জন্য ধার্যকৃত(খেজুর গাছ থেকে ?)
১২	সেলামী	গুড় বা চিটাগুড় তৈরীর জন্য ধার্যকৃত (আখ থেকে ?)
১৩	রথ খরচা	জমিদারের রথ যাত্রা উৎসব উপলক্ষে ধার্যকৃত।
১৪	বাট্টা	রায়ত কর্তৃক পরিশোধিত খাজনার ঘাটতি মেটানোর জন্য ধার্যকৃত।
১৫	পেয়াদা খরচা	খাজনা আদায়ে নিয়োজিত পিয়নদের জন্য ফি বাবদ
১৬	তোহারি	খাজনা গ্রহণকারী জমিদারের আমলার জন্য ধার্যকৃত
১৭	ভেট	রায়তের পরিবারে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধের জন্য জমিদারকে দেয় উপহার।
১৮	মৎস্য জোগার	জেলে কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহকৃত মাছ।
১৯	পেওরা খরচা	অস্পষ্ট।
২০	গাজী খরচা	শীতকালীন পোষাকের জন্য জমিদারকে দেয় খরচ।
২১	মালিকানা সরঞ্জামি খরচা	আমলার বেতন প্রদানের কারণে পনর্ভরনের জন্য ধার্যকৃত।
২২	ছাতা বা ছত্র খরচা	জমিদারের ছাতা বাহকের জন্য খরচ
২৩	ইমাম খরচা	মুসলিম এবং হিন্দু জমিদারগণ কর্তৃক ধার্যকৃত মহররম উপলক্ষে দেয় চাঁদা জন্য।[২৭]

২৭ ফাইল-১৮৭২-৭৩, ফরিদপুর জেলা কালেক্টরেট। বৈধ করের ১নং তালিকা ফাইলে পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট-ঘ

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ধার্যকৃত ভূমি খাজনা'র হার সম্পর্কিত

ফরিদপুর কালেক্টরের প্রতিবেদন।[২৮]

প্রেরক

ডব্লিউ.এ.ওয়েলস্ ফরিদপুরের কালেক্টর

প্রাপক, সচিব, বাংলা সরকার।

মহোদয়,

গত চার তারিখে আপনার সার্কুলার নং ৩৩ সূত্রে দুটি বিবরনী প্রেরণ করছি। এর একটি গোয়ালন্দ মহকুমা এবং অপরটি সদর মহকুমা সম্পর্কিত।

২। পুলিশের মাধ্যমে সতর্কতার সঙ্গে তদন্তপূর্বক এই হার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। জেলার অনেক বিশিষ্টব্যক্তি যাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

৩। বিভিন্ন পরগনায় বিভিন্ন হার রয়েছে কিন্তু পার্থক্য সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায়নি। একই থানার অন্তর্গত বিভিন্ন পরগনার ধার্যকৃত খাজনার হারে পার্থক্য রয়েছে। একই ধরনের জমি এবং একই ধরনের ফসল হওয়া সত্ত্বেও পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু ব্যবধান খুব বেশী না হওয়ায় ব্যাখ্যা চাওয়া হয়নি।

৪। জমিদারের ক্ষমতা এবং প্রভাবের ভিত্তিতে খাজনার হার নির্ধারিত করে থাকে। এই জেলায় সাধারণভাবে দেখা যায় যে, দুই খণ্ড জমি পাশাপাশি এবং প্রতিটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও খাজনার হারে পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ জমি ছুটির মালিকের ক্ষমতা এবং প্রভাব। সংক্ষেপে বলা যায় যে, জমিদার ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী হলে খাজনার হার বেশী দেখা যায় এবং দুর্বল ও দরিদ্র হলে অপেক্ষাকৃত কম খাজনা দায়ের করা হয়ে থাকে।

স্বাক্ষর

ডব্লিউ.এ.ওয়েলস।

---

২৮ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থকার ফরিদপুর জেলা মেজিস্ট্রেটের অনুমতি ক্রমে ফরিদপুর কালেক্টরেট থেকে সংগ্রহ করেন। দ্রষ্টব্য ইস্যুকৃত চিঠি ১২ সেপ্টে, ১৮৭২।

পরিশিষ্ট-৬

চাঁদপুরের ফরায়েযী বসতি মাঠ পর্যায়ের একটি সমীক্ষা (১৯৫৮ খ্রি.)

ফরায়েযী আন্দোলন প্রসারে নদী বন্দর চাঁদপুর বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ এবং তাঁর পুত্র দুদু মিয়া প্রায়শ চাঁদপুর পরিদর্শন করতেন। এই স্থানটি সবসময়ই ফরায়েযীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মহকুমার (বর্তমানে জেলা) সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে এই স্থানটি প্রভাব বজায় রাখে। এই মহকুমার গ্রামীণ প্রশাসনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। ৫৩ টি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মধ্যে ৩৫ জন প্রেসিডেন্ট ফরায়েযী সম্প্রদায়ভুক্ত।[২৯]

ফরায়েযী সূত্রাণুসারে মূল চাঁদপুর এলাকাটি হল চরলক্ষ্মী থেকে ষাটনল (প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ থেকে উত্তর) এবং মেঘনা থেকে শাকদী (প্রায় ৮মাইল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক) এই স্থানটি ফরায়েযীদের দ্বারা (দুদু মিয়ার সময় থেকে) একশতটি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিটের নেতৃত্ব ছিল একজন খলিফার উপর। প্রায় ২২ থেকে ২৮ জন ইউনিট খলিফা (অফিসিয়েল পদবি ছিল ব্লক খলিফা) একজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। সুতরাং বর্তমানে চাঁদপুরে ১০০ ব্লক খলিফা রয়েছে এবং চারজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফা আছে। চাঁদপুর শহরের তত্ত্বাবধায়ক খলিফা মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ'র (গ্রন্থ রচনাকালে) অধীনে রয়েছে মাত্র ১০জন ব্লক খলিফা। তাঁর তত্ত্বাবধানে খলিফাদের সংখ্যা কম থাকার কারণ এবং আয়তন ছোট করার কারণ ছিল যে এলাকাটি শহর ছিল।[৩০] শহরের নানা সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ছিল উক্ত খলিফার দায়িত্ব।[৩১] ব্লক খলিফা মওলবী হারুন আল রশিদের তত্ত্বাবধানে ছিল ৩৬০টি বাড়ি, যেগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর অধীনে ছিল।

চাঁদপুরের প্রথম খলিফা ছিলেন মুনির উদ্দীন। তিনি শৈশবে হাতিয়া থেকে চাঁদপুর আসেন আরবি এবং ফার্সি শেখার জন্য। পরবর্তী সময়ে তিনি স্থানীয় একজন মেয়েকে বিয়ে করেন এবং চাঁদপুরের স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন তিনি কয়েকবার হাজী শরীয়তুল্লাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শরীয়তুল্লাহ চাঁদপুর আগমন করলে দুইজনের সাক্ষাৎ হয় এবং মুনিরউদ্দীন, হাজী শরীয়তুল্লা'র একজন একনিষ্ঠ শিষ্যে পরিণত হন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। হাজীর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তাকে খলিফা করা হয়। তিনি ১২৮২ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৩২]

---

২৯ চাঁদপুর শহর এলাকার ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট হাজী আবদুল কাদির ভূঞার অভিমত (১৯৫৮খ্রি.) যিনি নিজে একজন ফরায়েযী ছিলেন।

৩০ মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ'র বক্তব্য।

৩১ মওলবী হারুন আল রশীদের বক্তব্য।

৩২ চাঁদপুর শহরের নতুন বাজারের ৪/১২ওয়ার্ডে অবস্থিত মুনির উদ্দীনের সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ। বাংলা অক্ষরে লিখিত, 'পীর মুনির উদ্দীন খলিফা'

এরপর তাঁর খিলাফত গ্রহণ করেন হামিদ উল্লাহ্ যিনি মুনিরউদ্দীনের জামাতা ছিলেন। হামিদউল্লাহ্ ৭৬ বছর বয়সে ১৩২২ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র আবদুল কাদের বর্তমান (গ্রন্থ রচনা সময়) চাঁদপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তাঁর খিলাফত গ্রহণ করেন আবদুল কাদিরের জামাতা মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ্ ।

পুরনো দিনের দ্বিতীয় প্রধান ফরায়েযী খলিফা ছিলেন পাহ্-লোয়ান গাজী মুনশী। তিনি একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং ঐগুলোর জন্য ১৫ বিঘা জমি দান করেন। মাদ্রাসাটি দুদু মিয়ার নামাণুসারে 'মোহসিনিয়া মাদ্রাসা' নামকরণ করা হয়।[৩৩] প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান সময় (গ্রন্থটির রচনার কালে) পর্যন্ত ভালভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ১২০ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

পাহলোয়ান গাজী ছিলেন একজন তত্ত্বাধায়ক খলিফা যাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল ২৮টি গ্রাম। তাঁর খিলাফত গ্রহণ করেন তাঁর পৌত্র রফি মোহাম্মদ পাটোয়ারী। রফি'র পুত্র মওলবী সামির উদ্দীন আহম্মদ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হন। এই এলাকার বর্তমান খলিফা মোহাম্মদ সাইদউদ্দীন তাঁর পুত্র।[৩৪]

ফরায়েযী আন্দোলনের শেষের দিকের আরও একজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফা ছিলেন শাহ্ মোহাম্মদ ওয়াহিদ বখ্‌শ যিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই সময় তিনি প্রায় ৬০ বছর বয়স্ক ছিলেন। আমিরাবাদ পরগণার ২৫টি গ্রাম তাঁর অধীনে ছিল। তিনি একজন তালুকদার ও খান বাহাদুর সাইদউদ্দীনের খলিফা ছিলেন।[৩৫] তিনি সাহার মালিতে একটি উচ্চ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনগণের উপর তাঁর বেশ প্রভাব ছিল।[৩৬] হাজী শরীয়তুল্লাহ'র জীবদ্দশায় চাঁদপুরে মাত্র কয়েক হাজার ফরায়েযী ছিল। কিন্তু যখন দুদু মিয়া আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন তখন এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অল্পকালে মধ্যেই এই মহকুমার (বর্তমান জেলা) সকল অধিবাসী এই মহান নেতার একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে পড়ে।

মুনির উদ্দীন খলিফা এবং পাহলোয়ান গাজীর সময়ে চাঁদপুর শহরে কোনো আইনী আদালত ছিল না। নিকটতম আদালত নাসির নগরে ছিল। তাই সমাজে আইন শৃংখলা রক্ষায় খলিফা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতেন।

ফরায়েযীগণ ৪০ বা তদোর্ধ্ব পরিবার নিয়ে ছোট সমাজে সংগঠিত ছিল। প্রতিটি সমাজে ছিল পাঁচজন মাতব্বর (বয়োজ্যেষ্ঠ) যাদের মাধ্যমে খলিফা জনসাধারণের বিচার পরিচালনা করতেন। যদি কোনো ব্যক্তি খলিফার বিচারে সন্তুষ্ট না হতো, তাহলে তাঁর আপিল করার স্বাধীনতা থাকত। এই আপিল ফরিদপুরে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রধানের নিকট করতে হতো। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি ব্রিটিশ কোর্টের আশ্রয় নিত তাহলে তাঁর অভিযোগ নিশ্চিতভাবে হেরে যেতো। কারণ প্রথমত কেউই সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে ক্ষমতাধর ফরায়েযী খলিফাকে বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস করত না। দ্বিতীয়ত সে সমাজে একঘরে হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকত। তা' ছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামীণ

৩৩ দুদু মিয়ার নাম ছিল মোহসিন উদ্দীন আহম্মদ।
৩৪ মোহাম্মদ সৈয়দ উদ্দীন খলিফার বক্তব্য থেকে।
৩৫ দুদু মিয়ার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র যিনি পরবর্তী সময়ে ফরায়েযী আন্দোলনের 'উস্তাদ' ছিলেন।
৩৬ শাহ্ ওয়াহিদ বখশের আত্মীয় শাহ্ মোহাম্মদ হাসানের বক্তব্য থেকে।

অঞ্চলে যেখানে সংগঠিত ফরায়েযীরা ছিল সেখানে কোর্টের রায় বাস্তবায়িত করা দুরূহ ছিল।

খলিফা কর্তৃক শাস্তি প্রদানের মধ্যে ছিল বেতমারা, জুতাপেটা করা এবং সমাজে একঘরে করে রাখা। ব্লক খলিফা এবং তত্ত্বাবধায়ক খলিফা দ্বারা এই ধরনের শাস্তি অনুশীলন করা হতো। এই ব্যবস্থা অদ্যাবধি চালু আছে।

চাঁদপুর অধিবাসীদের উপর ফরায়েযীদের বর্তমান প্রধান (১৯৫৮খ্রি.) পীর বাদশাহ্ মিয়ার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাঁর ধর্মপরায়ণতা সাদা-সিদা জীবন এবং নৈতিক সাহস ফরায়েযী এবং অফরায়েযী উভর দ্বারাই প্রশংসিত হতো। তিনি চাঁদপুর শহর থেকে কয়েকশত পতিতাকে উচ্ছেদ করেন।

বর্তমান সময়ে সমাজে ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে ফরায়েযী খলিফাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন এবং তাঁর এলাকার প্রতিটি বিয়ের জন্য দুই টাকা ফি গ্রহণ করে থাকেন। ভূমি সম্পদের যে কোনো বিরোধ সমাধান, উত্তরাধিকারী ব্যবস্থা, বিয়ে এবং তালাকনামার বিষয় খলিফার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল। এছাড়া যাঁরা ধর্মবিরোধী বা সমাজ বিরোধী কাজ করত তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করতেন এবং দুর্যোগের সময় তাঁর সাহায্য এবং পরামর্শ আগ্রহভরে গ্রহণ করা হতো।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুরে পুরাতন ফরায়েযী প্রশাসন পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হয়। একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয় যাঁর নাম দেয়া হয় 'শরীয়তিয়া মোমেন কমিটি'। গ্রামসমূহে এই কমিটির ২৪ টি শাখা খোলা হয় এবং প্রতিটি শাখায় ৫ জনের কমিটি করা হয়, যাঁরা জনগণের মধ্যে 'শরিয়া' প্রয়োগ করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করত।[৩৭]

এই সমিতি এক বছরের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করে কিন্তু ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে থেকে তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে।

ভারত বিভক্তির কিছুদিন পর পীর বাদশা মিয়া চাঁদপুর পরিদর্শন করেন এবং শহরে জুমআ আদায়ের বিষয়ে জনগণকে অনুমতি দেন। 'শরীয়তিয়া মোমেন কমিটি' প্রথম জুমআ অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর একটি সভা আহ্বান করে। সেই সময় থেকে শহরে ফরায়েযীগণ ঈদ ও জুমআ আদায় করে থাকে। কিন্তু এই নামাজসমূহ গ্রামে আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়নি। তা' সত্ত্বেও ফরায়েযীদের কেউ কেউ অন্যান্য মুসলিমদের সঙ্গে গ্রামে জুমআ আদায় করে থাকে।

---

৩৭ বর্তমান লেখক কর্তৃক 'শরিয়তিয়া মোমেন কমিটির' বেশ কিছু নথিপত্র সংগৃহীত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-চ

ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফরায়েযী বসতি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের একটি প্রতিবেদন (১৯৫৮ খ্রিঃ)

ফরায়েযী প্রচারণা কেন্দ্র বাহাদুরপুর (ফরিদপুর জেলা), রেকাবিবাজার (ঢাকা জেলা) নদীবন্দর চাঁদপুর (বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা), গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃত পক্ষে, এই তিনটি কেন্দ্র যেন ত্রিভুজের তিনটি বাহু, যেগুলোর মাধ্যমে ফরায়েযী প্রভাব প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে। হাজী শরীয়তুল্লাহ'র জীবদ্দশায়ই চাঁদপুর ফরায়েযীদের একটি শক্তিশালী ঘাটিতে পরিণত হয়। এই নদী বন্দরে তাঁর নিয়মিত আগমনের ফলে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ধর্মীয় আবেগে উজ্জীবিত হয়ে অথবা হাজীকে দেখার জন্য দূরবর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক লোকজন চাঁদপুরে আসত।

ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য তওবা করার আহ্বানের মাধ্যমে হাজী শরিয়তুল্লাহ তাদেরকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের অন্তরে নতুন আশা এবং মহান আবেগ সৃষ্টি করেছে। এরফলে এরা উজ্জীবিত ফরায়েযী হিসেবে ঘরে ফিরে গেছে অথবা ফরায়েযী আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে সংগঠিত হয়েছে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ কখনও ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেননি বিধায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসূত্রের মাধ্যম হিসাবে তাই (চাঁদপুর আগমন) ছিল মুখ্য।

নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলা থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রমাণ করে যে, হাজী শরিয়তুল্লাহ'র জীবদ্দশায় (১৮৪০ পর্যন্ত খ্রিঃ) এই জেলাগুলোর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফরায়েযী আন্দোলন তেমন বাধাগ্রস্ত হয়নি। তাইউনী আন্দোলনের নেতা মওলানা কেরামত আলীর (নোয়াখালীতে তিনি সৈয়দ আহম্মদ শহীদের সংস্কার মতাদর্শ প্রচার করেন)। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এই জেলার প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ফরায়েযী আন্দোলনের বিকাশ ব্যাহত করে। সুতরাং বাস্তবে ফরায়েযী আন্দোলন এই সময়ের পূর্বে নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বজন প্রিয় হতে পারেন নি। ফরায়েযী নেতৃবৃন্দের যথাযথ মনোযোগের অভাবে হয়ত তা হতে পারে।

১৮৩০ এর দশকে ফরায়েযীদের সংখ্যা অবশ্য এই দুটি জেলায় বিশেষ করে ত্রিপুরা সদর মহকুমায় বেশ বেড়ে যায়। সুতরাং শেষোক্ত স্থানে একজন খলিফা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা হয়। তাই সিঙ্গার দাহের আজিম উদ্দীন খন্দকারকে হাজী শরীয়তুল্লাহ্ খলিফা নিযুক্ত করেন এবং ফরায়েযী সমাজে শরীয়াভিত্তিক প্রশাসনের দায়িত্ব দেন।

এছাড়া ফরায়েযীদের মধ্যে কোন বিতর্ক সৃষ্টি হলে তা শালিসীর মাধ্যমে করারও দায়িত্ব দেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে আজিম উদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন এবং খিলাফত বংশীয়ভাবে বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

১৮৪০ এর দশকে দুদু মিয়া এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা ফরায়েযী আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জমিদারগণের বিরুদ্ধে তাঁর চমকপ্রদ সাফল্য ইংরেজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ এবং তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিকযোগ্যতা সাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে আকর্ষণ করে। অন্যদিকে ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর সফরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দুদু মিয়ার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়। ফলে ফরায়েযী আন্দোলনের জোয়ার ত্রিপুরা জেলায় বয়ে যায়।

যদি আমরা বর্তমান প্রজন্মের (১৯৫৮খ্রি.) সাক্ষ্য গ্রহণ করি তাহলে এই ধারণা সৃষ্টি হবে যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা দুদু মিয়ার একটি সুরক্ষিত উপনিবেশ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ওখানে ফরায়েযীদের সংখ্যা নগণ্য। ত্রিপুরা জেলার অন্য দুটি মহকুমা সদর ও চাঁদপুর মহকুমার দুদু মিয়ার ব্যাপক অনুসারী এবং অনেক গ্রাম আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন যা বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

কুমিল্লা সদর মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফরায়েযী বসতিসমূহের অবশিষ্টাংশ থেকে ধারণা করা যায় যে, ফরায়েযী মতাদর্শের প্রভাব চাঁদপুর থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। চাঁদপুর থেকে কচুয়ার গ্রাম সমূহের একটি ছোট অংশ এবং দাউদকান্দি পর্যন্ত ফরায়েযীদের প্রাধান্য এখনও বিদ্যমান আছে।

দুদু মিয়ার জীবদ্দশায় (মৃত্যু ১৮৬২ খ্রি:) এই এলাকার খলিফাদের সংখ্যা পাচঁজনে উন্নীত করা হয়। এর সঙ্গে আজিম উদ্দীন খন্দকারের বংশধরেরাও ছিল।[৩৮] আবার তাদের মধ্যে থেকে দরবেশ আলী মুন্সীকে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা নিযুক্ত করা হয়। কচুয়া, চান্দিনা এবং দাউদকান্দি স্যার্কেলের বা গির্দের জন্য। এই সার্কেলে তাঁর নিজের খলিফা[৩৯] ছিল যাদের সাহায্যে তিনি ফরায়েযীদের মধ্যে ধর্মীয় ন্যায়বিচার বা শরীয়া প্রয়োগ করতেন। এছাড়া দুদু মিয়া তাকে নিজের অনুসারী সংগ্রহের ক্ষমতাদান করেন। চাঁদপুর থেকে লাকসাম পর্যন্ত রেললাইন ফরায়েযী বসতির ধারাবাহিকতাকে বিঘ্নিত করেছে। কিন্তু সিঙ্গারদা থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত ফরায়েযী বেল্টটি বর্তমান সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে।[৪০] এছাড়া অন্য দুটি মহকুমাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ফরায়েযী বসতি রয়েছে।

---

৩৮ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন দুদু মিয়ার খলিফা : ১ সিঙ্গারদাহের আতাউল্লাহ মুনশী. ২ সিঙ্গারদাহের মতিউল্লাহ মুনশী. ৩ বাইছড়া নয়াপাড়ার বখশী মিয়াজী. ৪ ফরিদউদ্দীন মুনশী পূর্ব বাইচরা এবং. ৫ দরবেশ আলী মুনশী বাজারি খোলা।

৩৯ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দরবেশ আলী মুনশীর খলিফা ছিলেন : ১ আনিস মিয়াজী, সাতবাড়িয়া. ২ আখতার উল্লাহ মুন্সী কালাগাঁও. ৩ ইউনুস মুনসী বাতাকান্দী. ৪ আতাউদ্দীন আখন্দ কালাসোনা এবং. ৫ সফর উদ্দীন মিয়জী আতোমার, এমনকি বর্তমান সময় (১৯৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত এই সকল খলিফাদের বংশধরগণ দরবেশ আলী মুন্সীর বংশধরদের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে।

৪০ এই বেল্টটি যেসকল গ্রামগুলো নিয়ে গঠিত সেগুলো হল-কুমারাক্ষ, আন্দিরপাড়, নাহারা, সিঙ্গারদাহ নওগাঁ, বাইচড়া, আইনপুর, শঙ্করপুর, কৃষ্ণপুর, রাগডেল, জয়নগর, কালাসোনা, মালিগাঁও এবং মাহমুদপুর।

পরিশিষ্ট-ছ

বিশিষ্ট কয়েকজন ফরায়েযী নেতৃবৃন্দ

জালাল উদ্দীন মোল্লা, ফরিদপুর : আধুনিক ফরিদপুর শহরের কমলাপুরের অধিবাসী ছিলেন জালাল উদ্দীন। তাঁর পারিবারিক তথ্য অনুযায়ী[৪১] তাঁর চাচাদের একজন মক্কা শরীফে হাজী শরীয়তুল্লাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যখন হাজী বাংলায় ফিরে আসেন এবং তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তখন জালালউদ্দীনের চাচা তাকে সমর্থন করেন। তাঁর মাধ্যমে জালাল উদ্দীন তরুণ বয়সেই ফরায়েযী মতাদর্শে দীক্ষিত হন।

জালাল উদ্দীন 'মণ্ডল'পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফরায়েযী হওয়ার পর তিনি কোরআন অধ্যায়ন করেন। এছাড়া তিনি সামান্য আরবি ও উর্দু শিক্ষা করেন। এরপর হাজী শরীয়তুল্লাহ্ তাঁর পরিবারের পদবি পরিবর্তন করে 'মোল্লা' আখ্যা দেন। (১৮৩০ এর দশকে তিনি তাঁর এলাকায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন)। তিনি একজন রয়োজ্যেষ্ঠই ছিলেন না একজন ভাল কুস্তিগীরও ছিলেন।

সে সময় জমি-জমার বিরোধের সময় লাঠিযুদ্ধ ছিল একটি সাধারণ বিষয়। জালাল উদ্দীন মোল্লা একজন অসাধারণ লাঠিয়াল ছিলেন।

এই সময়ে হিন্দু জমিদার এবং ফরায়েযী কৃষক শ্রেণীর মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাজী শরিয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে জমিদারদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একদল লাঠিয়ালের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জালাল উদ্দীন মোল্লাকে লাঠিয়ালদের একটি দল সংগঠিত করার দায়িত্ব দেন এবং তীর নিক্ষেপের পর প্রশিক্ষণ দেবার নির্দেশ দেন। যখন দুদু মিয়া ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি লাঠিয়াল বাহিনীর প্রশিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক জালালউদ্দীন মোল্লার সঙ্গে হাত মেলান।

দুদু মিয়ার সময়ে জালাল উদ্দীন ফরায়েযী সংগঠনের রাজনৈতিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি মৃত্যুবরন করেন।

২। মুন্সী ফাইজ উদ্দীন মোখতার : যশোরের[৪২] অধিবাসী আগার মোহাম্মদ সুতকারের পুত্র ছিলেন ফাইজ উদ্দীন মোখতার। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফরিদপুরে আগমন করেন। তাঁর পরিবারে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তাকে আরবি[৪৩] শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী একজন ব্যক্তি। খুব শীঘ্রই তিনি কুস্তি খেলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। এই সময়ে তিতুমীর কুস্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। তরুণ ফাইজ উদ্দীন

---

৪১ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান লেখকের কাছে জালাল উদ্দীনের প্র-পৌত্র মণ্ডলবী রফিউদ্দিন এই তথ্য সরবরাহ করেন।

৪২ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া কর্তৃক ফাইজ উদ্দীনকে প্রদত্ত 'Legal attorney ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপি দেখুন, বর্তমান লেখক কর্তৃক সংগৃহীত, JASP, খণ্ড-৬, ১৯৬১ পৃ. ১২৪-৩১।

৪৩ ফরিদপুর নিবাসী ফাইজ উদ্দীন মোখতারের পৌত্র মণ্ডলবী রফিক উদ্দিন কর্তৃক সরবরাহ কৃত

তাঁর দলে যোগ দেয়। পরবর্তী সময়ে সৈয়দ আহম্মদ শহীদের অনুসারী হওয়ার পর তীতুমীর (১৮২৭খ্রি.) কলিকাতায় ফিরে আসেন। তিতুমীরের সঙ্গে তাঁর এখানে সাক্ষাৎ করার সুযোগ আসে। এরপর ফাইজ উদ্দীন তিতুমীরের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে যশোরে ফিরে আসেন। তিনি তিতুমীর প্রচারিত শুদ্ধিবাদী মতাদর্শ প্রচার শুরু করেন। তাঁর নিজ গ্রাম পানিপাড়ার অনতি দূরে বারাসিরা নদীর তীরবর্তী মীরগঞ্জে একটি নীলকুঠি ছিল। মুসলমান কৃষকদের উপর নীলকরদের অত্যাচার তাঁর দৃষ্টি আকষর্ণ করে। তিনি তাঁর সংস্কার মতাদর্শ কৃষকদের নিকট প্রচার করেন এবং তাদেরকে একটি সংঘবদ্ধ দলে পরিণত করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইউরোপীয় নীলকর কৃষকদের মধ্যে সংঘটিত একটি সংঘর্ষে ফাইজ উদ্দীন আহত হন। এরপর তিনি মীরগঞ্জের কাছাকাছি বাস করতে নিরাপদবোধ করেননি। এই কারণে তিনি ফরিদপুরের অধিবাসী হন। ফরিদপুরের খ্যাতনামা ফরায়েযী নেতা জালাল উদ্দীন মোল্লার কন্যাকে বিয়ে করে ফরিদপুরের স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। অবশ্য কখনো তিনি ফরায়েযী মতাদর্শ গ্রহণ করেননি বরং আমৃত্যু তিতুমীরের অনুসারী ছিলেন।[৪৪]

ফরিদপুর জেলা কোর্টে মোখতার (প্রচলিত ভাষা মোক্তার) হিসাবে তার পেশা শুরু করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে দুদু মিয়া Legal Attorney নিযুক্ত করেন। দুদু মিয়া তাঁর স্থাবর সম্পত্তি দেখাশুনা এবং সরকারি অফিস আদালতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে কাজ করার অধিকার প্রদান করেন।[৪৫] ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাকে দুদু মিয়ার পুত্রদের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। তিনিও কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

৩। মওলবী কফিল উদ্দীন আহমেদ :[৪৬] ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কফিল উদ্দীন আহম্মেদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফাইজ উদ্দীন মোখতার এর জ্যেষ্ঠপুত্র। এবং খাঁনবাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহম্মদের সহকর্মী। দুজন একই সঙ্গে বাহাদুরপুর এবং ঢাকার স্কুলে লেখাপড়া করেন। ঢাকাতে তিনি মওলবী দীন মোহাম্মদের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকার মোহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং মওলানা উবায়দুল্লাহ্ উবায়দীর ছাত্র হন।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ফরিদপুরে ফিরে আসেন তখন খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন তাকে খলিফা নিযুক্ত করেন। পরে তিনি তত্ত্বাবধায়ক খলিফায় উন্নীত হন। উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্ণাঙ্গ খলিফা হন। এই সঙ্গে তাকে রাজবাড়ি ভাঙ্গা, 'মকসুদপুর, ভূষণা, ফরিদপুর, সদরপুর, নাগরকান্দা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের ফরায়েযীদের সামাজিক এবং ধর্মীয় ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য সনদ প্রদান করা হয়। অন্য কথায় তাকে ফরিদপুর সদর মহকুমা এবং গোয়ালন্দ মহকুমার অংশ বিশেষের দায়িত্ব দেয়া হয়।

---

৪৪ ঐ।
৪৫ দুদু মিয়া কর্তৃক প্রদত্ত দলিলের পাণ্ডুলিপি
৪৬ ফরিদপুর শহরের কমলাপুরের অধিবাসী মওলবী কফিল উদ্দীন আহম্মদের পরিবার থেকে সংগৃহীত তথ্য। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থের লেখক ফরিদপুর শহরের মওলবী রফি উদ্দীন আহম্মদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করেন।

কফিল উদ্দীনের তত্ত্বাবধানে আরও খলিফা ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিলেন (১) কাজেম মোল্লা গিদই জাহানপুর[৪৭] (২) মুন্সী গিয়াস উদ্দীন শাহ্ ফকির, [৪৮] গিদই ইতালমা।

ফরায়েযী সংগঠনে ন্যায় বিচার বিষয়ক প্রশাসন বিশেষ স্থানের অধিকারী। তত্ত্বাবধায়ক খলিফার অনুমতি ছাড়া কোনো ফরায়েযী সরকারি আদালতে মামলা দায়ের করতে পারত না। জটিল ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে শুধু অনুমতি দেয়া হতো। অন্যান্য সকল বিবাদ খলিফাগণ মীমাংসা করত। একজন উপরস্থ খলিফা হিসাবে মওলবী কফিল উদ্দীনকে তাঁর এলাকায় নিয়মিত পরিদর্শন করতে হতো। বিভিন্ন বিবাদ মীমাংসার জন্য তিনি তা করতেন। এছাড়া কাদেরিয়া সুফী মতাদর্শ মোতাবেক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও প্রদান করতে হতো। উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা এবং বিভিন্ন স্থানে ফরায়েযীদের আয়োজিত সভাসমূহে তিনি বক্তব্য রাখতেন। কখনও কখনও ফরায়েযীগণ, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, ঢাকা, চাঁদপুর এবং রেকাবি বাজারে ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করত। কফিল উদ্দীন এই সকল সম্মেলনে প্রধান ভূমিকা পালন করতেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মওলানা কেরামত আলী ও তাঁর অনুসারীগণ জুমআ এবং ঈদের নামাজ সম্পর্কিত ফরায়েযী মতাদর্শের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই দুই দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত 'তর্কযুদ্ধ' একটি নিয়মিত দৃশ্যে পরিণত হয়। এই ধরনের বিতর্কে ফরায়েযী অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য মওলবী কফিল উদ্দীনকে প্রায়ই ডাকা হতো। মওলানা কেরামত আলীর পুত্র মওলানা আবদুল আওয়াল[৪৯] যখন পূর্ববঙ্গে সফর করেন তখন তাঁর সঙ্গে কফিল উদ্দীনের বেশ কয়েকটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময়ে মওলবী কফিল উদ্দীন এবং খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন এই বিভক্তিকে সমর্থন করেন এবং ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্র সঙ্গে হাত মেলান। অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেসে এসময়ের সভাপতি ফরিদপুরের শ্রী অম্বিকা চরণ মজুমদারের প্রচারের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ান। যেখানে হিন্দুরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে সেখানে তিনি ফরিদপুরে লিভার পুল থেকে আসা লবণের একটি স্টোর খোলেন।

---

৪৭ পূর্বে কাজেম মোল্লা 'জোলা' (তাঁতি) ছিলেন। ফরায়েযী মতাদর্শ গ্রহণ করার পর 'জোলাহ' পদবি পরিবর্তন করে 'কারিগর' রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি কোরআন পড়তে শিখেন এবং এর সাধারণভাবে মমার্থ বুঝতে সক্ষম হওয়ায় 'মোল্লাহ পদবি দেয়া হয়।

৪৮ ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন জীবিত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১২০ বছর হয়েছিল বলে দাবি করা হয়।

৪৯ মওলানা আবদুল আওয়াল পূর্ববঙ্গে বেশ কয়েকবার সফর করেন (দ্রষ্টব্য, আবুল বাশার এবং আব্দুল বাতিন : সিরাহ-ই মওলানা আবদুল আওয়াল জৌনপুরী, জৌনপুর, ১৩৭০ হিজরী পৃ. ৫২, ৫৩, ৯, ১২৭, ১৩৪, ১৫৩ এবং ১৮৫ থেকে) কিন্তু তাঁর জীবনীতে মওলবী কফিল উদ্দীনের সঙ্গে কোন বিতর্ক হয়েছে বলে উল্লেখ নেই। অবশ্য মওলবী উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা 'ইজান আল-ওয়ারা বি সিহাত আল জুমআ ফি'ল মাদান ওয়া'ল কুরা' (অর্থাৎ শহর এবং গ্রামে জুমআ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ধর্মতত্ত্বিদগণের অনুমতি সংক্ষেপে জুমআ নামাজ অনুষ্ঠানের বিতর্কের উল্লেখ আছে। এতে ধারণা করা যায় যে, এই দুইজনের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে।

১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি খিলাফতীদের সঙ্গে যোগদেন এবং বাদশাহ মিয়ার সঙ্গে কারাবরণ হন। সে সময় থেকে ফরায়েযীগণ ব্রিটিশদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বদলে বিরোধিতা শুরু হয়।[৫০] খিলাফত আন্দোলনের সময় থেকে দেওবন্দ স্কুলের বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ বাংলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রতিজনের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই ছোটখাট ধর্মীয় বিষয় যেমন জুমআর নামাজ অনুষ্ঠানের বিষয়টি ক্রমে গৌণ হয়ে পড়ে এবং বিস্মৃতির অতলে ঢাকা পড়ে। জুমআ এবং ঈদের নামাজ যেহেতু মুসলমানদের একতার প্রতীক তাই তরুণ ফরায়েযীগণ এই নামাজসমূহ অনুষ্ঠানের পক্ষে চাপ দিতে থাকে। ফরায়েযী মতাদর্শ অনুসারে মওলবী কফিল উদ্দীন মত প্রকাশ করেন যে, জুমআ বা ঈদের নামাজ গ্রামসমূহে আইনসম্মতভাবে অনুষ্ঠিত করা যাবে না। কিন্তু তিনি যখন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মহানগরী সফর করেন তখন তিনি দেখেন যে শহর বা নগরে যেখানে সরকার বা প্রশাসন রয়েছে সেখানে উক্ত নামাজ অনুষ্ঠানে কোন বাধা নেই। তাঁর পুত্র মওলবী রফি উদ্দীন আহমেদের চাপে জুমআ সম্পর্কিত ফরায়েযী মতাদর্শ পুনঃপরীক্ষা করে মতামত দেয়ার জন্য রফি উদ্দীনকে তিনি মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী এবং মওলানা জাফর আহম্মদ উসমানীর কাছে প্রেরণ করেন। এই দু'জন কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে প্রমাণাদির মাধ্যমে বাংলার শহর এবং গ্রামে জুমআ আদায়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফলে মওলবী কফিল উদ্দীন আহম্মদ তার অনুসারীদেরকে ফরিদপুরে ঈদ ও জুমআর নামাজ আদায়ের অনুমতি দেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত কফিল উদ্দীন আহম্মদ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর এলাকায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েযীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রথম জুমআতে অংশ নিতে পারেননি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে কফিল উদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন।

৪। **সৈয়দ আজিম উদ্দীন খন্দকার ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ :** ত্রিপুরা জেলা (বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চল)[৫১] সৈয়দ আজিম খন্দকার এর (মৃত্যু, ১৮৪২) সঙ্গে হাজী শরীয়তুল্লাহ'র সংযোগ ঘটে যখন হাজী নদীবন্দর চাঁদপুর সফর করেন। যখনই হাজী শরীয়তুল্লাহ চাঁদপুর সফরে আসতেন তখনই ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা দলে দলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। আজিম উদ্দীন ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে দূরবর্তী নিজগ্রাম সিঙ্গার দাহ্ থেকে হাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তাঁর মতাদর্শে মুগ্ধ হন। হাজী শরীয়তুল্লাহ'র একজন একনিষ্ঠ অনুসারী এবং ফরায়েযী আন্দোলনের কড়া সমর্থক হিসাবে তিনি বাড়ি ফিরেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ'র জীবনে শেষের দিকে যখন তিনি বিভিন্ন স্থানের জন্য খলিফা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন তখন ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য আজিম উদ্দীনকে খলিফা নিযুক্ত করেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর

---

৫০ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়।

৫১ সৈয়দ আজিম উদ্দীন খন্দকার, সিঙ্গারদাহ, বংশী মিয়াজী বাইচারা ফাইজ উদ্দীন মুনশী পূর্ববাইচরা এবং দরবেশ আলী মুনশী বাজারিখোলা প্রমুখ ব্যক্তিদের বংশ লতিকার প্রমাণাদি এবং তাদের পরিবারে প্রচলিত তথ্যাদি থেকে সংগৃহীত। ১৯৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে লেখক কর্তৃক উক্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় তথ্যাদি সংগৃহীত হয়।

ভাইপো আতাউল্লাহ্ মুন্সী (মৃত্যু, ১৮৫৮ খ্রি:) এবং মতিউল্লাহ্ মুন্সী (মৃত্যু, ১৮৬০) এবং তাদের বংশধরগণ বর্তমান সময় পর্যন্ত ফরায়েযী খলিফা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন বলে দাবি করে থাকেন।[৫২]

ফাইজ উদ্দীন মুনশী কিছু পড়াশুনার অধিকারী ছিলেন। তিনি গ্রাম্য রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফরায়েযী মতাদর্শ প্রচার করেন। বাড়িতে তিনি একটি মক্তব খোলেন এবং এখানে তিনি শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষা, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান দিতেন। দূরবর্তী গ্রামগুলো থেকেও অনেক ছাত্র এই মক্তবে পড়তে আসত। তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন দরবেশ আলী মুনশী যিনি পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা হিসাবে উন্নীত হন।

৫। বাজারী খোলার দরবেশ আলী মুনশী : বাজারী খোলার দরবেশ আলী মুনশী ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার শিষ্য হন। দুদু মিয়া পূর্ববাংলার গণমানুষদেরকে তাঁর পক্ষে টানার চেষ্টা করেন। তিনি চাঁদপুর মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্যই শুধু ৫জন খলিফা নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে দরবেশ আলীও ছিলেন।[৫৩] তাদের অক্লান্ত চেষ্টায় সিঙ্গারদা (লাকসাম) থেকে দাউদকান্দি (সদর মহকুমার নদীবন্দর) পর্যন্ত একটি লম্বালম্বি এলাকার জনগণ একচেটিয়াভাবে ফরায়েযী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়। এই ত্রিপুরা জেলার ভেতরে ফরায়েযী আন্দোলনের এই চমকপ্রদ সাফল্যের জন্য দরবেশ আলী মুনশীকে দুদু মিয়া তত্ত্বাবধায়ক খলিফা পদে উন্নীত করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া চাঁদপুর নদী বন্দর থেকে ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল সফরে যান। তিনি সরাসরি বাজারী খোলায় দরবেশ আলী মুনশীর বাড়ি যান এবং তাকে নিয়ে সিঙ্গারদাহ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ফরায়েযী বসতিসমূহ সফর করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকার জন্য আরও পাঁচজন খলিফা নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে দরবেশ আলীর অধীনস্থ করেন।[৫৪] বলা হয়ে থাকে যে, দুদু মিয়া এই এলাকায় একটি ফরায়েযী গির্দ (সার্কেল) গঠন করেন। এই সার্কেলে বর্তমান কচুয়া, চান্দিনা এবং দাউদকান্দি থানা রয়েছে। এই গির্দ বা সার্কেলের ফরায়েযীদের উপর ইসলামী আইন এবং সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল দরবেশ আলীর উপর।

দরবেশ আলীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুর রহমান মুনশী তত্ত্বাবধায়ক খলিফা হন। তিনি ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর পুত্র ইরফান উদ্দীন মুনশী তত্ত্বাধায়ক খলিফা হন যা শেষ ফরায়েযী প্রধান বাদশাহ্ মিয়া কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[৫৫]

---

৫২ উদহারণস্বরূপ ফাইজ উদ্দীন আহম্মদ সিঙ্গারদা, যিনি আতাউল্লাহ্ মুনশীর পৌত্র। তিনি নিজেকে ফরায়েযী খলিফা হিসেবে দাবী করেন।

৫৩ দুদু মিয়ার খলিফা বৃন্দ : (১) আতাউল্লাহ মুনশী, সিঙ্গারদা, (২) মতিউল্লাহ মুনশী সিঙ্গারদা, (৩) বংশী মিয়াজী, বাইচরা, (৪) ফাইজ উদ্দীন মুনশী পূর্ববাইচরা এবং (৫) দরবেশ আলী মুনশী বাজারিখোলা।

৫৪ দরবেশ আলী মুনশীর অধস্তন খলিফাগণ (১) আনিস মিয়াজী, সাত বাড়িয়া, (২) আখতার উল্লাহ মুনশী, কলাগাঁও, (৩) ইউনুস মুন্সী, বাতাকাশী, (৪) আতাউদ্দীন আখন্দ, কাটাসোনা এবং (৫) সফর উদ্দীন মিয়াজী, আতোমার। লক্ষণীয় যে, এই খলিফাদের বংশধরগণ দরবেশ আলী মুনশীর উত্তরাধিকারীর কাছে বর্তমানেও আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে।

৫৫ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে লেখক বাজারীখোলা পরিদর্শন করেন এবং ইরফান উদ্দীনের খিলাফতের সনদ ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করেন এবং এটি যথাযর্থ সম্পর্কে বাদশা মিয়া নিশ্চিত করেন।

পরিশিষ্ট-জ

উনিশ শতকের ফরায়েযী উলামা সম্প্রদায়

উনিশ শতকের ফরায়েযী ওলামাদের বা ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মওলবী আবদুল জব্বার, মওলবী সানাউল্লাহ্ এবং মওলবী আবদুল হাই ছিলেন প্রধান। কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের জীবনী সম্পর্কিত তথ্য সামান্যই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

মওলবী আবদুল জব্বার ছিলেন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার একজন অধিবাসী এবং হাজী শরিয়তুল্লাহ'র একজন অনুসারী। তিনি ছিলেন দুদু মিয়ার একজন সহকর্মী ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মওলানা কেরামত আলীর সঙ্গে তাঁর একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। পরবর্তীতে আমরা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম, ৪র্থ এবং ৭ম অধ্যায়ে তাঁর কর্মতৎপরতা দেখতে পাই তাতে ধারণা করা যায় যে তিনি ফরায়েযীদের বুদ্ধিজীবীক মহলে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সম্ভবত ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মওলবী সানাউল্লাহ ফরিদপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি হিন্দুস্তান অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ অথবা দিল্লী থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। ফরায়েযীগণ সাধারণত তাকে 'রাস আল মোহাদ্দেসীন' বা নবীজীর সুন্নাহর সম্পর্কে জ্ঞানী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। ফরায়েযীসূত্রসমূহ অনুযায়ী তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দাউদকান্দিতে অনুষ্ঠিত ফরায়েযী বনাম স্থানীয় আচারপন্থীদের বির্তকে ফরায়েযীদের পক্ষে অংশ নেন। এর পরপরই সম্ভবত তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মওলবী আবদুল হাই ছিলেন মাদারীপুরের অধিবাসী। তিনি বাহাদুরপুরের ফরায়েযী মাদ্রাসার ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক ছিলেন। মওলবী হাই, খান বাহাদুর সাইদ উদ্দীন আহমদের সময়ে জীবিত ছিলেন।

পরিশিষ্ট-ঝ

ফরায়েযী উলামা সম্মেলন-১৯৪৭ খ্রি.

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির পর ফরায়েযীগণ ঈদ ও জুমআর নামাজ অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাদের মতাদর্শ পুনঃপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সুতরাং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রেকাবি বাজারে উলামাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'জুমআ সম্বন্ধে মিমাংসা'[৫৬] শীর্ষক একটি প্রচারপত্র আমাদের হাতে রয়েছে। এতে দেখা যায় যে, সে সময়ের ফরায়েযী প্রধান আবু খালিদ রশিদ উদ্দীন ওরফে বাদশা মিয়া সম্মেলনটি আহবান করেছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবুল বারাকাত আবদুল রউফ দানাপুরী। মওলানা দানাপুরীকে যুক্ত প্রদেশ বা উত্তর প্রদেশ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে আনা হয়।

প্রচারপত্রে বাদশা মিয়া ঘোষণা করেন যে, পূর্বে ফরায়েযীগণ দেশটিকে 'দারউল হারব' বিবেচনা করায় জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠান অবৈধ মনে করেছিল। কিন্তু এখন থেকে আল্লাহর রহমতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই নামাজ দেশে বিধিসম্মতভাবে বৈধ করা যাবে। কিন্তু এখানে 'হানাফী' আইনবিদগণ দ্বিতীয় একটি শর্ত রেখেছেন যা জুমআ এবং ঈদের নামাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালন করতে হবে। এটা স্থানের মর্যাদার উপর নির্ভর করে। 'হানাফী' আইন বিদদের মতে গ্রাম সমূহে ঈদ ও জুমআর নামাজ আদায় করা বৈধ নয়। এই নামাজসমূহ শুধু শহরেই আদায় করা আইনসম্মত। 'শহর' সম্পর্কিত ধারণা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এই সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে আমরা মনে করি যে, পাকিস্তানের সকল শহরে জুমআ এবং ঈদের নামাজ পড়া বৈধ। এছাড়া যে সকল স্থান রাস্তা ঘাট, জনসংখ্যা এবং বাজারের কারণে শহরের চরিত্র বহন করে, সে স্থানসমূহেও এই নামাজ পড়া বৈধ।

আমরা যা মনে করি তা সংক্ষেপে হলো যে, পাকিস্তানের মহকুমা ও জেলা শহরে বন্দরে ৪০০০ লোকসংখ্যার বসতিসমূহে জুমআ এবং ঈদের নামাজ আদায় করা বৈধ। শেষোক্ত স্থানসমূহে এই নামাজ সতর্কতার সঙ্গে আদায় করতে হবে।

মওলানা দানাপুরী উক্ত মতকে সমর্থন করে বলেন যা নদীবন্দর হিসাবে রেকাবি বাজার[৫৭] একটি ছোট শহর বা বড় একটি কাসবা। সুতরাং এখানে জুমআ এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠান সতকর্তার সঙ্গে আদায় করতে হবে।

---

৫৬ উক্ত প্রচার পত্রটি ছিল মওলানা দানাপুরী এবং বাদশাহ মিয়ার যৌথ স্বাক্ষর দেওয়া একটি ইশতেহার। পটুয়াখালী থেকে বাংলা ভাষায় এটি প্রকাশিত হয় এবং বাহাদুরপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৩রা কার্তিক (১৯৪৭ খ্রি. ১৭ অক্টো) অর্থাৎ সম্মেলনের ৩ দিনপর (সম্মেলনটি ২৯ ও ৩০ শে আশ্বিন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত হয়) এই প্রচার পত্রটি প্রচারিত হয়। এটি গ্রন্থকার ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রেকাবি বাজারে দেখেছেন এবং এটির একটি সত্যায়িত কপি নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছেন।

৫৭ এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রেকাবি বাজার পরিদর্শন করেন। তখন এই স্থানের লোকসংখ্যা ছিল ৩০০০

পরিশিষ্ট-এঃ

গ্রামীণ বাংলায় নীলকর

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মি. পন্টিফিস একটি কৌতূহল উদ্দীপক মামলা পরিচালনা করেন। মামলাটি ছিল নদীয়া জেলার নীলকর মি. হোয়াইট কর্তৃক শেখ মুন্সিফ নামের একজন রায়তকে হত্যা সম্পর্কিত। মি. হোয়াইট শেখ মুন্সিফকে শারীরিকভাবে নির্যাতিত করার প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়। প্রমাণাদি এতো বিস্তারিত এবং স্পষ্ট ছিল যে নির্যাতন সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। অভিযোগ করা হয় যে জুরীদের[৫৮] এবং বিচারকের পক্ষপাতিত্বের কারণে মিঃ হোয়াইট মুক্তি পান। নিম্নোক্ত অংশটি দৈনিক ইংলিশম্যান কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

সোমবার ৮ ই জুলাই ১৮৭৮[৫৯]

"বিচারক জুরিমণ্ডলীর ভদ্র মহোদয়গণ আমি কোন প্রমাণ নেই বলিনি কিন্তু আপনারা কি ভাবছেন তা আমি বলতে পারি না। আমি মনে করি আপনারা যদি প্রমাণাদিকে বিশ্বাস করেন তাহলে বন্দীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত বলবেন। প্রমাণাদির মধ্যে যোগসূত্র নেই।

দি ফোরম্যান আমরা শুনানী শ্রবণ করতে ইচ্ছুক নই। আমরা আমাদের মনস্থির করে ফেলেছি। জুরিদেরকে কাজ করণিক জিজ্ঞাসা করেন, রায়ের সঙ্গে জুরিগণ একমত কি না। দি ফোরম্যান বলেন যে, বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ দ্বারা তাকে অভিযুক্ত করা যায় না।

বিচারক জুরিমণ্ডলী, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত প্রমাণাদি সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাসযোগ্য। অভিযুক্তকে তখন মুক্তি দেয়া হয়।

জুলাই মাসের ৮ তারিখে 'দি ইংলিশম্যান' সম্পাদকীয়তে যে মন্তব্য করে তা নিম্নরূপ :[৬০]

"Empress vs.white" মামলায় একটি বাজে উদাহরণে দেখা যায় যে, দেশের স্থানীয়দের হাতে কেমন বিপদজনক হাতিয়ার রয়েছে। মফঃস্বলে ইউরোপীদের অবস্থা কতো বিপদজনক।

নদীয়া জেলার ফ্যাক্টরি ম্যানেজার একজন ইংরেজ ভদ্রলো'ক একজন ব্যক্তিকে হত্যা করার মতো একটি মামলায় অভিযুক্ত করলেও একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাকে খালাস দেন। কিন্তু বার মাস পর হাইকোর্টে আবারও একই রায় হয়।

পরবর্তীতে মিঃ হোয়াইটের প্রসিকিউটর 'দি ইংলিশম্যান' এ একটি চিঠি প্রকাশ করেন।[৬১] চিঠিতে বলা হয় যে, যারা মিঃ হোয়াইটের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল তাদের বিচার না করে এই ঘটনার নেপথ্যের ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করা উচিত।

---

৫৮ জুরীদের মধ্যে ৮ জন ইউরোপীয় ও একজন হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন।

৫৯ Englishman, ৮ জুলাই ১৮৭৯ খ্রি. পৃ. ৩, কলাম ৫। 'Judgement in the case Empress vs.white' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিচারের রায়ের দুদিন পূর্বে সাক্ষীদের জেরা করা হয় এর পূর্ণ বিবরণী ইংলিশম্যানের ৬ষ্ঠ এবং ৮ম সংখ্যা (জুলাই) যথাক্রমে (প্র-৩ কলাম ২-৪) এবং (পৃ-৩ কলাম ৩-৫ এ প্রকাশিত।

৬০ দি ইংলিশম্যান, ৮ জুলাই, ১৮৭৮ : পৃ. ২, কলাম-৩ :

১১ ঐ, ১৩ জুলাই, ১৮৭৮, পৃ. ২, কলাম ১।